জ্যৈষ্ঠ—১৩৪২

দ্বিতীয় খণ্ড | দ্বাবিংশ বর্ষ | ষষ্ঠ সংখ্যা

হিন্দুর সামাজিক ইতিহাসের এক দিক্

অধ্যাপক শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য্য এম-এ, বি-এল্, কাব্যতীর্থ

মানব প্রকৃতির মত ইতিহাসের দুইটা দিক্—অন্তর ও বাহির। দেহ ও মন লইয়া আমাদের সত্তা। দেহীর ধর্ম্ম আপনার পুষ্টি ও রক্ষা। বাহিরের উপাদান গ্রহণ করিয়া, জীর্ণ করিয়া, আত্মসাৎ করিয়া স্থূল-জগতে প্রাণী জীবিত থাকে। ইহা ব্যক্তির পক্ষে যেরূপ সত্য, জাতির পক্ষেও সেইরূপ। যে দেশে বসতি, তাহার প্রাকৃতিক সম্পদ্ আহরণ করিয়া—অভাব পড়িলে অন্য দেশ হইতে তাহার পূরণ করিয়া, প্রত্যেক জাতি জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। আত্মরক্ষার জন্য তাহাকে সমাজ বাঁধিতে হয়—রাষ্ট্র-গঠন করিতে হয়—বিদেশীর আক্রমণ ব্যাহত করিবার জন্য অস্ত্র ধরিতে হয়। এ সকলই প্রাণরক্ষার আয়োজন। রাজ্যের উত্থান-পতন, সন্ধি-বিগ্রহ, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি ও শিল্প—এ সকলের বিবরণ বাহ্য ইতিহাস। এগুলি প্রতিমার কাঠামো মাত্র। অতি প্রয়োজনীয় বটে—নহিলে এক পদও অগ্রসর হওয়া যায় না। কিন্তু তবু বাহ্য। ইহাতে শুধু জাতির জীবনীশক্তি ধরা পড়ে—প্রতিবেশী ও পরিবেশের সহিত দ্বন্দ্ব কিংবা আপোষ করিয়া যুগে যুগে কি ভাবে আপনাকে সে বজায় রাখিয়াছে—তাহা আমরা বুঝিতে পারি। কিন্তু ইহা তাহার পূর্ণ পরিচয় নহে। ইহা একপ্রকার Natural History—ইতর জীব ও মানুষের মধ্যে সাধারণ। আভ্যন্তর ইতিহাস রুচি, বুদ্ধি ও বিবেকের ক্রমোন্মেষের কাহিনী। সাহিত্য ও সঙ্গীত, দর্শন ও চারুকলা, ধর্ম্মমত ও আচার-অনুষ্ঠানের যে ক্রমপরিণতি—তাহাতেই জাতির আন্তর প্রকৃতির লীলা "সূত্রে মণিগণা ইব" গ্রথিত হইয়া থাকে। এই রহস্য তখনই প্রত্যক্ষ হয়—যখন রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের বহিঃপ্রাঙ্গণ পার হইয়া আমরা সামাজিক ইতিহাসের অন্তঃপুরে প্রবেশ করি। রাষ্ট্রের ইতিহাস—সভ্যতার ইতিহাসের সোপান, তাহার দ্বার স্বরূপ।

হিন্দুর রাষ্ট্রীয় ইতিহাস নাই—এ কলঙ্ক ক্রমশঃ দূর

হইতেছে—বিদেশী ও স্বদেশী পণ্ডিত—উভয়ের মিলিত চেষ্টার ফলে। এক্ষেত্রে অঞ্জন শলাকাটী দিয়াছে প্রতীচী—এ দেশের ঐতিহাসিক চক্ষু তাহাতে উন্মীলিত হইয়াছে। সকল ঘটনাকে কালের ফ্রেমে আঁটিয়া দেখা যে একটা পরম প্রয়োজন—তাহা এ দেশের বিদ্বৎসমাজে উপলব্ধ হইতেছে। ফলে পরীক্ষিতের সময় হইতে শাক্যমুনির যুগ পর্য্যন্ত যে গাঢ় অন্ধকার ছিল, তাহাও কতক পরিমাণে তরল হইয়া আসিয়াছে। পুরাণগুলি যে আজগুবি কাহিনীর সমষ্টি নহে—সত্য ইতিবৃত্ত যে উহাদের মধ্যে সঞ্চিত আছে—তাহা ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি যাঁহারা শ্রদ্ধায় অন্ধ নহেন—এমন কি তাঁহারাও মানিয়া লইতেছেন। আশা হয়—এইভাবে শ্রুতির অন্তরীক্ষলোক হইতে ঐতিহাসিক যুগের মর্ত্ত্যধাম পর্য্যন্ত সুনির্ণীত কাহিনীর স্বর্ণশৃঙ্খল অদূরে নামিয়া আসিবে।

ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের ক্ষীণ রেখা-চিত্রটী নানাবর্ণ-সংযোগে ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইয়া উঠিতেছে—ইহা আমাদের পরম লাভ। কিন্তু এই ভিত্তিকে আশ্রয় করিয়া হিন্দুর সামাজিক ইতিহাসের সৌধ গড়িয়া উঠিতে এখনও বহু বিলম্ব আছে বলিয়া মনে হয়। যে মণিকোঠার মধ্যে প্রবেশ করিলে, হিন্দুর অধ্যাত্মরূপের দর্শন লাভ হইবে—বহু যুগের অবহেলায় পুরাকীর্ত্তির মত এখনও তাহা বিস্মৃতির মৃৎ-স্তূপে প্রোথিত হইয়া রহিয়াছে। এক হিসাবে বলা যাইতে পারে যে এইখানেই হিন্দু-জাতির প্রকৃত পরিচয় নিহিত। মানুষের স্বরূপ-বর্ণনা অনেক সময় নিন্দার মত শুনায়। ইহুদি জাতির মত ভারতীয় আর্য্য জাতির প্রাণের টান যে অতীন্দ্রিয়—আধ্যাত্মিক জগতের দিকে ছিল—কর্ম্মময় এ যুগে তাহা গ্লানির কথা—অখ্যাতির কথা বলিয়া মনে হইলেও—প্রাচ্যের ইহা অনেকাংশে সত্য পরিচয়। আমাদের সে পরিচয় যতদিন যথাযথ ভাবে আমরা না পাইতেছি বা বিশ্বের দরবারে দিতে পারিতেছি—ততদিন সত্যই আমাদের একটা লজ্জার কারণ থাকিবে। ইয়োরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস বহুদিন রচিত হইয়াছে—কিন্তু যে ভারত ধ্যান ও মননের মধ্যে নিজেকে ব্যাপৃত রাখিয়া আসিয়াছে—তাহার অধ্যাত্ম কাহিনী লিখিবার গীজো কবে আবির্ভূত হইবেন কে জানে?

মানবজীবনের কর্ত্তব্যসমূহ সম্বন্ধে হিন্দুর দৃষ্টি কিছু বিলক্ষণ। আমরা আজকাল কর্ত্তব্যগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন কোঠায় ভাগ করিয়া থাকি—যথা ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়। কিন্তু সকল কর্ত্তব্যই আমাদের শাস্ত্র-গ্রন্থে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এক সাধারণ নামে—তাহা ধর্ম্ম। এবং সকলের মূল এক—বেদের বিধি। এককালে স্মৃতি-শাস্ত্রই ছিল সকল কর্ত্তব্যের নির্ণায়ক ও প্রমাণ। আর্ষযুগে কল্পসূত্রের তিন ভাগ শ্রৌত-, গৃহ্য- ও ধর্ম্মসূত্রে এবং পরবর্ত্তি-কালে স্মৃতিগ্রন্থের আচার-, প্রায়শ্চিত্ত- ও ব্যবহার-খণ্ডে এই কর্ত্তব্য সমষ্টি উপদিষ্ট ও আলোচিত। মনুসংহিতায় এগুলিকে পৃথক্ না রাখিয়া মিশ্রিত ভাবে বিবৃত করা হইয়াছে। অন্যান্য পুস্তকেও এরূপ বিভাগ-সঙ্কর (overlapping) দেখা যায়। প্রায় সর্ব্বত্রই সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্ত্তব্যে প্ররোচনা ও বাধ্যতা দিয়াছে—পাপ-পুণ্যের—ধর্ম্মাধর্ম্মের ধারণা। রাজা ধর্ম্মাধর্ম্মের উদ্ভাবন করেন নাই—তিনি সমাজ-শৃঙ্খলার প্রতিপালক ও ধর্ম্মের সংরক্ষক—কিন্তু তিনিও শাস্ত্র-শাসিত। কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণীর, বিভিন্ন আশ্রমের, বিভিন্ন সামাজিক অবস্থার ও সম্বন্ধের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের নিয়ামক ও প্রভু অপৌরুষেয় জ্ঞান-পুঞ্জ। আর্ষদৃষ্টিতে প্রতিফলিত হইয়া ও গুরু-শিষ্য-পরম্পরায় শ্রুত হইয়া, তাহা শ্রুতি এবং পরবর্ত্তী মুনিগণ কর্ত্তৃক স্মৃত হইয়া লিপিবদ্ধ হইয়া, তাহা স্মৃতির আকার ধরিয়াছে। স্মৃতি বলিতে বুঝায় কল্পসূত্র, সংহিতা এবং পুরাণে নিবদ্ধ ধর্ম্ম-শাস্ত্রের বিধিনিষেধ। এগুলি হইল মূলীভূত উপদেশ-সমষ্টি। কিন্তু কালক্রমে এবং বিভিন্ন প্রদেশে এই সকল মূল বিধিনিষেধ গুলির নানাভাবে ব্যাখ্যা ও সমন্বয় করিয়া লোকের প্রয়োজন-সাধন ও স্থানীয় আচারগুলি বজায় রাখা হইয়াছে। সেইজন্য পরবর্ত্তী কালে বহু নিবন্ধ-গ্রন্থ বা digests রচিত হইয়াছে—এগুলির নাম স্মৃতিনিবন্ধ।

এই বিস্তৃত স্মৃতি-শাস্ত্রের মধ্যে যুগ-যুগান্তর-ব্যাপ্ত হিন্দুর সামাজিক জীবনের কাহিনী নিবদ্ধ আছে। প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব কানে ধর্ম্মশাস্ত্রের ইতিহাস রচনা করিয়া, উহা কত বিপুল ও বিস্তৃত তাহার ধারণা জন্মাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে উল্লিখিত ও বর্ণিত গ্রন্থরাশির মধ্যে যে সামাজিক কাহিনীর উপাদান নিহিত আছে—সেগুলিকে কালের ফ্রেমে আঁটিয়া এবং রাষ্ট্রীয় ভাগ্যবিপর্য্যয়ের ইতিবৃত্তের সহিত মিলাইয়া—সুবিন্যস্ত করিয়া ধারাবাহিক সমাজ-চিত্র আঁকিয়া তুলিতে এখনও বহু কর্ম্মী ও বিদ্বানের প্রয়োজন।

মূল স্মৃতিগুলিরই এখনও যথাযথ সঙ্কলন ও পরীক্ষা হয় নাই। পুরাণগুলির কথা বহুদূরে। নিবন্ধ-গ্রন্থে উদ্ধৃত ঋষিগণের বচন এবং বিভিন্ন সংহিতাকারের নামে প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে বহু পার্থক্য। কোন কোন স্মৃতিকারের—যথা কাত্যায়নের—পুনঃসঙ্কলনের চেষ্টা হইতেছে মাত্র। বিস্তৃত ভূমি—শ্রমিকের সংখ্যা অল্প ইহাই আক্ষেপের বিষয়।

কালক্রমে হিন্দু-সমাজের প্রকৃতি ও গতি কি ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে—তাহার কতক পরিচয় পাওয়া যায়—উহার আচার-ব্যবহারের পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনায়। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বহু জনের ধারণা এই যে হিন্দুর রাজনৈতিক ভাগ্যে উত্থান-পতন ঘটিয়াছে ইহা সত্য। বিদেশী শাসকের শাসন-যন্ত্রে নানাভাবে তাহার বাহ্যজীবন নিষ্পিষ্ট, পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান, ধর্ম্মকার্য্য, যাগ-যজ্ঞ, পূজার্চ্চনা—এ সকল অন্তরঙ্গ ব্যাপারে তাহার কিছুই পরিবর্ত্তন হয় নাই। এইরূপ ধারণা যে অমূলক তাহার প্রমাণ বিপুল ধর্ম্মশাস্ত্রের ইতিহাস।

আমরা যে সৃষ্টির জীব—তাহার নাম জগৎ, তাহার নাম সংসার। উভয় শব্দই সচলতা, পরিবর্ত্তন বুঝাইয়া থাকে। এই পরিবর্ত্তন-নিয়মের প্রভাব হইতে আমাদের অতি পুরাতন জাতিও নিষ্কৃতি পায় নাই—হিন্দুর সামাজিক ইতিহাস তাহাই প্রমাণিত করে। কিন্তু ঐতিহাসিক যুগে হিন্দুর সামাজিক জীবনে যত প্রকার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তন্মধ্যে একটী বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়—কলিবর্জ্জ্য বিধান। মুসলমান আক্রমণের পূর্ব্বে খৃষ্টীয় প্রথম সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত হিন্দুর জীবন মোটামুটি এক ধারায় অতিবাহিত হইয়া আসিতেছিল। ইহার পরে একটী গভীর বিচ্ছেদের রেখা ক্রমশঃ স্পষ্ট হইয়া উঠে। এইজন্য মনে হয় কলিবর্জ্জ্য-বিধান যেন একটী অধিত্যকা বিশেষ। এক দিকে নানা-শ্রৌতানুষ্ঠান-সঙ্কুল সামাজিক জীবন এক খাতে বহিয়া চলিয়াছে। অপর দিকে হিন্দুর জীবনের ধারা নানাভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া অন্য খাত আশ্রয় করিল। এক দিকে প্রাচীন হিন্দুর নিবাসভূমি, অপর দিকে অর্ব্বাচীন হিন্দুর দেশ। এই অধিত্যকার অপর পার্শ্বের প্রাচীন হিন্দু-নিবাসের কিছু পরিচয় দিতে চাহি।

আর্য্যজাতির সকল শাখাই অগ্নির উপাসক—বিশেষতঃ ভারতের বেদপন্থী সমাজ। ঋগ্বেদের প্রথম মন্ত্র অগ্নির স্তুতি মুখেই স্ফুরিত হয়। অগ্নিস্থাপনার সাধারণ নিয়ম ছিল—জাত-পুত্র, কৃষ্ণকেশ অগ্নির আধান করিবে। সেইজন্য কোন কোন শাখার ব্রাহ্মণ-পরিবারে কুমার জন্মিবামাত্র অরণি মন্থন করিয়া অগ্নিস্থাপন করিয়া তাহাতেই আয়ুষ্য অর্থাৎ জাতকের দীর্ঘায়ুঃ কামনায় হোম, তাহাতেই চূড়া, উপনয়ন, বিবাহ প্রভৃতি ক্রিয়া সম্পন্ন হইত। ইহার নাম জাতারণি-পরিগ্রহ বা প্রজারণি পরিগ্রহ। উপনয়নের পর গুরুগৃহে বাস-ব্রহ্মচর্য্য। প্রতিবেদ-শিক্ষার জন্য ১২ বৎসর বা ৫ বৎসর ধরিয়া সর্ব্ব-সমেত ৪৮ বা ২০ বৎসর—কিংবা একটী বা দুইটী বেদ পাঠের জন্য সেই অনুপাতে গুরুগৃহে বাস। তাহার পর সমাবর্ত্তন হইতে পারিত। কিন্তু কোন কোন ব্রহ্মচারী চিরজীবন এইভাবে কাটাইতেন। তাঁহারা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। গুরু অবর্ত্তমানে গুরুপত্নীকে তাঁহারি প্রতিনিধিরূপে মনে করিয়া তাঁহার পাদমূলে জীবনযাপনও বিহিত ছিল। ভিক্ষালাভ তাঁহাকে নিবেদন, তাঁহার পাদবন্দনা ও পাদসেবা ও উচ্ছিষ্ট গ্রহণ কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত হইত। ইহার নাম গুরুদারে গুরুবদ্‌বৃত্তি।

সমাবর্ত্তনের সময় কর্ত্তব্য ছিল—গুরুর আদেশ-মত তাঁহাকে দক্ষিণাদান। কিন্তু তাঁহার ঋণ কে শোধ করিতে পারে? সামবেদ বলেন—সকল ধনরত্নপূর্ণ পৃথিবী দানেও গুরুর ঋণ শোধ হয় না। পুনরায় দিবার অপেক্ষা থাকে। কিন্তু আদেশ মত দক্ষিণা দান সহজ নহে, সম্ভবও নহে। বরতন্তু-শিষ্য কৌৎস চতুর্দ্দশ বিদ্যাশিক্ষার দক্ষিণাস্বরূপ চতুর্দ্দশকোটি স্বর্ণমুদ্রা দিতে আদিষ্ট হন—ইহা রঘুবংশের কাহিনী। সেইজন্য অনুকল্পের ব্যবস্থা ছিল। যথা গো-দান। কারণ গাভীর মূল্যের পরিমাপ হয় না—এইরূপ শ্রুতির বচন। অনুকল্পের মাত্রা কমিতে কমিতে গুরুর সন্তোষকর যৎকিঞ্চিৎ দ্রব্য হইলেও চলিত।

ব্রহ্মচারীর আহার্য্য-বিষয়ে নানা বিধিনিষেধ। মধু ও মাংস বর্জিত। গুরুর সঙ্গে নিমন্ত্রিত হইলে তাহাকে সমস্যায় পড়িতে হয়, তাঁহাকে সমাংস মধুপর্ক নিবেদন করে—তাঁহাকে গন্ধ, মাল্য প্রভৃতি উপহার দেয়। পিতা কিংবা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও কোন কোন ক্ষেত্রে তাহাকে উচ্ছিষ্ট দিতে উদ্যত হইতে পারেন। কিন্তু তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ ভোজ্যাদি ভিন্ন এরূপ উচ্ছিষ্ট গ্রহণে আপত্তি ছিল না। ইহার নাম—উচ্ছিষ্টাপবর্জন।

সমাবর্ত্তন স্নানের পূর্ব্বে ব্রহ্মচারীর ও পরে বিবাহ পর্য্যন্ত স্নাতকের কমণ্ডলু ধারণের প্রথা ছিল। তৃতীয় ও চতুর্থ আশ্রমেও ইহা বিহিত। ইহাদিগকে মৃন্ময় বা কাষ্ঠময় কমণ্ডলু সর্ব্বত্র লইয়া যাইতে হইত। তাহার জলেই স্নান, আচমন ও শৌচ। কিন্তু সে জল অন্যের নিকট অশুচি এবং অব্যবহার্য্য। মন্ত্রপাঠ-সহ জল ভরিতে হইত। ভগ্ন বা নষ্ট হইলে মন্ত্রপাঠ-সহ অন্য একটী গ্রহণ করিতে হইত।

আচমনের জল উন্মুক্ত প্রান্তর হইতে অনেক সময়ে সংগ্রহ করিতে হইত। জল ব্যবহার্য্য কিনা স্থির করিবার কতকগুলি নিয়ম ছিল। ভূমিতে বা শিলাতে পতিত জল গাভীতে তৃপ্তি সহকারে পান করিলে, তাহা আচমনাদির যোগ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল। বর্ষাকালে তিনদিন এবং অন্য ঋতুতে দশদিন পরে বৃষ্টি জল ব্যবহার্য্য বলিয়া বিহিত ছিল।

দ্বিতীয় আশ্রম গার্হস্থ্য। ইহাতে গৃহিণী এবং অগ্নিশালা উভয়ের প্রয়োজন। অগ্নিস্থাপনার কাল—কোন কোন শাখায় পুত্রের জাতকর্ম্মের সময় বিহিত হইলেও, সাধারণতঃ বিবাহের সময় বা দায়গ্রহণের সময় ইহার আরম্ভ হইত। যতদিন গৃহিণী ততদিন অগ্নিচর্য্যা কর্ত্তব্য। পত্নী গত হইলে, ইহার জন্য পুনর্দার গ্রহণও বিহিত। কারণ যে অপুত্রক ও নিরগ্নিক তাহার আশ্রমান্তরে অধিকার নাই। অগ্নিত্যাগে পুত্রহত্যার পাপ। যে করে সে শূদ্রসম ও প্রায়শ্চিত্তার্হ। অগ্নিহোত্র এক দীর্ঘসত্রসম, বার্দ্ধক্যে ইহার পরিসমাপ্তি—মৃত্যু ইহা হইতে নিষ্কৃতি দেয়। কিন্তু অগ্নিহোত্র পালন সকলের পক্ষে বা সর্ব্বাবস্থায় সম্ভব নহে। রাজা বা ধনীর সাহায্যে এক স্থলে নিশ্চিন্তে জীবনযাপন করিতে পারা আবশ্যক। এই জন্যই সেকালের গৃহস্থের পক্ষে দীর্ঘকাল প্রবাসে থাকা নিষিদ্ধ ছিল। বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে কুশল না হইলে ইহা দুঃসাধ্য এবং সেরূপ ক্ষেত্রেও ইহা নিষিদ্ধ।

অগ্নিহোত্র প্রভৃতি শাস্ত্রীয় কর্ম্মের জন্য সবর্ণা ধর্ম্মপত্নীর প্রয়োজন। কিন্তু তিন বর্ণেরই সবর্ণা ভিন্ন অন্য স্ত্রী বিবাহ করার প্রথা ছিল। কেবল উচ্চবর্ণা-সংগ্রহ নিষিদ্ধ। সুতরাং ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের ক্রমান্বয়ে ৪, ৩, ২, ও এক পত্নী শাস্ত্রানুসারে হইত। উশনাঃ বলেন—ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়া-জাত পুত্র, ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যাজাত পুত্র এবং বৈশ্যের শূদ্রাজাত পুত্র পিতৃবর্ণ। বিষ্ণুর মতে এরূপ সন্তান মাতৃবর্ণ। পরে এরূপ সন্তান অবান্তর জাতিভুক্ত হয়। এরূপ প্রথায় অসবর্ণ ভ্রাতা, ভগিনী প্রভৃতি অনায়াসেই হইতে পারিত। এবং এরূপ ক্ষেত্রে পরস্পর অশৌচ কিরূপ হইবে, তাহারও বিধান দেখা যায়। কাহারও মতে দায়ভাগে সবর্ণাজাত পুত্র থাকিতে অসবর্ণ পুত্র অনধিকারী। অপরের মতে বর্ণানুসারে ৪, ৩, ২, ১ এই অনুপাতে দায়ভাগ হইবে। মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাস-প্রণেতা বৈদ্য বলেন যে, মধ্যদেশ ভিন্ন অন্যত্র ক্ষত্রিয়গণ অসবর্ণা বিবাহ প্রায়ই করিত। এইজন্য তাহাদের মধ্যে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় লোপ পায়। এবং এই কারণেই দাক্ষিণাত্যের স্মার্ত্তগণের প্রভাবে এ যুগে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ছাড়া অন্য বর্ণ নাই—এই মত প্রসার লাভ করে।

হোমের আগুন জ্বালিবার জন্য মুখে ফুৎকার দিবার নিয়ম ছিল। শুধু যজ্ঞীয় অগ্নির স্থলে এই বিধান, অন্যত্র যথা গৃহস্থালির আগুন জ্বালাইবার জন্য ইহা নিষিদ্ধ। বর্ত্তমানে দুইই নিষিদ্ধ হওয়ায়, যজ্ঞে কাঠের নল ও ব্যজনের ব্যবহার দেখা যায়। যজ্ঞে আহুতি দিবার জন্য একটি ছোট এবং আর একটি বড় হাতার প্রয়োজন। ছোটটীতে লইয়া ঘৃত প্রভৃতি বড়টীতে ঢালিয়া পরে অগ্নিতে সমর্পণ করিতে হইত। ছোটটীর নাম স্রুব, বড়টীর নাম স্রুক্। যজ্ঞ-শেষ-গ্রহণের জন্য স্রুক্-লেহনের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু যজ্ঞীয় পাত্র বলিয়া তাহার মার্জন বা শুদ্ধির প্রয়োজন হইত না। ইহার নাম অগ্নিহোত্রহবনীর লেহন ও লীঢ়াবস্থায় পরিগ্রহ।

যজ্ঞ তিন প্রকারের—ইষ্টি, পশু ও সোম। সোম যাগের বিশেষ গৌরব। যে ব্রাহ্মণের গৃহে তিন বৎসরের সামগ্রী সঞ্চিত, তাঁহারই সোমপানে অধিকার। আবার সোমবিক্রেতাও ব্রাহ্মণ, কিন্তু তাহার অশেষ দুর্গতি। সোম ক্রয় করিতে হইত গাভীর বিনিময়ে। কিন্তু বিক্রেতাকে সোম মূল্য গাভীটি দিবার পর, তাহার হস্ত হইতে কাড়িয়া লইয়া উহা পুনরায় গোশালায় রাখা হইত। এবং বিক্রেতা কোনরূপ আপত্তি করিলে শবল (অর্থাৎ বিচিত্রবর্ণের) যষ্টি দ্বারা তাহাকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দেওয়া হইত। ইহার নাম সোম—বিক্রয়।

ব্রাহ্মণের সোমপানে অধিকার—কিন্তু সুরাপান নিষিদ্ধ। ইহার অন্যথা হইত সৌত্রামণী নামক যাগে। সুত্রামা ইন্দ্রের নাম। দেবতার নামে যাগের নাম। সৌত্রামণী একপ্রকার পশুযাগ। ইহার পশু ঋষভ। ইহাতে সোমের পরিবর্ত্তে সুরা বিহিত ছিল। অতিরিক্ত সোমপানের পর ক্ষালনার্থও

সৌত্রামণীর বিধান ছিল। ব্রাহ্মণের পক্ষে সুরাপান নিষিদ্ধ থাকায়, শুধু সুরাপানার্থ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকে প্রতিনিধি কল্পনার বিধান ছিল। সুরার অনুকল্পরূপে দুগ্ধও প্রযুক্ত হইত।

পশুযাগে ঋত্বিক্‌কেই পশুবধ করিতে হইত। এরূপ ঋত্বিকের বিশিষ্ট নাম—শমিতা। শ্বাসরোধ করিয়া মুষ্ট্যাঘাতে যজ্ঞীয় পশুর নিধন হইত। ইহাকে সংজ্ঞপন বলিত। পশুযাগের মধ্যে নরমেধ, গোমেধ ও অশ্বমেধ আধুনিক হিন্দুর নিকট বিশেষ চমকপ্রদ। গোসব, গোসত্র, শূলগব গোমেধ পর্য্যায়ের। নরমেধ আর্য্যভারতে প্রকৃতই প্রচলিত ছিল কিনা—এ বিষয়ে পণ্ডিতসমাজে মতদ্বৈধ। যজুর্ব্বেদের ত্রিংশ অধ্যায়ে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এবং বিভিন্ন ফললাভের জন্য নানা শ্রেণীর মানুষ-বলি দিবার বিধান আছে। নরমেধের বিশেষ ফল সম্বন্ধে তান্ত্রিক ও স্মার্ত্ত উভয় সম্প্রদায়ে প্রবল ধারণা। ধর্ম্মসিন্ধু নামক স্মার্ত্তনিবন্ধে নরমেধের ফললাভের জন্য আষাঢ় শুক্লাদশমীতে বামন পূজার বিধান আছে। ঐতরেয় ও কৌষীতকি ব্রাহ্মণে কাহিনী আছে যে—রাজা হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিতের অনুরোধে দরিদ্র ব্রাহ্মণ অজীগর্ত্ত নিজের একমাত্র পুত্র শুনঃশেপকে স্বহস্তে বলি দিতে সম্মত হয়! বরুণদেবের স্তুতি করিয়া শুনঃশেপ নিষ্কৃতি পায় এবং দেবরাত নামে খ্যাত হয়—তখন বিশ্বামিত্র তাহাকে জ্যেষ্ঠ পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। এই গল্পে পুত্রের উপর পিতার অব্যাহত ক্ষমতা, দত্তক গ্রহণের রীতি, এবং জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিশেষ দায়াধিকার সূচিত।

দীর্ঘকালব্যাপী যাগের নাম সত্র। ১২ দিনের অন্যূন কালে ইহার অনুষ্ঠান। এই সকল যাগ দ্বাদশ সম্বৎসর, শত সম্বৎসর, সহস্র সম্বৎসরে সমাপ্ত হইত বলিয়া বর্ণনা পাওয়া যায়। এ সকল স্থলে সম্বৎসর পারিভাষিক শব্দ—অর্থ দিবস। সত্র একরূপ বারোয়ারি অনুষ্ঠান। সপ্তদশ হইতে চতুর্বিংশতি সংখ্যক ঋত্বিক্ নিযুক্ত হইত। ঋত্বিকের সহিত যজমানও ইহাতে যোগ দিত। ইহার সম্পাদন দুরূহ ব্যাপার—ইহা সহজেই বুঝা যায়। তাই একস্থলে বলা হইয়াছে—বর্ষব্যাপী যজ্ঞ সম্পাদন সমুদ্র অতিক্রম করার সমান।

যাজন ব্রাহ্মণের একটী মুখ্য বৃত্তি। সেই জন্য শ্রেশ্রৌত কর্ম্মের পরিচয় গার্হস্থ্যের প্রথমেই আসিয়া পড়ে। এই প্রসঙ্গে আর একটী আচার উল্লেখযোগ্য। দেবপূজার প্রাবল্যের যুগে অনেক সময় যাবজ্জীবন কোন বিগ্রহ-সেবার ভার গ্রহণ করিতে হইত। কোন কোন স্থলে ধর্ম্ম-সাক্ষিক সঙ্কল্প করা হইত। এরূপ শিবপূজক হরদ্বিজ এবং বিষ্ণুপূজক বৈখানস নামে পরিচিত হইত। তাহারা দেবলের মত সমাজে কিছু হেয় হইয়া থাকিত।

গৃহস্থের ধর্ম্ম অতিথি-সৎকার। সম্মানিত অতিথির সমাদরের বিশিষ্ট রীতি ছিল। সম্মানিত অতিথি অর্থে ঋষি, বিদ্বান্, রাজা, ক্রিয়াকালে উপস্থিত বর ও ঋত্বিক্ এবং বৎসরান্তে সমাগত মাতুল। ইঁহাদের জন্য সমাংস মধুপর্কের ব্যবস্থা ছিল। উত্তররামচরিতের "বৎসতরী মড়মড়ায়িতা" এস্থলে স্মরণীয়। মাধুপর্কিক পশু বলিতে গো, ছাগ, বৃষ বুঝায়। কিন্তু পশুবধ অতিথির ইচ্ছাসাপেক্ষ। হয় তিনি বলিতেন—(ওম্) আচ্ছা, বধ কর এবং সেই সাথে "আমার পাপ নষ্ট হইল" এই মর্ম্মে তিনবার মন্ত্রপাঠ করিতেন। অথবা তিনি বলিতেন—রুদ্রগণের মাতা, বসুগণের কন্যা, আদিত্যগণের ভগিনী, অমৃতের নাভিস্বরূপা, সাক্ষাৎ অদিতি-সমা এই নিরপরাধা গাভী—ইহাকে বধ করিও না। শ্রুতিতে গো-বধ যে নিষিদ্ধ তাহার প্রমাণস্বরূপ এই দ্বিতীয় অংশটী স্মার্ত্তগণ উদ্ধৃত করিয়া থাকেন।

গৃহস্থের অপর কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধ। শ্রাদ্ধেও পশুবধের বিধান ছিল। হেমন্ত ও শীত ঋতুর কৃষ্ণপক্ষের চারিটী অষ্টমীতে অষ্টকা-শ্রাদ্ধ করিতে হইত। এবং তাহাতে ইন্দ্র, বিশ্বদেব, প্রজাপতি এবং পিতৃগণের উদ্দেশে পিষ্টক, মাংস, শাক উৎসৃষ্ট হইত। গো-বধ নিষিদ্ধ হওয়ায় কোন কোন শাখায় এই অষ্টকা শ্রাদ্ধও উৎসন্ন হইয়াছে।

প্রাচীনকালে বিভিন্ন বর্ণের জন্য বিভিন্ন বৃত্তি নির্দ্ধারিত ছিল। ব্রাহ্মণের বৃত্তি যাজন, অধ্যাপন এবং প্রতিগ্রহ। এই তিনের অভাবে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের বৃত্তি গ্রহণও অনুমত ছিল—কিন্তু অবাধে নহে। তাই কোন ঋষি বলেন—ক্ষাত্রধর্ম্ম অত্যুগ্র—তাহা ব্রাহ্মণের অবলম্বনীয় নহে। বৈশ্য-বৃত্তি গ্রহণ করিলেও সকল প্রকার পণ্যের কারবার উচিত নহে। কৃষি করিলেও যাহাতে হলবাহী জীব সংখ্যায় বেশী হয়—তাহা দ্রষ্টব্য। সেবা—শূদ্রের বৃত্তি—কখনই অবলম্বনীয় নহে—ইহা অনেকের মত। নিম্ন জাতির যাজন ও প্রতিগ্রহ বরং বিহিত। এসকল আপদ্ বৃত্তি।

গৃহস্থের আদর্শ ছিল—অলোভ ও অসঞ্চয়। এই আদর্শের অনুগত শ্রেষ্ঠ বৃত্তি যাহার, তাহার নাম যাযাবর। কারণ বর বা শ্রেষ্ঠ বৃত্তিতে তাহার দিন যায়। যে এক বৎসরের জন্য সঞ্চয় করে সে কুসূলধান্য। যে ছয় মাসের জন্য সঞ্চয়ী সে কুম্ভীধান্য। যে ক্ষেত্র হইতে গুচ্ছ করিয়া কুড়াইয়া লয়—সে উঞ্ছবৃত্তি। যে একটি করিয়া শীষ তুলিয়া লয় সে শীলবৃত্তি। যে পরদিনের জন্য সঞ্চয় করে না—সে অশ্বস্তনিক। ইহার মধ্যে যেটী যত শেষ, সেটী তত উত্তম।

পাচক ও ব্রাহ্মণ আজকাল প্রায় প্রতিশব্দে দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু এককালে চৈত্রবর্ণিকের গৃহে শূদ্রপাচক নিযুক্ত হইত। তাহাকে নিয়মিত ক্ষৌর, নিত্য স্নান প্রভৃতি শৌচসম্বন্ধে বিশেষ নিয়ম পালন করিতে হইত। এই রীতি বহুদিন প্রচলিত ছিল। পরে নিবন্ধকারগণ পক্কান্ন ও আমান্ন, আর্দ্র ও শুষ্কঅন্ন, সৎশূদ্র ও অসৎশূদ্র প্রভৃতি নানা ভেদ করিয়া, প্রাচীন নিয়ম ও পরবর্ত্তী দেশাচারের সমন্বয় করিতে চেষ্টা করেন। দ্বাদশ শতাব্দীর নিবন্ধকার বিজ্ঞানেশ্বর যাজ্ঞবল্ক্যশ্লোকের ব্যাখ্যায় বিনা আপত্তিতেই লিখিয়াছেন—দাস, গোপাল, কুলমিত্র ও অর্দ্ধসীরী (ভাগচাষী) এই সকল পর্য্যায়ের শূদ্র ভোজ্যান্ন।

জন্ম-মৃত্যু সাংসারিক জীবনের নিত্য ঘটনা। ইহাতে শাস্ত্রীয় কর্ম্মে বাধা বটে—ইহা এদেশের চিরন্তন ধারণা। আধুনিক সময়ে অশৌচ কাল নির্দ্ধারিত। কিন্তু পূর্ব্বকালে নানা কারণে তাহার সঙ্কোচ হইতে পারিত। "যজ্ঞে দীক্ষিত ঋত্বিক্, ব্রহ্মচারী ও রাজার কোনরূপ অশৌচ হয় না"—ইহা কোন ঋষির মত, কারণ "ইহারা ইন্দ্রপদে আরূঢ়—ব্রহ্মভূত।" শিল্পী, কারুজীবী, রাজার আজ্ঞাকারী, সূপকার, বৈদ্য, নাপিত প্রভৃতির সদ্যঃশৌচ—অশৌচ হইবামাত্র তাহার শেষ। আরও একটী প্রথা ছিল—অশৌচকালের তৃতীয় ভাগ অতীত হইলে, অস্থিসংগ্রহ করিয়া গঙ্গা প্রভৃতিতে নিক্ষেপ। ইহার পর দেহ শুদ্ধ হইত। এবং তখন মৃতের সপিণ্ডগণের গৃহে অন্যের ভোজন অনুমত ছিল।

দ্বিতীয় আশ্রমের পর তৃতীয় ও চতুর্থ আশ্রম—বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। বৃদ্ধযাজ্ঞবল্ক্য বলেন—ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চারি বর্ণের ক্রমান্বয়ে চারি, তিন, দুই ও এক আশ্রম। কাঠক গৃহ্যের মতে তিন বর্ণেরই চারি আশ্রম। বেদপন্থী ভারতে জীবনের অবসান একটা কঠোর তপস্যা। সাধ্যমত এড়াইবার চেষ্টা করিয়া শক্তিহীন অবস্থায় মৃত্যুর কবলিত হওয়া এদেশের প্রাচীন আদর্শ নহে। ইচ্ছামৃত্যু ছিল সাধনার বস্তু। বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—সেই সাধনার ক্রম।

সন্ন্যাসে কাহারও মতে শুধু ব্রাহ্মণের অধিকার—অন্যের মতে তিন বর্ণের। সন্ন্যাসী চারি প্রকারের। কুটীচক, বহূদক, হংস ও পরমহংস। প্রথম দুইটী ত্রিদণ্ডী, কতকটা গৃহস্থভাবাপন্ন, অপর দুইটী তীব্র-বিরক্ত, একদণ্ডী। প্রকৃত ত্যাগ-বৈরাগ্যের স্থলে সন্ন্যাস সকল যুগেই প্রশস্ত। সেইজন্য পরে যে নিষেধ আসিয়া পড়ে, তাহা ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসের। সন্ন্যাসের অপর ভেদ—বিদ্বৎ-সন্ন্যাস ও বিবিদিষা-সন্ন্যাস—জ্ঞানীর ও জিজ্ঞাসুর সন্ন্যাস—বিরক্তের সন্ন্যাস ও বৈরাগ্যসাধকের সন্ন্যাস বিদ্বৎসন্ন্যাস সকল যুগে প্রশস্ত এবং সেই একই হেতুতে। যে প্রকৃত সংসার-বিরাগী তাহার জন্য সন্ন্যাসের পথ সর্ব্বদা মুক্ত। শ্রুতির কথা—যেদিনই বিরক্ত হইবে—সেইদিনই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে। ইহাই পরে সন্ন্যাস-নিষেধের সূক্ষ্ম তাৎপর্য্যে দাঁড়ায়।

কোন্‌টী সৎপ্রতিগ্রহ, কোন্‌টী অসৎপ্রতিগ্রহ—অর্থাৎ কাহার দান লওয়া উচিত এবং কাহার নিকট নহে—এবিষয়ে গৃহস্থের পক্ষে নানা বিচারের প্রয়োজন থাকিলেও সন্ন্যাসীর পক্ষে ছিল না। তাহার পক্ষে নিয়ম ছিল—গ্রামে একরাত্রি এবং তীর্থ ও নগরে পাঁচরাত্রি বাস করিবে, পাণিপাত্র বা উদরপাত্র হইয়া চতুর্বর্ণের নিকট ভিক্ষা করিবে। কেবল অভিশপ্ত এবং পতিতকে বর্জন করিবে। আরও নিয়ম ছিল যে, যখন পরিজনের আহার শেষ হইয়াছে—যখন মুষল নিস্তব্ধ, অঙ্গার যখন নির্ব্বাপিত, সেইরূপ সায়াহ্নে গ্রামে প্রবেশ করিয়া গৃহস্থের বাটীতে আশ্রয় করিবে।

বৃদ্ধ ও জীর্ণের পক্ষে স্বেচ্ছায় জীবনাবসানের বিধান ছিল। যখন শরীর ভগ্ন ও বিকল—তখন মহাপ্রস্থান কিংবা জল প্রবেশ বা অগ্নিপ্রবেশ কিংবা পর্ব্বত হইতে লাফ দিয়া পড়িয়া স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করা শাস্ত্রে বিহিত ছিল। মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপও কখন কখন এরূপ মৃত্যু উপদিষ্ট হইত। কুমারিল ভট্ট সপ্তম শতাব্দীতে প্রয়াগে তুষানলে প্রাণত্যাগ করেন—ইহা প্রাচীন জনশ্রুতি।

গুরুতর পাপের জন্য স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণরূপ প্রায়শ্চিত্তের

আর একটী দৃষ্টান্ত—পরোদ্দেশাত্ম-সংত্যাগ। গোব্রাহ্মণ রক্ষার জন্য অপরাধী ব্যক্তি দস্যুপথে কুটীর-নির্ম্মাণ করিয়া দিনযাপন করিত। গ্রাম আক্রান্ত হইলে গো ব্রাহ্মণের প্রাণরক্ষার্থ কিংবা ব্রাহ্মণের সম্পত্তি উদ্ধারার্থ সে প্রাণ-পণ করিত। এরূপ সংগ্রামে হত বা জয়ী হইলে তাহার পাতক দূর হইত।

প্রাচীন হিন্দুজীবনের এই যে একটী কল্পিত সংলগ্ন বৃত্তান্ত দেওয়া হইয়াছে—কালিদাসের ভাষায় "অসন্নিবৃত্ত্যৈ তদতীতমেব।" সে ছবি মুছিয়া গিয়াছে, তাহা ফিরিবার নহে। শুধু কালই যে উহাকে বাতিল করিয়াছে, তাহা নহে। উহার মধ্যে যে সকল আচার অন্তর্ভুক্ত—বিভিন্ন প্রদেশের সমাজপতি নিবন্ধকারগণ প্রায় একবাক্যে ঘোষণা করিয়াছেন—সেগুলি অচল, এযুগে বর্জনীয়। হিন্দুর জীবনের কর্ত্তব্যগুলি ধর্ম্ম এই সাধারণ নাম-সূত্রে কিরূপ ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তথাপি একপ্রকার বিভাগ সম্ভব। উল্লিখিত আচারগুলি শ্রৌত-কর্ম্ম, আশ্রমধর্ম্ম এবং শৌচ ও প্রায়শ্চিত্ত-সম্পর্কিত। অর্থাৎ যাজ্ঞবল্ক্যের পরিভাষায় আচার ও প্রায়শ্চিত্ত অধ্যায়ে উহাদের স্থান। অবশিষ্ট আছে—ব্যবহার অর্থাৎ রাজদ্বারে গ্রাহ্য বিবাদসম্পর্কিত আচার।

ব্যবহারক্ষেত্রেও প্রাচীন সময় হইতে আধুনিক যুগ কত পরিবর্ত্তিত, তাহার কয়েকটী দৃষ্টান্ত সংক্ষেপে উল্লেখ করি। প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে পিতাপুত্র বিরোধে সাক্ষ্য দেওয়া দণ্ডার্হ ছিল। যেযুগে পিতার ক্ষমতা অসীম—পরিবার-বর্গের সকল স্বত্ব ও অধিকার তাঁহাতে নিহিত—যাহাকে patria potestas বলে—সেযুগে পরিবারস্থ কোন অধীন ব্যক্তির তাঁহার বিরুদ্ধে রাজদ্বারে অভিযোগ বা স্বত্ব সাব্যস্তের প্রার্থনা করা অসম্ভব। ইহা আদিম যুগের কথা। এরূপ ক্ষেত্রে সাক্ষ্যদানও দোষাবহ। এবং রাজকীয় বিচারও সঙ্গত নহে। বহুপূর্ব্বে এব্যবস্থা যে অচল হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ কৌটিল্যের যুগ হইতেই পাওয়া যায়। এরূপ বিবাদে কে সাক্ষী হইবার যোগ্য, তাহা অর্থশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর নিবন্ধ-কারগণ স্পষ্টই লিখিয়াছেন যে, বিবাদের কারণ যেখানে সামান্য, সেখানে প্রাচীন নিয়ম প্রযোজ্য। কিন্তু পুত্রের শাস্তিবিধানে পিতা যদি শাস্ত্রীয় নির্দ্দেশের সীমা লঙ্ঘন করেন কিংবা অযথা পৈতৃক সম্পত্তি নষ্ট করেন, তাহা হইলে রাজদ্বারে বিবাদ ন্যায্য। এখন ইহা অতীতের ক্ষীণস্মৃতিতে দাঁড়াইয়াছে।

ব্রাহ্মণ অবধ্য—ইহা ধর্ম্মশাস্ত্রের অসংখ্যস্থলের অনুশাসন। তাহার শাস্তি নির্ব্বাসন। কিন্তু আততায়ী ব্রাহ্মণ বধ্য—ইহাও শাস্ত্রের বিধান। ইহাতে আত্মরক্ষায় সকলের অধিকার স্বীকৃত। আততায়ী অর্থে যে অগ্নি দান বা বিষদান করে, যে শস্ত্র দ্বারা আঘাত করিতে উদ্যত, যে ক্ষেত্র বা মূল্যবান্ সম্পত্তি জোর করিয়া কাড়িয়া লয় কিংবা যে স্ত্রীচৌর। যুদ্ধের দক্ষিণা লইয়া উগ্র কলহেও আত্মরক্ষার্থ ব্রাহ্মণকে আঘাত অনুমত। এই সকল প্রাচীন নিয়ম সঙ্কুচিত করিয়া ব্রাহ্মণের অবধ্যতা অষ্টম শতাব্দী ও তৎপরবর্ত্তী নিবন্ধ সমূহে স্থাপন করিবার চেষ্টা দেখা যায়। কলিকালে আততায়িব্রাহ্মণবধের নিষেধ তাহারই পরিণাম। ইহা ব্রিটিশ রাজত্বকালের পূর্ব্বপর্য্যন্ত সমাজের মনে মুদ্রিত ছিল। লর্ড বেন্টিঙ্কের একটী বিবরণীতে (minuteএ) লিখিত হইয়াছে—To this day in the Hindu states, the life of a Brahmin is still held sacred। এবং ইংরাজ সরকারকে বিশেষ আইন করিয়া ফৌজদারী অপরাধের জন্য ব্রাহ্মণের প্রাণদণ্ডার্হতা বিধান করিতে হয়। গল্প আছে, রাজা নন্দকুমারের ফাঁসীতে অনেকে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া পার হইয়া পশ্চিমতীরস্থ গ্রামসমূহে বাস স্থাপন করে।

দুঃস্থ ব্রাহ্মণের একটী অধিকার ছিল—তিনদিন অনা-হারের পর চৌর্য্য—প্রথমে হীনবর্ণ হইতে, তদভাবে উচ্চবর্ণ হইতে। অভিযুক্ত হইলে রাজার নিকট অকপটে দোষ-স্বীকার করিতে হইত এবং রাজা তাহার দেহধারণের ব্যবস্থা করিতেন। এরূপ অপহৃত দ্রব্যে স্বত্ব জন্মে কি না—নিবন্ধ-কারগণ তাহার সূক্ষ্ম বিচার করিয়াছেন। কিরূপে স্বত্ব জন্মে—এবিষয়ে হিন্দু আইনে দুইটী বিভিন্ন মত আছে। একদল বলেন—স্বত্ব লৌকিক পদার্থ, লৌকিক উপায়ে তাহা অর্জিত হয়। অন্য দলের মতে শাস্ত্রে যাহার যেরূপ বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইয়াছে—তদ্দ্বারা অর্জিত ধনে তাহার স্বত্ব উৎপন্ন হয়। লৌকিক স্বত্ববাদিগণ আলোচ্য প্রথার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, চৌর্য্য দ্বারাও স্বত্ব উৎপন্ন হইতে পারে কারণ তিন দিন অনাহারী ব্রাহ্মণ যাহা অপহরণ করে—

তাহাতে তাহার নিশ্চয়ই স্বত্ব আছে; সুতরাং শাস্ত্রীয় উপায় ভিন্ন অধিগত ধনেও স্বত্ব জন্মে। যাহা হউক, এই হীন যুগে এরূপে স্বত্ব অর্জনের উপায় নিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু নিষিদ্ধ হইলেও প্রাচীন প্রথা একেবারে সমাজ জীবন হইতে মুছিয়া যায় নাই। মনীষী জয়স্বাল বলিতেছেন—ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি ক্ষেত্র হইতে মুষ্টিমাত্রায় গ্রহণ করিলে—তাহা চৌর্য্য বলিয়া গণ্য হয় না—ইহা এখনও গ্রাম্য জনপদের প্রচলিত নিয়ম।

এদেশের প্রাচীন ব্যবহার-শাস্ত্রে দায়ভাগ-বিষয়ে একটী বিশেষ নিয়ম দেখা যায়। উহা জ্যেষ্ঠ পুত্রের জন্য অতিরিক্ত অংশ-কল্পনা। ইহাকে উদ্ধার-বিভাগ বা জ্যেষ্ঠাংশ বলে। এককালে পরিবারবর্গের উপর পিতার অসীম প্রভুতা ছিল। স্বত্ব এবং অধিকার তাঁহার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ পুত্রে বর্ত্তিত। তখন পিতার স্থলাভিষিক্ত হইত জ্যেষ্ঠ পুত্র। শ্রুতিতে একমাত্র জ্যেষ্ঠের দায়হরণ এবং সকল পুত্রের সমানাংশ প্রাপ্তি—এই দুয়েরই অনুকূল বচন পাওয়া যায়। কাল-ক্রমে জ্যেষ্ঠের এই বিশেষ অধিকার সঙ্কুচিত হইয়া একটী অধিক বিংশ ভাগ, কিংবা অন্যান্য ভ্রাতার দ্বিগুণ অংশ কিংবা কতকগুলি মূল্যবান্ বা উত্তম বস্তু লাভে দাঁড়ায়। কোন কোন সংহিতায় জ্যেষ্ঠ, মধ্যম ও কনিষ্ঠের স্বতন্ত্র ভাগ পরিমাণের বিধানও আছে। এরূপ অসমান দায় বিভাগ যে লোকের অনভিপ্রেত—তাহা মিতাক্ষরায় লিখিত হইয়াছে। কিন্তু কোন কোন নিবন্ধকার সমাজের ইহা অভিপ্রেত এরূপ মতও প্রকাশ করিয়াছেন। এই মত-বিরোধের অবসান কলিবর্জ্য বচনের দ্বারা নিষ্পাদিত হইয়াছে।

ব্যবহার-ক্ষেত্রে আর একটী নিষিদ্ধ আচার—নানাবিধ পুত্র-প্রতিনিধি-গ্রহণ। দ্বাদশবিধ পুত্রের কথা প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে চারিটী (১) আত্মজ—যথা ঔরস বা ধর্ম্মপত্নীজ, কানীন বা অনূঢ়াজাত, পুনর্ভূ বা পুনর্বিবাহিতা স্ত্রীর পুত্র, এবং নিযুক্তা কন্যার পুত্র বা পুত্রিকা-সুত। (২) পরজ তিনটী—যথা ক্ষেত্রজ, গূঢ়জ এবং সহোঢ়জ। (৩) লব্ধ দুইটী—যথা অপবিদ্ধ বা সহসাদৃষ্ট বা অপরের পরিত্যক্ত পুত্র এবং স্বয়ং দত্ত। (৪) যাদৃচ্ছিক —দত্তক, কৃত্রিম এবং ক্রীত। আরও কয়েক প্রকার পুত্র উল্লিখিত হইয়া থাকে। যথা পুত্রিকা বা নিযুক্তা কন্যা, শৌদ্র বা শূদ্রাপুত্র, যত্রকচনোৎপাদিত (একপ্রকার ক্ষেত্রজ), এবং দ্ব্যায়ুষ্যায়ণ—দ্বিপিতার পুত্র। শাস্ত্রের বিধানে এখন অন্য সবগুলি বাদ পড়িয়া শুধু ঔরস ও দত্তকে দাঁড়াইয়াছে। সমাজের আদিম অবস্থায় পুত্র প্রবল সহায়- সে প্রয়োজন কালে দূর হয়। এবং পিণ্ড-প্রয়োজনই প্রধান বলিয়া মনে হয়। বিবাহের মধ্যে ব্রাহ্ম বিবাহ, গৃহিণীর মধ্যে ধর্ম্মপত্নী প্রশস্ত বলিয়া স্বীকৃত হয়। অসবর্ণ-বিবাহ ক্রমশঃ নিন্দিত হওয়ায় শৌদ্র পুত্রের দাবী অস্বীকৃত হয় না। বাল্যবিবাহের প্রবর্ত্তনের ফলে কানীন ও সহোঢ়জ এবং সতীত্বের ধারণার উৎকর্ষের ফলে ক্ষেত্রজ ও গূঢ়জ অস্বীকৃত হয়। বিধবা-বিবাহ ক্রমশঃ নিষিদ্ধ হওয়ায় পৌনর্ভব বাদ পড়ে। বাকী পাঁচটী অর্থাৎ ক্রীত, অপবিদ্ধ, স্বয়ংদত্ত, কৃত্রিম এবং দত্তক—প্রায় এক পর্য্যায়ের। দত্তক-গ্রহণ শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান এবং দত্তকের দ্বারা পারলৌকিক উপকার হয়—ইহা ঘোষিত। সেই জন্য ঔরসের সহিত শুধু দত্তক এখনও বলবৎ। তবে নিষেধ সত্ত্বেও অন্যগুলি একেবারে লুপ্ত হয় নাই—ইহা সামাজিক ইতিহাস এবং বর্ত্তমান পরিস্থিতির কথা।

প্রাচীন আচার-ব্যবহারের যে কাহিনী অঙ্কিত হইল—তাহা অতীত হিন্দু-সমাজের সমগ্র বা সর্ব্বাঙ্গীন প্রতিকৃতি নহে। এরূপ কাহারও ভ্রম হইবে, এমত সম্ভাবনাও নাই। কলিবর্জ্য বলিলে মাত্র দুই চারিটী নিষিদ্ধ আচার, যথা অসবর্ণ বিবাহ, বিধবাবিবাহ, নিয়োগ, শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত হিন্দু অনেকেরই মনে পড়ে। কিন্তু ইহা যে একটী বিস্তৃত তালিকা তাহার সূচনা করিবার জন্যই পূর্ব্বোক্ত বিবরণ। কিন্তু এ তালিকায় পড়ে নাই—এমন বহু আচারও ছিল এবং সে সমস্তও এখন লুপ্ত। সুতরাং উপস্থিত বৃত্তান্তে কাহারও বিশেষ কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইবে এমত আশা করি না। প্রকাণ্ড প্রাসাদই যখন ধ্বংস-স্তূপে পরিণত, তখন দুচারখানি কড়ি বরগা, ইট-পাথর বাহির করিয়া দেখাইবার প্রয়োজন কি? উপসংহারে শুধু সেই কথাই সংক্ষেপে বলিতে চাই। কালক্রমে, অবস্থার বিপর্য্যয়ে প্রাচীন সকল জিনিষই পরিত্যক্ত হয়—ইহাতে বিচিত্র কিছু নাই। যদিও সেই অবস্থার বিপর্য্যয় অনুধাবন করাই—ইতিহাসের কাজ। কিন্তু যে সকল আচারের সমষ্টি লইয়া এখানে আলোচনা, সেগুলি শুধু কালের প্রভাবে ধ্বংস-স্তূপে গিয়া পড়ে নাই। এই সকল নিষেধের মধ্যে বিচার-

বিবেচনার এবং শৌচ ও নীতি সম্বন্ধে ধারণার পরিবর্ত্তনের—অবস্থানুসারে স্বেচ্ছায় ব্যবস্থা করিবার চিহ্ন রহিয়াছে। এবং হিন্দু সমাজের গতির ও পরিবর্ত্তনের ধারা অনেক পরিমাণে এগুলিতে সূচিত।

কলিবর্জ্য বিধান প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন হিন্দু সমাজের মাঝে একটী অধিত্যকার মত, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। একেবারে সমতল হইতে মাথা তুলিয়া অধিত্যকা ভূপৃষ্ঠে দেখা দেয় না। ক্রমিক অধিরোধ-অবরোহ প্রকৃতির নিয়ম। যে সকল আচার লুপ্ত হইয়াছে—তাহাদের তিরোভাবও ক্রমিক। আবার প্রায়শঃ নষ্ট হইয়াও—নিষিদ্ধ হইয়াও, পরিবর্ত্তিত আকারে অনেকগুলি এখনও সমাজ-জীবনের প্রাঙ্গণে উঁকি-ঝুঁকি মারিতেছে। কি ভাবে এবং কখন এই সকল আচার নিষিদ্ধ হইয়া পড়ে, তাহার একটু ইঙ্গিত করা প্রয়োজন। কোন কোনটীর সম্বন্ধে অতি প্রাচীন কাল হইতেই সমাজের মনে একটা দ্বিধা, সংশয় ও সঙ্কোচের ভাব প্রকাশ পায়। অনেক স্থলে শ্রুতিতেই সমর্থন ও দোষখ্যাপন দুই-ই দেখিতে পাই। ঋগ্বেদে গো-পর্য্যায়ে অঘ্ন্যা বা অবধ্যা পদ বহুবার ব্যবহৃত। তৈত্তিরীয় সংহিতার এক স্থলে আছে—প্রকৃতই অশ্বমেধ একটী উৎসন্ন যজ্ঞ—কে জানে ইহা সমগ্রভাবে অনুষ্ঠিত হয় কি না? তাই বিচ্যুত অংশগুলির পূরণের জন্য সংস্কৃতি সাম প্রযুক্ত হইত। ধর্ম্মসূত্র ও স্মৃতি সংহিতায় অনেক আচার সম্বন্ধে বিরুদ্ধ উক্তি পাওয়া যায়। বৌধায়ন বলিলেন—উত্তরাপথের অনাচার সমুদ্রযাত্রা, এবং দাক্ষিণাত্যের মাতুল-কন্যা-বিবাহ। ঐ ঐ দেশে প্রচলিত বটে, কিন্তু অন্যত্র অনাচার। আপস্তম্ব নিয়োগের ব্যবস্থা দিয়া বলিলেন—ধর্ম্ম-ব্যতিক্রম এবং সাহস (Violence) প্রাচীন মুনিগণের মধ্যে দৃষ্ট হয়। তেজোবিশেষের জন্য তাঁহাদের দোষ স্পর্শে নাই। একালের লোক অনুকরণ করিলে পতিত হয়। মনু বলিলেন—বিধবা-বিবাহ বিবাহ-বিধিতে উক্ত নহে। পাণিগ্রহণের মন্ত্র কন্যাতেই প্রযুক্ত হয়। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—দ্বিজাতির শূদ্র হইতে যে দারসংগ্রহ তাহা আমার সম্মত নহে। এ সকল উক্তিতে সাধারণ ভাবে নিন্দাখ্যাপন আছে—এগুলি কেবল কলিযুগে বর্জনীয় এ ভাব কোথায়ও সূচিত হইলেও পরিস্ফুট হয় নাই। মনস্বী জয়স্বাল খৃষ্টের শত বৎসর পূর্ব্বে সুঙ্গবংশের রাজত্ব কালে প্রচলিত প্রাদুর্ভূত মনুস্মৃতির সঙ্কলয়িতা সুমতি ভার্গব হন, এরূপ মনে করেন। তাঁহার মতে যাজ্ঞবল্ক্য আরও ১৫০।২০০ বৎসর পরবর্ত্তী। কলিযুগ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা প্রথম দেখা যায়—মনুস্মৃতিতে। মহাভারতে এবং পরবর্ত্তী পুরাণ সাহিত্যের বহু স্থলে—এ যুগ যে স্বাধ্যায় ও শ্রৌতকর্ম্মের ক্রমশঃ লোপের যুগ—ইহা কথিত হইয়াছে। কাত্যায়ন-সংহিতা ও পরাশর-সংহিতা খ্রীষ্টীয় ৩য়।৪র্থ শতাব্দীতে রচিত বলিয়া পরিগণিত। এ দুইটী তুলনা করিলে বুঝা যায়, ইঁহাদের সময়ে বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে সমাজে দুই মতের দ্বন্দ্ব চলিতেছে। খ্রীষ্টীয় ৪০০ হইতে ১০০০ বৎসরে অধিকাংশ অর্ব্বাচীন স্মৃতি-সংহিতা রচিত হয়। এই সময়ে রচিত স্মৃতি-সংহিতার বচন প্রমাণ করিয়াই একাদশ শতাব্দী ও তৎপরবর্ত্তী সময়ের নিবন্ধ গ্রন্থে বহু আচারের নিষেধ করা হইয়াছে। এই সকল বচন নারদ-সংহিতার অসহায়-ভাষ্যে (৭৫০) এবং যাজ্ঞবল্ক্যের বিশ্বরূপ টীকায় (৮০০-৮২৫) উদ্ধৃত না হওয়ায় তাহারও পরবর্ত্তী বলিয়া গণ্য। অশ্বমেধের শেষ অনুষ্ঠাতা বলিয়া সপ্তম শতাব্দীর আদিত্যসেন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। কিন্তু রাজস্থানে লিখিত হইয়াছে যে, কনোজাধিপতি জয়চাঁদও এই যজ্ঞ সম্পাদন করেন। জয়চাঁদ ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে তরাইএর যুদ্ধে মহম্মদ ঘোরীর হস্তে পরাজিত ও হত হন। দ্বাদশ শতাব্দীর যাজ্ঞবল্ক্য-টীকাকার অপরার্ক কর্ত্তৃক ব্রহ্মপুরাণ হইতে উদ্ধৃত একটী বচনে অন্য ছয়টী আচারের সহিত অশ্বমেধ কলিবর্জ্য রূপে প্রথমে ঘোষিত হয়। এবং শৌনক-বচন-বলে দত্তক ও ঔরস-ভিন্ন পুত্র নিষিদ্ধ হয়। ঐ শতাব্দীর অন্তিমে রচিত স্মৃত্যর্থসারে নিষেধের দীর্ঘ তালিকা প্রথম দেখা যায়। সেখানে এই সকল নিষেধ সাধুগণের কৃত সময় বা convention রূপে খ্যাত। পরে দাক্ষিণাত্য-নিবন্ধ স্মৃতি-চন্দ্রিকায় কিছু যোগ হইয়া, ঐ তালিকা ১২৬০-৭০ সালে রচিত হেমাদ্রিকৃত চতুর্বর্গ-চিন্তা-মণিতে পরিসমাপ্ত হয়। এই তালিকার কিছু কিছু অংশ পুরাণের বচন বলিয়া পরবর্ত্তী নিবন্ধকারগণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে হিন্দু সমাজ-পতিগণ মিলিত হইয়া আলোচনা দ্বারা কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন—ইহাই অনুমান হয়। ব্যাস বচন বলিয়া উদ্ধৃত একটী শ্লোক আছে—কলির ৪৪০০ বৎসর গত হইলে অগ্নিহোত্র, এবং সন্ন্যাস শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠেয় নহে। ইহাতে খ্রীষ্টীয় ১২৯৯ সাল মিলে। এই

সময়ে ভারতসাগরে আরব জলদস্যুর উপদ্রব প্রবল হইয়া উঠে। বৃহত্তর ভারতের সহিত জলপথে সম্পর্ক রাখা বিপৎসঙ্কুল হইয়া পড়ে। দ্বারে যখন Gaul আসিয়া ধাক্কা দিতেছে—তখন বাহিরের জগতের সহিত আত্মীয়তা স্বতঃই গুটাইয়া আইসে। সমুদ্রযাত্রা নিষেধ ও প্রায়শ্চিত্তান্তেও সমুদ্রযায়ীর সহিত ব্যবহার নিষেধ ইহারই ফল। সুদূর-তীর্থযাত্রা-নিষেধেরও ইহাই হেতু। সমাজ তখন আত্মরক্ষার চিন্তাতেই ব্যাকুল। কলিবর্জ্যের বিধানগুলিতে এই সমাজ-চিত্রই চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে।

বর্ত্তমান আলোচনা হইতে আর একটী তথ্য ধরা পড়ে। মানবসমাজের ইতিহাসে একেবারে অতীত, বোধ হয়, কিছু হয় না। যাহা সৎ তাহার কখনও অভাব নাই—এই মহাবাক্য এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অন্ততঃ হিন্দুসমাজ কখনও সম্পূর্ণ ভাবে অতীতকে পরিহার করিয়া অগ্রসর হয় নাই। এক পদে স্থিতি এবং অপর পদে গতি—এই নিয়মেই তাহার ক্রমবিকাশ হইয়াছে। সেই জন্য দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে অগ্নিহোত্র নিষিদ্ধ হইলেও—অন্য বচনবলে তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা দেখা যায়। যতদিন বর্ণবিভাগ এবং বেদের প্রচলন, ততদিন অগ্নিহোত্র ও সন্ন্যাস বিহিত—ইহা দেবলের মত। পরদিনের জন্য অসঞ্চয়—বর্ত্তমানে অলীক কল্পনা বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু তীর্থাদিতে সম্মিলিত সাধু সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যায় যে, তাহারা ভক্তগণের নিকট যে সকল খাদ্যসামগ্রী পায়, তাহা একদিনেই ভাণ্ডারা করিয়া, দান করিয়া শেষ করে, পরদিনের জন্য চিন্তা করে না। এখনও বিবাহপ্রাঙ্গণে বর উপস্থিত হইলে নাপিত "পৌর পৌর" অর্থাৎ "সৌ সৌঃ" চীৎকার করিয়া উঠে। হিমালয় প্রদেশে মহাপ্রস্থানের পথ, শুনা যায়, এখনও কঠোর পরীক্ষার পর কোন কোন পথিকের জন্য মুক্ত হয়। আপদ্‌বৃত্তি নিষিদ্ধ হইলেও বর্ত্তমানে অনাপদ্ বৃত্তিরূপেই ব্রাহ্মণ সমাজের অধিকাংশের দ্বারা অবলম্বিত। এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। নানাদিকে বাহ্য শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে, একটা প্রাচীন সমাজ কি ভাবে কমঠ-বৃত্তি দ্বারা—কূর্ম্মের মত সকল অঙ্গ আবৃত করিয়া, আত্মরক্ষা করে—তাহাও ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়। সর্ব্বাপেক্ষা লক্ষ্য করিবার বিষয়—ইহার মধ্যে সমাজের আত্মকর্ত্তৃত্বের প্রমাণ। সুদূর অতীতে কল্পসূত্রের যুগে আপস্তম্ব বলিয়াছিলেন যে, ধর্ম্মের প্রমাণ দুই—যাঁহারা ধর্ম্মজ্ঞ, তাঁহাদিগের কৃত সময় বা মিলিত ব্যবস্থা বা সংবিৎ, convention বা compact—এবং বেদের বিধান। কিন্তু এই ধর্ম্মজ্ঞগণের কৃত সময় বিস্মৃত-প্রায় উপায়ে পরিণত হইয়াছে। এবং বর্ত্তমানে স্মার্ত্ত সম্প্রদায় অতি সাবধানে ইহার প্রয়োগ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করেন। প্রত্যেক জীবন্ত জাতিই অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা করিয়া থাকে—এবং এরূপ করিবার শক্তি প্রাণের লক্ষণ। কলিবর্জ্য বচনগুলি সমাজব্যবস্থার জন্য সেই উপায়-প্রয়োগের শেষ নিদর্শন।

এই বর্জিত আচারগুলি পর্য্যালোচনা করিলে, হিন্দুর সামাজিক প্রকৃতি, নৈতিক আত্মা বা ethos গত সহস্র বৎসর কি ভাবে কাজ করিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। সমাজের প্রথমাবস্থায়, আদিমযুগে নানারূপ আচার সকল জাতির ইতিহাসেই পাওয়া যায়। কিন্তু কালক্রমে বাহ্য ও আন্তর বিশুদ্ধির সম্বন্ধে উন্নত ধারণা দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হওয়ায়, মর্য্যাদা ও আভিজাত্য বুদ্ধি প্রকট হওয়ায়, শৌচ ও নীতি সম্বন্ধে সূক্ষ্মবোধ এবং সামাজিক জীবনের জটিলতা বৃদ্ধি পাওয়ায় ক্রমশঃ নিমন্ত্রণ ও নিরোধের চেষ্টা আসিয়া পড়ে। এই জন্যই সুরার একান্ত নিষেধ। এমন কি ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতির পক্ষে পুরাকালে ইহা অনুমত হইলেও কলিকালে উহা বর্জনীয় বলিয়া কথিত। বলাৎকৃতা নারীর সম্বন্ধে দেবল লঘু প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিয়াছেন। তাহাকে সমাজে গ্রহণ এইরূপে নিষিদ্ধ হয়। অসবর্ণা-সংসর্গ-দুষ্ট পুরুষ কিংবা স্বর্ণ-চোর ব্যতীত মহাপাতকীও সমাজে অগ্রাহ্য বলিয়া বিহিত হয়। পাপিসংসর্গ এবং গুরুস্ত্রী-ত্যাগ সম্বন্ধে প্রাচীন কঠোর বিধানের যে শিথিলতা ব্যবস্থিত হয়, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, সমাজনীতির কঠোরতাই এই সকল বর্জনবিধির একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। অপরিহার্য্য বাস্তবকে অঙ্গীকার এবং উচ্চতর মনোবৃত্তির উন্মেষ উভয়ই এই সকল বর্জন-বিধির মূলে নিহিত।

ইংরাজ সরকারের আদালতে ও নজীরে এই নিষেধগুলি হিন্দুসমাজে আক্ষরিক ভাবে প্রতিপালিত এবং অলঙ্ঘনীয় বলিয়া ধরা হইয়াছে। এরূপ ধারণা যে সঙ্গত ও যথার্থ নহে তাহার আভাষ পূর্ব্বেই দিয়াছি।

মাতুল-কন্যা-বিবাহ উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের প্রায় স্মার্ত্ত

কর্ত্তৃকই বহু শতাব্দী হইতে নিন্দিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু তথাপি আচার্য্য শঙ্করের বংশীয় সর্ব্বজনমান্য নাম্বুদ্রি সম্প্রদায়ে ইহা এখনও বলবদ্ আচার। মাদ্রাজের বহু ব্রাহ্মণকুলে এবং বাঙ্গালায় ও ছোটনাগপুরে স্থায়ী প্রবাসী রাজপুত পরিবারে ইহা এখনও প্রচলিত। দত্তক ও ঔরস ভিন্ন অন্য প্রকার পুত্র নিষিদ্ধ হইলেও পালকপুত্র, শূদ্রের দাসীপুত্র দায়ে অনধিকারী নহে। কৃত্রিমপুত্র মাদ্রাজ, পাঞ্জাব এবং মিথিলার নিকটবর্ত্তী প্রদেশে এখনও স্বীকৃত হইয়া থাকে। এই সকল দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে উইলসন্, কোলব্রুক, জোন্‌স প্রভৃতির যুগে যখন হিন্দু আইনের মূলতত্ত্ব অনুবাদ প্রভৃতির সাহায্যে ব্রিটিশ রাজপুরুষগণের গোচর করা হয়, তখন কলিবর্জ্য-বিষয়ে পর্য্যাপ্ত ও নিপুণ ভাবে আলোচনা হয় নাই। পণ্ডিত সমাজে প্রচলিত মোটামুটি ধারণাকে সঠিক মনে করিয়া—এই নিষেধ বচনগুলি অনুল্লঙ্ঘ্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। পরে রাজ-শাসন বা legislative actsএর বলে নিষিদ্ধ আচারগুলির উল্লঙ্ঘন করা হইয়াছে। বিধবা-বিবাহ আইন, আন্তর্জাতিক বিবাহ আইন, Caste Disabilities Removal Act (সামাজিক পাতিত্য দূরীকরণ আইন) প্রভৃতি ইহার নিদর্শন। কিন্তু আদালতের রায়ে ও নজীরে ইহাদের অলঙ্ঘ্যতা অব্যাহত রহিয়া গিয়াছে। কলিবর্জ্যের প্রামাণ্য সম্বন্ধে প্রথম আপত্তিই যথাযথ ভাবে আলোচিত হয় নাই। যে আচারের মূল শ্রুতিতে নিহিত তাহা পরে স্মৃতির বচন বা সাধুগণের নির্দ্দেশ বা পুরাণের বচন দ্বারা কিরূপে নিবারিত হইতে পারে? এ সকল বিচার বিতর্ক এড়াইবার জন্য ১৮৬৮ সালের প্রসিদ্ধ রামনদ মামলায় প্রিভি কাউন্সিল ঘোষণা করেন—স্পষ্ট প্রমাণিত প্রথা হিন্দুর ব্যবহারে ধর্ম্ম শাস্ত্রের লিখিত বচন অতিক্রম করিবে। এই মূলসূত্র দ্বারাই এ যাবৎ হিন্দু আইন নিয়ন্ত্রিত হইয়া আসিতেছে। আচার পরম ধর্ম্ম—ইহা শাস্ত্রের কথা ও সমাজের গভীর তত্ত্ব, ইহা সত্য। কিন্তু কলিবর্জ্য-বিধানই প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে, হিন্দুর প্রথা ও আচার যুগে যুগে স্থির ও নিশ্চল হইয়া নাই।

আধুনিক সময়ের শ্রেষ্ঠ ব্যবহার-বিশারদগণ কর্ত্তৃক এ তত্ত্ব মুক্তকণ্ঠে ঘোষিত হইয়াছে। তাই স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—হিন্দু আইন ধর্ম্মের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত নিয়ম-সমষ্টি। প্রথম অবস্থায় রাজকীয় পদমর্য্যাদাহীন বিচার-প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক ইহা প্রযুক্ত হইত। তখন এই বিচার-ব্যবস্থা অতিমাত্রায় প্রসার-শীল ছিল এবং ক্রমশঃ নূতন প্রথা আত্মসাৎ করিয়া এবং ব্যাখ্যা ব্যপদেশে প্রাচীন শাস্ত্রবচনের সঙ্কোচের দ্বারা পরিপুষ্ট হইতেছিল। এমত সময়ে দেশের শাসনভার ইংরাজের হস্তে চলিয়া যাওয়ায় ইহার স্বাভাবিক বিকাশ ও পরিপুষ্টি নিরুদ্ধ হয় এবং পূর্ব্বে যাহা কখনও ছিল না এরূপ কঠিন আড়ষ্ট ভাব ইহাতে সংযুক্ত হয়। কলিবর্জ্য আলোচনায় এই মন্তব্য সম্পূর্ণভাবে সমর্থিত হয়।

সান্ত্বনা

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

২১

দিলীপ কলিকাতায় ফিরিয়া গেল; যাইবার সময় মা'কে বলিয়া গেল, "মা, তুমি যদি বল, আমাকে বিয়ে করতে হ'বে, আমি করব; কিন্তু আমার সর্ত্ত, তুমি আমার স্ত্রীকে 'মানুষ' করবে।"

সে ফিরিয়া যাইবার পর সাধনা ভাবিতে লাগিলেন, তাহার বিবাহের পর কিরূপ ব্যবস্থা করিবেন?

সে যাইবার পর সপ্তম দিনে সহসা তাহার কণ্ঠে "মা" আহ্বান শুনিয়া সাধনা চমকিয়া উঠিলেন। সে যখন নিকটে আসিল, তখন তাহার মুখ দেখিয়া তিনি বিশেষ শঙ্কানুভব করিলেন—জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই এমন হঠাৎ এলি?"

দিলীপ বলিল, "মা, তোমাকে একটা কথা জানা'তে এলাম।" বলিয়া সে ইতস্ততঃ করিল।

"পরে জানাস—এখন একটু সুস্থ হ"—বলিয়া সাধনা তাহার বেশ পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। যেন কথাটা শুনিতে তিনি শঙ্কাবোধ করিতেছিলেন। সে স্নান করিতে যাইলে তিনি ইন্দুবালাকে ও সান্ত্বনাকে বলিলেন, "ওর মুখ দেখে আমার বুকের রক্ত শুকিয়ে যাচ্ছে। কি জানি, কি বল্‌তে এসেছে!"

ইন্দুবালা বলিলেন, "বিশেষ কোন কথা হ'লে মেজদা লিখতেন।"

সান্ত্বনা দিলীপের ইতস্ততঃ ভাব লক্ষ্য করিয়াছিল। সে বলিল, "মা, যা'ই হ'ক, ওর কথা আপনি একা শুনুন—শুনে যা' ভাল মনে করেন করুন।"

দিলীপ আসিলে সান্ত্বনা তাহার খাবার দিয়া চলিয়া গেল, ইন্দুবালাও সরিয়া যাইলেন।

সাধনা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই কি বল্‌তে ছুটে এসেছিস?"

দিলীপ বলিল, "মা, আমি বিয়ে করতে পারব না।"

বিস্মিত ভাবে সাধনা বলিলেন, "কেন?"

"না।"

"কিন্তু আমি যে একরকম কথাই দিয়েছি।"

"বাবা আমাকে সব কথা বলেছেন।"

সাধনা ভাবিতে লাগিলেন।

দিলীপ বলিল, "বাবা আমাকে ডেকে বল্‌লেন, 'দিলীপ, তুমি বড় হয়েছ—সংসারে প্রবেশ করবার আগে তোমার সব জেনে কায করা আমি সঙ্গত মনে করি। আর তোমাকে সব কথা জানান আমার কর্ত্তব্য। জীবনে যদি ভুল করে থাকি, তা' তোমার কাছে গোপন করা ভাল হ'বে না। সে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত আমার হয়ে তোমার মা—হিন্দু স্ত্রীর চিরাগত সংস্কারবশে করছেন; আর তাঁ'র সেই প্রায়শ্চিত্ত আমার অপরাধকে দ্বিগুণ করে' আমার প্রায়শ্চিত্ত আরও কঠিন করে তুল্‌ছে।' তা'র পর তিনি দিদির কথা সব আমাকে বলেছেন। বল্‌তে বল্‌তে তাঁ'র মুখ এমন বিবর্ণ হয়ে গেল যে, আমার ভয় হ'তে লাগল, হয়ত বিষম বিপদ ঘটবে।"

"তুই তাঁ'কে সে অবস্থায় একা রেখে এলি কেন, দিলীপ?" সাধনার উৎকণ্ঠা তাঁহার কণ্ঠস্বরে সপ্রকাশ হইল।

দিলীপ বলিল, "আমিও তা' ভেবেছিলাম। কিন্তু মনে হ'ল, পাছে তুমি বিয়ের পাকা কথা দিয়ে ফেল!

আর বাবাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, 'এ বিষয়ে তোমার মা-ই তোমাকে পরামর্শ দিতে পারবেন।' তা'ই এলাম।"

"কেন, দিলীপ—তাঁ'র বুদ্ধিই তাঁ'কে প্রকৃত পরামর্শ দেবার অধিকারী করবে।"

"কিন্তু, মা, তুমি জান, বাবা বরাবরই সংসারের সব বিষয়ে তোমার পরামর্শে কায করেছেন। আর আজকাল তিনি যেন কেমন—যা'কে 'কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়' বলে তাই—হয়ে যাচ্ছেন। দেখ্‌লে তুমিও ভয় পা'বে।"

সাধনা ভাবিতে লাগিলেন।

সেইদিন দিনান্ততপন যখন পশ্চিমে মেঘের উপর নানা বর্ণের লেপ দিতেছিল আর মুছিতেছিল, তখন চাতালে বসিয়া মা ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিন্তু তুই বিয়ে করবি না কেন?"

দিলীপ বলিল, "আমার মা আর দিদি বৃন্দাবনে থাকবেন—আমারই বা কি মনে হ'বে, বাবাই বা কি করবেন, লোকই বা কি ভাববে, আর আমার স্ত্রী—?"

"কেন, আমি কি তোর বিয়ে দিতে যা'ব না; না বৌ সময় সময় বৃন্দাবনে এসে আমার কাছে থাকবে না?"

"কিন্তু, মা, তা'তেই কি আমার সম্বন্ধে তোমার কর্ত্তব্যের অবসান হ'বে?"

"না। তা' হ'বে না। সে কর্ত্তব্য আমাকে পালন করতেই হ'বে। তোর দিদির সম্বন্ধে আমার কর্ত্তব্য আছে, আর তোর সম্বন্ধে কি নাই?"

"আমি ত জান্‌তাম, আছে। কিন্তু বাবা আমাকে বলেছেন, তুমি তাঁ'কে বলেছ, দিদির প্রতি কর্ত্তব্যের ভার তুমি নিয়েছ, আর আমার প্রতি কর্ত্তব্যের ভার তাঁ'কে দিয়েছ। তাই তিনি বল্‌লেন, তুমি যেমন দৃঢ়সঙ্কল্প তা'তে হয়ত তুমি আমাকে আর—"

বলিতে বলিতে দিলীপ কাঁদিয়া ফেলিল।

আঘাতের উপর আঘাত—গণপতির অবস্থার বিষয় পুত্রের মুখে শুনিয়া সাধনা শঙ্কিতা হইয়াছিলেন। তাহার পর পুত্রের এই বেদনা-বিকাশ। তিনি বলিলেন, "দিলীপ, আমি তাঁ'কে তা' বলেছিলাম বটে, কিন্তু তা'র পর—বিশেষ তোর ব্যবহারে—বুঝেছি, সেটা অভিমানের কথা—সেটা স্বার্থ হ'তে উঠেছিল। যে কর্ত্তব্য এক জনের নয়, তা' একজন পালন করতে পারে না। তোর প্রতি কর্ত্তব্য যেমন তাঁ'র একার নয়, সান্ত্বনার প্রতি কর্ত্তব্য তেমনই আমার একার নয়। তো'কে স্নেহে বিন্দুমাত্রও বঞ্চিত করবার অধিকার যেমন আমার নাই, তেমনই তা'কে তা'র পিতৃস্নেহের বিন্দুমাত্রে বঞ্চিত করবার অধিকারও কা'রও নাই।"

"আমি ত, মা, তা'ই ভাবি। যে ভুল হয়ে গেছে, তা'র জন্য যতটুকু প্রতীকার করা যায়, তা'ই করাই সঙ্গত—তা'র জন্য আরও কষ্ট বরণ করা যে, মা, আরও ভুল। তা'তে কি কল্যাণ হ'তে পারে?"

সাধনা ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইল, পুত্রের কথাই সত্য। তিনি কেবল পত্নী নহেন—তিনি জননী। সে কথা ত তিনি ভুলিতে পারেন না।

দিলীপ বলিল, "মা দিদিকে সব কথা বলেছ?"

সাধনা বলিলেন, "না।"

"কেন?"

"যখন বুঝব, ওঁর পরিচয় পেলে সে ওঁকে শ্রদ্ধাভক্তি করতে পারবে, তখন পরিচয় দেব। সে সময় এসেছে কি না বুঝতে পারছি না।"

দিলীপ জিজ্ঞাসা করিল, "মা, দিদির স্বামীর সন্ধান পাওয়া যায় না?"

সাধনা বলিলেন, "আমার মন বল্‌ছে, সন্ধান পাওয়া যা'বে।"

"তা'ই হ'ক।"

"ভগবানের মনে কি আছে, জানি না। সে কেমন—কি ভাবে আছে, কে জানে?"

"মা, আমার মনে হয়, দিদির ভাগ্যে দুঃখের পর সুখ আছে; নইলে অপ্রত্যাশিত ভাবে তোমাদের পা'বেন কেন—বাবাকে পা'বেন কেন—নূতন মা'র বুকে আশ্রয় পা'বেন কেন?"

সাধনা ভাবিতে লাগিলেন।

তখন সন্ধ্যা হয়-হয়।

"চল্—যাই"—বলিয়া সাধনা উঠিলেন। দিলীপও উঠিল। তখন সাধনা জিজ্ঞাসা করিলেন, "উনি সান্ত্বনার কথা জিজ্ঞাসা করেন?"

"আমি যখনই যাই, তখনই তোমার, পিসীমা'র, দিদির

কথা জিজ্ঞাসা করেন। এ বার আমাকে সব কথা বলবার পর হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'দিলীপ, সান্ত্বনাকে তোমার কেমন বোধ হয়?' আমি বল্লাম, 'আমার দিদির যেমন হওঁয়া উচিত—মা'র মেয়ের যেমন হওয়া উচিত, তেমনই।' বাবা কিছু বললেন না—কি ভাবতে লাগ্‌লেন।"

"তার পর?"

"কিছুক্ষণ পরে তিনি আমাকে বল্‌লেন, 'দিলীপ, আমার জন্য আজ সান্ত্বনার এই অবস্থা। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমাকে করতেই হ'বে। তোমার মা আমার হয়ে প্রায়শ্চিত্ত করছেন, কিন্তু সে জন্যও আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হ'বে।' বল্‌তে বল্‌তে বাবার মুখ এমন হয়ে গেল যে দেখে আমার চোখে জল এল।"

দিলীপের চোখ যে আবার অশ্রুতে ভরিয়া উঠিতেছিল, তাহা সাধনা তাহার কণ্ঠস্বরে বুঝিতে পারিলেন।

তিনি পরদিনই দিলীপকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন এবং তাহার বিবাহ সম্বন্ধে গণপতিকে পত্র লিখিলেন।

সেই পত্রের উত্তর যখন আসিল, তখন তিনি ইন্দুবালাকে বলিলেন, "ভাইপোর বিয়ে—এখন যা'বার উদ্যোগ কর।"

সান্ত্বনার সম্বন্ধে তিনি ইন্দুবালার সহিত অনেক পরামর্শ করিয়াছেন এবং পুত্রের সহিত তাঁহার কথোপকথনের বিষয়ও তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন। কাযেই সান্ত্বনার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হইবে, জানিবার জন্য ইন্দুবালা জিজ্ঞাসু ভাবে সাধনার দিকে চাহিলেন।

সাধনা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাবছ কি?"

ইন্দুবালা বলিলেন, "ভাবছি, তোমাকে আমি গুরু করেছি—গুরুর পক্ষে শিষ্যকে এমন প্রলোভন দেখান কি সঙ্গত?"

"কেন—বল ত।"

"যখন বৃন্দাবনে থাকবার জন্য তোমার অনুমতি চেয়েছিলাম, তখন ত মনে করি নি—আবার যেতে হ'বে!"

"তা'তে ক্ষতি কি? জনক রাজা সংসারে থেকে—রাজকার্য্য করেও সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।"

"তাঁর সঙ্গে তুমি আমার তুলনা দিচ্ছ?"

"তিনিই হ'লেন আদর্শ। দেখ, মেয়ে যা'বে না, তোমার দাদার সেই দুঃখের উপর আবার তাঁ'র এক ভগিনী তুমি—তুমিও না গেলে তিনি কি মনে করবেন?"

"সান্ত্বনা যা'বে না?"

"না। আমিই নিয়ে যা'ব না। দিলীপের বিয়ে উপলক্ষ করে' আমি ওকে প্রথম ওর বাড়ীতে নিয়ে যেতে পারব না। ও যখন যা'বে, তখন ওর যাওয়াটাই প্রধান ব্যাপার হ'বে। নইলে আমার মেয়ের মর্য্যাদা থাক্‌বে কি?"

ইন্দুবালা ভাবিলেন, তিনি যে মনে মনে সাধনাকে গুরু করিয়াছিলেন, সে কায সার্থক হইয়াছে।

তাহার পর সাধনা বলিলেন, "ছেলে-বৌ নিয়ে আসা হ'বে—তা'র সব ব্যবস্থা করবার জন্য হয় আমাকে, নয় তোমাকে, নয়ত সান্ত্বনাকে থাকতে হয়। আমার থাকা হ'বে না; তোমারও প্রায় তাই; কাজেই সান্ত্বনাকে সে ভার নিতে হ'বে। আমরা বুড় হয়েছি, এখন কাযের ভার ওদের নেওয়াই ঠিক।"

তিনি সান্ত্বনাকে বলিলেন, "কি বল, মা?"

সান্ত্বনা উত্তর করিল, "আপনি যা' বলবেন, তাই হ'বে।"

"সেই কথাই থাকল। এখন আমি একটি কথা বলি।"

"কি, মা?"

"তুমি আমাকে 'আপনি' বলা ছাড়। ওতে মনে হয়, তুমি আমাকে এখনও মা মনে করতে পারছ না।"

"যুগলকিশোর জানেন, আমি আপনাকে মা ছাড়া আর কিছুই মনে ভাবতে পারি না।"

"আমি সত্যিই তোমার মা"—বলিয়া সাধনা সস্নেহে সান্ত্বনার কপাল চুম্বন করিলেন।

সেই আদরে সান্ত্বনার হৃদয় আনন্দে ও চক্ষু অশ্রুতে ভরিয়া গেল।

সাধনা বলিলেন, "কেমন, আর কখন 'আপনি' বলবে না ত?"

সান্ত্বনা বলিল, "না।"

"আমার লক্ষ্মী মেয়ে।"

(২২)

পুত্র ও পুত্রবধূকে লইয়া সাধনা যথাসম্ভব শীঘ্র বৃন্দাবনে আসিলেন। ইন্দুবালা ফিরিয়া আসিলেন, গণপতিও সঙ্গে আসিলেন। সাধনা যতদিন কলিকাতায় ছিলেন, সব

কাযের মধ্যেও প্রতিদিন সান্ত্বনাকে পত্র লিখিতেন—সব সংবাদ দিতেন।

যে দিন সকলে আসিলেন, সে দিন সান্ত্বনা তাহার জন্য প্রস্তুত হইয়া ছিল—সব আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিল। দ্বারে গাড়ী থামিবার শব্দ পাইয়াই সে আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল। প্রথম গাড়ীতে গণপতি, দিলীপ ও স্মৃতি; দ্বিতীয় গাড়ীতে সাধনা ও ইন্দুবালা—সঙ্গে সারদা।

সাধনা গাড়ী হইতে নামিবার পূর্ব্বেই প্রথম গাড়ীর আরোহীরা নামিয়া পড়িলেন। দিলীপ দিদিকে প্রণাম করিয়া তাহার পদধূলি গ্রহণ করিল এবং স্মৃতিও তাহাই করিল। সান্ত্বনা গণপতিকে প্রণাম করিলে তিনি বলিলেন, "থাক, মা, থাক্।"

ততক্ষণে দ্বিতীয় গাড়ীর আরোহীরাও অবতরণ করিয়াছেন। সান্ত্বনা সাধনাকে ও ইন্দুবালাকে প্রণাম করিলে সাধনা তাহার চিবুকে আপনার দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলী স্পর্শ করিয়া অঙ্গুলী চুম্বন করিয়া বলিলেন, "মা, তোমার ভাই আর ভাজ—তোমার সামগ্রী তুমি বুঝে নাও।"

কুঞ্জে প্রবেশ করিয়া ঠাকুর প্রণামের পর সাধনা পুত্রবধূকে বলিলেন, "স্মৃতি, আমরা ননদ আর ভাজ এখন বিশ্রাম করব; আর আমাদের ছেলেকে দেখব। তোমাদের ছেলের ভার তাঁ'র মেয়ের, আর তোমার। তুমি তোমার দিদির কাছে সব শিখে নেবে।"

স্মৃতি সস্মিতিসূচক ভাব প্রকাশ করিল।

সাধনা যাহা বলিলেন, তাহাই করিলেন—গণপতির সব কাযের ভার তিনি সান্ত্বনাকে দিলেন। ইন্দুবালা তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিলেন—দিলীপও বুঝিল; উভয়েই সে বিষয়ে সাধনাকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। গণপতিকে সব কাযে সান্ত্বনাকে ডাকিতে হইতে লাগিল। দিলীপ কেবল যে পিতার কাযের জন্যই সান্ত্বনাকে ডাকিত, তাহা নহে; পরন্তু আপনার আহার্য্য হইতে বেশ পর্য্যন্ত সবই দিদির কাছে চাহিত এবং স্মৃতিকে সর্ব্বতোভাবে দিদির উপর নির্ভর করিতে বলিত। এইরূপে কয় দিনের মধ্যেই স্বভাবতঃ পরের উপর নির্ভরশীল গণপতির সব কাযের ভার সান্ত্বনার হাতে আসিয়া পড়িল।

সান্ত্বনা ভাবিত—নদীর আবর্ত্ত যেমন মানুষকে টানিয়া লয়, চুম্বক যেমন লৌহখণ্ড টানিয়া লয়, এই পরিবারের স্নেহ তেমনই ভাবে তাহাকে টানিয়া লইতেছে। সাধনার যে অসীম স্নেহের প্রভাব সে অতিক্রম করিতে পারে নাই তাহার উপর দিলীপের সক্রিয় স্নেহ তাহাকে সে পরিবারের আরও আপনার করিয়াছে। গণপতির মৌন স্নেহও সে অনুভব করিতে পারিতেছে।

সকলে বৃন্দাবনে আসিবার পর সপ্তাহকালমধ্যে সান্ত্বনাই যেন সে সংসারে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কাযের ভার পাইল এবং সব কায সানন্দে সম্পন্ন করিতে লাগিল।

দিলীপ সারা বৃন্দাবন ঘুরিয়া বেড়াইত, বিশেষ প্রতিদিন ট্রেণ আসিবার সময় ষ্টেশনে থাকা ও যাত্রীদিগের গতায়াত লক্ষ্য করা তাহার দৈনিক কার্য্যের মধ্যে ছিল। এক দিন ষ্টেশন হইতে ফিরিয়া সে মা'কে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মা, দিদির স্বামীর নাম কি?"

সাধনা তাহার প্রশ্নে কৌতূহল অনুভব করিলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

"সে কথা পরে বলব।"

"প্রশান্ত।"

"দিদির আঙ্গুলে আংটীতে তাই লেখা আছে।"

"হাঁ। কেন, বল ত।"

তখন দিলীপ বলিল, সেই দিন ষ্টেশনে তাহার এক পরিচিত যুবকের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছে। সে তাহার বৃদ্ধা মাতামহীকে লইয়া আসিয়াছে—মাতুল লালাবাবুর কুঞ্জের কার্য্যাধ্যক্ষ। বৃদ্ধা মাতামহীকে দেখিলে মনে হয়,—যেন বিষাদ মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছে। সে কৌতূহল-বশে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। বৃদ্ধার এক পুত্র নিরুদ্দেশ। তাহার বিবাহের পরই জানা যায়, যে পাত্রীর সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছিল, তাহার মাতা পতিপরিত্যক্তা। যে সে সংবাদ দিয়াছিল, সে নানা কথা বলিলে পিতা পুত্রকে সেই পত্নী ত্যাগ করিয়া আবার বিবাহ করিতে বলেন। পুত্র তাহাতে অসম্মত হইয়া—স্ত্রীকে লইয়া সংসার করিবে এবং নিজ চেষ্টায় সংসার পালন করিবে বলিয়া গৃহত্যাগ করে। সে এক বার স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার পর হইতে তাহার আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। এই ঘটনায় পিতার বুদ্ধিবিকারলক্ষণ সপ্রকাশ হয় এবং তাহার মাতাকে তাহার

গৃহত্যাগের দিন হইতে কেহ কখন হাসিতে দেখে নাই। তিনি এত দিন কাশীতে বাস করিতেছিলেন; স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে, এখন পুত্র তাঁহাকে বৃন্দাবনে আপনার কাছে আনিলেন।

দিলীপ মা'র কাছে সান্ত্বনার স্বামীর কথা যাহা শুনিয়াছিল, তাহার সহিত বৃদ্ধার পুত্রের বিবরণের অসাধারণ সাদৃশ্যহেতু সে মা'র কাছে সান্ত্বনার স্বামীর নাম জিজ্ঞাসা করিল।

সব শুনিয়া সাধনা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা'র নাম কি প্রশান্ত?"

"হাঁ।"

"কি জানি ভগবানের মনে কি আছে!"

"এমন ভাবে একে একে সকলে বৃন্দাবনে আস্‌ছেন যে, হয় ত এখানেই সকলের মিলন হ'বে।"

"তা'ই হ'ক, বাবা। তুই যাঁ'র কথা বলছিস, তিনি যখন আজ এসেছেন, তখন গোবিন্দ দর্শনে যাবেনই। সন্ধ্যারতির সময় তুই আমাকে নিয়ে যাস, যদি দেখতে পাস, চিনিয়ে দিবি।"

"আচ্ছা।"

সাধনা সব কথা ইন্দুবালাকে ও গণপতিকে বলিলেন।

সন্ধ্যায় মা ও পিসীমা'কে লইয়া দিলীপ গোবিন্দজীর মন্দিরে গেল। সাধনার অনুমানই সত্য হইল—নবাগতা গোবিন্দজীর মন্দিরে আসিলেন। তথায় দিলীপের পরিচিত যুবক দিলীপকে দেখিয়া মাতামহীকে বলিল, "দিদিমা, ইনি আমার বন্ধু। এঁর মা আর পিসীমা বৃন্দাবনে এসেছেন—থাকবেন; তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।"

বৃদ্ধা সাধনা প্রভৃতির দিকে চাহিলেন। সে দৃষ্টিতে কি গভীর কাতরতা!

সাধনা ও ইন্দুবালা তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনি বলিলেন, "ঠাকুরকে বল, এ দেহ রজে মিশতে যেন আর বিলম্ব না হয়।"

তাঁহার কণ্ঠস্বর যেন দূরে কোন যন্ত্র হইতে বাহির হইতেছে!

সাধনা বলিলেন, "যিনি ব্যথা দেন, ব্যথার অবসান করাও তাঁ'রই হাত। তিনি দয়া না করলে ত ভোগের শেষ হয় না।"

বৃদ্ধা আর এক বার সাধনার দিকে চাহিলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এ কি ব্যথা পেয়েই এসেছ?"

সাধনা বলিলেন, "সবই তাঁ'র বিধান।"

"তা'ই বটে।"

পরদিন সাধনার উপদেশে দিলীপ তাহার পরিচিত যুবকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কয়টি সংবাদ জানিয়া আসিল। ফলে—বৃদ্ধাই যে সান্ত্বনার শাশুড়ী তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না।

তাহার পর সাধনা ও ইন্দুবালা এক দিন লালাবাবুর কুঞ্জে দেবদর্শনে যাইয়া বৃদ্ধার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিলেন।

দেখিতে দেখিতে যখন প্রায় দশ দিন কাটিয়া গেল, তখন দিলীপ জিদ ধরিল, সকলকে একবার মুঙ্গেরে যাইতে হইবে। সাধনা সম্মত হইলেন।

দিলীপ বলিল, "দিদিকে যেতেই হ'বে।"

সাধনা বলিলেন, "যা'বে বই কি? আমি ত বলেছি, বৌ আনা উপলক্ষ করে' আমি আমার মেয়েকে প্রথম বার তা'র বাড়ীতে নিয়ে যা'ব না। তা'ই তোর বিয়েতে তোর দিদিকে নিয়ে যাই নি। এ বার তুই তোর দিদিকে মুঙ্গেরে নিয়ে যা'বি, সে ত ভালই।"

(২৩)

সকলে মুঙ্গেরে আসিলেন। এই মুঙ্গেরের সঙ্গে সাধনার জীবনের অধিকাংশ স্মৃতি বিজড়িত। মুঙ্গেরের গৃহ তাঁহার জন্মস্থান—তাঁহার সুখের শৈশব পিতামাতার স্নেহে এবং কৈশোর ও যৌবন স্বামীর ভালবাসায় এই গৃহেই অতিবাহিত হইয়াছে। তাঁহার পুত্র ও কন্যা এই গৃহেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। আর সর্ব্বাণী মৃত্যুর পূর্ব্বে এই গৃহেই আসিয়া স্বামীর অবহেলার জ্বালা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিল। তাহার জ্বালা জুড়াইয়াছে, কিন্তু তাঁহার বুকের জ্বালা কিসে জুড়াইবে? কালের প্রলেপ কি মাতৃহৃদয়ে শোকের ক্ষত দূর করিতে পারে?

অযত্নে গৃহ মলিন হইয়া গিয়াছে। মাতার সহিত প্রতি সন্ধ্যায় তিনি যে তুলসীমঞ্চে দীপ দিবার পর প্রণাম করিতেন, সে মঞ্চে তুলসী গাছ শুকাইয়া গিয়াছে। যে উদ্যানে সকল ঋতুতেই ফুলের শোভা দেখা যাইত, সে

উদ্যানের আর সে শ্রী নাই। উদ্যান পরিচ্ছন্ন রাখিবার জন্য গণপতি যে কয়টা সারস পুষিয়াছিলেন, তাহার দুইটা মাত্র বাঁচিয়া আছে।

দেখিয়া দিলীপ বলিল, "মা, আমরা কেন মুঙ্গেরেই ফিরে আসি না? কলিকাতায় আমাদের কিসের আকর্ষণ?"

সাধনা বলিলেন, "তোর যদি তা'ই ইচ্ছা, তা'ই কর।"

গণপতি সান্ত্বনাকে ও স্মৃতিকে সীতাকুণ্ড, পীর পাহাড় প্রভৃতি মুঙ্গেরের সব দ্রষ্টব্য স্থান ও জামালপুরে রেলের কারখানা দেখাইলেন। তাঁহার পুরাতন বন্ধুরা তাঁহার আগমনে কত আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

এইরূপে সপ্তাহ কাল কাটিলে একখানি পত্র বৃন্দাবন ঘুরিয়া আসিল। দ্বারকার শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন, তিনি পৌষ-সংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগরে স্নান করিবেন এবং প্রত্যাবর্ত্তন-পথে বৃন্দাবনে তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইবেন।

তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, বৃন্দাবনে যাইলে তাঁহাদিগের কুঞ্জেই "আসন করিবেন"। তাই সাধনা বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্ত্তনের আয়োজন করিলেন। স্থির হইল, গণপতি পুত্র ও পুত্রবধূকে লইয়া আরও কিছুদিন মুঙ্গেরে থাকিয়া গৃহের আবশ্যক সংস্কার-ব্যবস্থাদি করিয়া তবে বৃন্দাবনে যাইবেন। ইন্দুবালাও সাধনার ও সান্ত্বনা সঙ্গে যাইবেন।

দিলীপ বলিল, "আমরা বুঝি শঙ্করাচার্য্য দেখব না?"

সাধনা বলিলেন, "দেখবি ত বটেই। বাড়ীতে তাঁ'র শুভাগমন হ'বে, আর তোরা তাঁ'র পায়ের ধূলা পা'বি না! তিনি ফিরে যা'বার আগে যা'বি—তিনি তো'দের আশীর্ব্বাদ কে যা'বেন।"

(২৪)

দ্বারকার শঙ্করাচার্য্য বৃন্দাবনে আসিতেছেন, এই সংবাদ রটিতে বিলম্ব হইল না। যাঁহাকে পাইবার জন্য ব্রহ্মচারীর কুঞ্জের, জয়পুরের মহারাজার কুঞ্জের, শেঠের মন্দিরের, রাধারমণের মন্দিরের—সকলেই আগ্রহ করিবেন, তিনি এক জন সাধারণ গৃহীর কুঞ্জে "আসন করিবেন" জানিয়া লোক বিস্মিত হইল।

এ দিকে বৃন্দাবনে ফিরিয়া সাধনা, সান্ত্বনা ও ইন্দুবালা তাঁহার আগমনের জন্য সব আয়োজন করিয়া রাখিলেন। তাঁহার প্রয়োজন সম্বন্ধে সান্ত্বনার যেরূপ অভিজ্ঞতা ছিল, সেরূপ অল্প লোকেরই থাকিতে পারে; কাযেই সাধনা বুঝিলেন, তাঁহার অসুবিধা হইবে না। কেবল দলে দলে লোক তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিলে যদি স্থানাভাব হয়, ইহার তাঁহার আশঙ্কা। যাঁহারা শঙ্করাচার্য্যের দর্শনলাভের জন্য আসিবেন, তাঁহারা যাহাতে "প্রসাদ" পাইতে পারেন, সাধনা তাহারও ব্যবস্থা করিয়া রাখিলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে শঙ্করাচার্য্য বৃন্দাবনে আসিলেন এবং প্রথমে গোবিন্দ, গোপীনাথ ও মদনমোহন দর্শন করিয়া যুগলকিশোরের কুঞ্জে আসিলেন। তিনি কুঞ্জ দেখিয়া বাহিরের অংশে দেবগৃহের বিপরীত দিকের কক্ষে "আসন করিলেন"।

তিনি আসিয়া উপনীত হইবার অল্পক্ষণ পরেই তাঁহার একজন শিষ্য আসিয়া সংবাদ দিলেন, যিনি অসুস্থ, তাঁহাকে সেবাশ্রমের ডাক্তার পরীক্ষা করিয়াছেন—ফুসফুসে প্রদাহ, জ্বরও প্রবল।

শুনিয়া সান্ত্বনাই প্রথম জিজ্ঞাসা করিল "কে?"

শঙ্করাচার্য্য বলিলেন, "এক জন বাঙ্গালী।"

"সন্ন্যাসী?"

"না। সে বলে, সন্ন্যাসে তা'র অধিকার হয় নি—কেন না, সে সংসারের ব্যাপারে অভিমানভরে সংসার ত্যাগ করেছে, ভগবানকে পা'বার আশায় নয়।"

সাধনা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার সঙ্গে এসেছেন?"

"হাঁ। গঙ্গাসাগরের পথে আমার সঙ্গে দেখা। দেখেই মনে হ'ল অসাধারণ লোক—যেমন বিমল বুদ্ধি, শাস্ত্রে তেমনই অধিকার—প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনে তেমনই ব্যুৎপত্তি। আলাপ করলে আনন্দলাভ করা যায়। তা'ই আমিই তা'কে সঙ্গে যেতে বলি। পথে এই বিপদ। বিপদও সে মানুষের সেবার উৎসাহে বরণ করেছে। গঙ্গাসাগরে জাহাজে উঠবার সময় একটি বালক জলে পড়ে যায়—প্রায় সিকি ঘণ্টা চেষ্টার পর সে বালকটির উদ্ধার সাধন করে; তুলে এনে তা'র মৃতপ্রায় শরীরে জীবন সঞ্চারের ব্যবস্থা করে। তা'তেই সে আপনি অসুস্থ হয়।"

"তাঁ'কে কোথায় পাঠালেন?"

"এখানে কোন্ সেবাশ্রমে।"

"সে হ'বে না। আপনার সঙ্গে যখন এসেছেন, তখন

তাঁ'কে এখানে আন্‌তেই হ'বে। আমরা তাঁ'র শুশ্রূষা করব—চিকিৎসার সব ব্যবস্থা করব।"

সাধনা সান্ত্বনাকে বলিলেন, "মা, উপরে যে ঘরে খাটে অতিরিক্ত বিছানা করা আছে, সেই ঘরে রোগীর জন্য সব ব্যবস্থা কর।"

তিনি শঙ্করাচার্য্যকে বলিলেন, "তাঁ'কে আন্‌তে বলুন।"

তাহাই হইল এবং অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে সেবাশ্রম হইতে রোগীর আসনে যুবককে বহন করিয়া আনা হইল। সে কুঞ্জে আসিয়া শঙ্করাচার্য্যকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে কোথায় আন্‌লেন?"

শঙ্করাচার্য্য উত্তর করিলেন, "আমি বৃন্দাবনে এই কুঞ্জে 'আসন করেছি'।"

যুবক মুখ তুলিয়া চাহিল এবং মহিলাদিগকে দেখিয়া দৃষ্টি নত করিয়া বলিল, "আমি যে সকলকে বড় বিব্রত করব।"

সান্ত্বনাও তথায় ছিল। তাহার মনে হইল, কবে—কোথায় সে যেন কাহারও মুখে এই মুখের সাদৃশ্য দেখিয়াছিল।

যুবককে দ্বিতলে লইয়া শয্যায় শায়িত করা হইলে সাধনা সান্ত্বনাকে বলিলেন, "মা, কামদারকে বল, ডাক্তার ডেকে আনুন। আর তুমি একটু দুধ গরম করে আন।"

সান্ত্বনা চলিয়া গেল।

যুবক বলিল, "আমাকে সেবাশ্রম থেকে আনলেন কেন?"

সাধনা বলিলেন, "আপনি ব্যস্ত হ'বেন না।"

ম্লান হাসি হাসিবার চেষ্টা করিয়া যুবক বলিল, "মা, আপনি আমাকে 'আপনি' বলে অপরাধী করবেন না।"

"ভাল। তোমাকে কি বলে ডাকব?"

যুবক কয় মুহূর্ত্ত ভাবিল, তাহার পর বলিল—"প্রশান্ত।"

আর কেহ হইলে কিরূপ বিচলিত হইত, বলিতে পারি না; স্বভাবতঃ স্থির সাধনাকেও অবিচলিত ভাব দৃঢ় রাখিতে চেষ্টা করিতে হইল। তিনি কেবল এক বার পার্শ্বস্থিতা ইন্দুবালার দিকে চাহিলেন এবং যুবককে বলিলেন, "আমি তোমার মা বলেই মনে করো—ইনি পিসীমা।"

সেবাশ্রমের ডাক্তার আসিলেন এবং বৃন্দাবনের সর্ব্বপ্রধান ডাক্তারকে আনিতে পাঠান হইয়াছে জানিয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া সাধনা রোগীকে একটু দুগ্ধ পান করিতে দিলেন। তিনি স্বয়ং রোগীর কাছে থাকিলেন এবং সান্ত্বনাকে বলিলেন, "যাও, মা, তুমি আর তোমার পিসীমা ঠাকুরের সব ব্যবস্থা কর।"

ডাক্তাররা পরামর্শ করিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন—তখন রোগীর জ্বর বাড়িতেছে এবং সে কেমন "আচ্ছন্ন" ভাব অনুভব করিতেছে।

রোগীর জ্বর বাড়িতে লাগিল; সঙ্গে সঙ্গে তাহার বাহ্য-সংজ্ঞা লোপ হইল। সাধনা উদ্বিগ্ন হইলেন; বার বার তাঁহার মনে হইতে লাগিল—কি হইবে? তিনি রোগীকে ঔষধ ও পথ্য প্রদানের সব ব্যবস্থা আপনি করিতে লাগিলেন এবং কখন বা সান্ত্বনাকে, কখন বা ইন্দুবালাকে আপনার কাযে সাহায্যার্থ ডাকিতে লাগিলেন।

এ দিকে কুঞ্জে শঙ্করাচার্য্য; তাঁহার "দর্শন" লাভের জন্য শত শত নরনারী আসিতেছেন—সে দিকেও দৃষ্টি রাখিতে হয়। সাধনার মনে হইল, গণপতি ও দিলীপ আসিলে, বোধ হয়, ভাল হয়। তিনি তাঁহাদিগকে আসিবার জন্য তার করিবেন কি না, ভাবিয়া শেষে পত্র লিখিলেন। তবে শঙ্করাচার্য্য সন্ন্যাসী—তাঁহার প্রয়োজন অল্প এবং অবস্থা বুঝিয়া তিনি সঙ্গী শিষ্যদিগের দ্বারাই ব্যক্তিদিগের অভ্যর্থনাদির ব্যবস্থা করাইতে লাগিলেন।

রাত্রি কাটিল; রোগীর অবস্থার কোনরূপ উন্নতি লক্ষিত হইল না। চিকিৎসকগণ আসিয়া কোনরূপ আশা দিতে পারিলেন না, কেবল শঙ্কাই প্রকাশ করিলেন। সাধনা ইন্দুবালার সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন—প্রশান্তকুমারের মাতাকে সংবাদ দেওয়া কর্ত্তব্য কি না? তিনি বলিলেন, "যদি সত্যই এই তাঁ'র ছেলে হয়, তবে তিনি কি এক বার দেখতে পা'বেন না? কে জানে—হয় ত—"

ইন্দুবালা বলিলেন, "আমি কিছু ঠিক করতে পারছি না। তুমি যা' ভাল বুঝ—কর।"

"তা'র পর ভেবে দেখ, সান্ত্বনার সম্বন্ধেও সেই কথা। কিন্তু ও চিনতে পারে নি; পারবার কথাও নয়। মা যদি চিনতে পারেন, তবেই সান্ত্বনাকে পরিচয় দেওয়া যায়—নইলে নয়।"

ইন্দুবালা ভাবিতে লাগিলেন। শেষে তিনি বলিলেন,

"ভক্তের মুখ দিয়াই ভগবান আপনার কথা ব্যক্ত করেন। তাঁ'র কি ইচ্ছা, তা' জানবার অধিকারী আমরা নহি। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলে হয় না?"

"চল, তাই করি"—বলিয়া উভয়ে শঙ্করাচার্য্যের কাছে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে সব কথা জানাইলেন। তিনি শুনিয়া বলিলেন, "মা, এ সবই ভগবানের খেলা। এর মধ্যে তাঁ'র অভিপ্রায় সপ্রকাশ। নইলে যে কথা প্রকাশ হ'বার কোন সম্ভাবনা ছিল না, তা' প্রকাশ পা'বে কেন? নইলে তুমি দ্বারকানাথের মন্দিরে মেয়েকে পা'বে কেন? নইলে প্রশান্তকুমারের মা বৃন্দাবনে আসবেন কেন; আর তোমরা তাঁ'র পরিচয় পা'বে কেন? আর আমিই বা তা'কে এই বৃন্দাবনে এনে ফেলব কেন?"

তিনি সাধনাকে বলিলেন, "মা, তোমার মনই তোমাকে প্রকৃত উপদেশ দিয়েছে। মন যা' করতে বলবে, তা'ই কর।"

সাধনা বলিলেন, "রোগীই যে জামাই সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত না হ'লে আমি ত সান্ত্বনাকে তা'র সেবার ভার অধিকার হিসাবেও দিতে পারি না।"

"ঠিক বলেছ।"

ইন্দুবালাকে রোগীর কাছে রাখিয়া সাধনা কামদারকে সঙ্গে লইয়া লালাবাবুর কুঞ্জে গমন করিলেন এবং বৃদ্ধার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, শঙ্করাচার্য্যের সঙ্গে এক বাঙ্গালী যুবক তাঁহাদিগের কুঞ্জে আসিয়াছেন; তাঁহার বিশ্বাস, সে-ই তাঁহার পুত্র।

বৃদ্ধার মুখ বিবর্ণ ও চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "দেখান—আমাকে দেখান। কত দিন—কত বৎসর—ওঃ।"

সাধনা বলিলেন, "দেখা'ব বলেই আপনাকে নিতে এসেছি। কিন্তু আপনি অধীর হ'লে ত দেখাতে পারব না।"

বৃদ্ধা অত্যন্ত ব্যস্তভাবে বলিলেন, "কেন?—কেন? আমি কি এত অপরাধ করেছি যে, বাছাকে দেখতে দেবেন না?"

"যা'র কথা আমি বলছি, সে জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে—যা'কে 'নিউমোনিয়া' বলে, তা'র তা'ই হয়েছে—প্রবল জ্বর—বাহ্যসংজ্ঞা নাই। সে অবস্থায় তা'কে দেখে—ছেলে বলে' চিনলে আপনি যদি এমন অধীর হ'ন, তবে উত্তেজনায় তা'র প্রাণহানিও হ'তে পারে।"

"ওঃ! এক জনের ভুলে তা'কে হারিয়েছি—বুকে চিতা জ্বলছে; আর ভুল আমি করব না। আমি কেবল তা'কে দেখব—আর কিছু না। দয়া করে আমাকে দেখান—দেখান।"

বৃদ্ধা আকুল ভাবে সাধনার চরণে পতিত হইবার উদ্যোগ করিলেন। সাধনা তাঁহাকে ধরিয়া বলিলেন, "করেন কি? স্থির হ'ন; মন দৃঢ় করুন।"

"মন যে পাষাণ—নইলে কি আজও বেঁচে আছি? কিন্তু আর যে পারি না।"

বৃদ্ধাকে সঙ্গে লইয়া সাধনা কুঞ্জে ফিরিয়া আসিলেন।

রোগীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া বৃদ্ধা রোগীর দিকে চাহিলেন—সেই মুখ, বুঝি ব্রহ্মচর্য্যে আরও সুন্দর হইয়াছে, রোগের পাণ্ডুতাও তাহার দীপ্তি হরণ করিতে পারে নাই। কিন্তু চক্ষু—দৃষ্টিতে ভাষা ত নাই-ই—ভাবও নাই। বৃদ্ধা রোগীর শয্যাপার্শ্বে যাইয়া তাহার তপ্ত ললাট চুম্বন করিলেন। তাহার পর প্রবল ভাবাবেশ দমনের চেষ্টায় তাঁহার দেহ কম্পিত হইতে লাগিল। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া সাধনা ও ইন্দুবালা তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া যাইয়া পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে শয়ন করাইলেন এবং তাঁহার মুখে ও চক্ষুতে জলের ঝাপটা দিলেন। অল্পক্ষণমধ্যেই তিনি প্রকৃতিস্থা হইলেন—দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আমি আর অস্থির হ'ব না। আমাকে এক বার ভাল করে' দেখতে দি'ন।"

সাধনা বলিলেন, "দেখবেন। আশীর্ব্বাদ করুন—সেরে উঠুক।"

"ডাক্তাররা কি বলছেন?"

"তাঁ'রা চিকিৎসা করছেন!"

"আপনাদের কি দয়া!"

"আপনি ও কথা মনে করবেন না। প্রশান্ত আমাদেরও কম আপনার নয়। আমার মেয়ে স্বামীকে হারিয়ে আজ এত দিন উমার মত যে সাধনা করেছেন, সে সাধনা ব্যর্থ হ'বে না। সান্ত্বনা যে কেবল হারা'বার জন্যই স্বামীকে পেয়েছে, এ আমি বিশ্বাস করতে পারি না। প্রশান্ত সেরে উঠবে।"

পশ্চাতে হাতপাখার পতনশব্দ হইল। রোগীর উষ্ণ পানীয় অপেক্ষাকৃত শীতল করিবার জন্য সান্ত্বনা পাখা লইয়া যাইতেছিল। তাহার হস্ত কম্পিত হইয়াছিল—পাখা পড়িয়া গিয়াছে।

সাধনা ফিরিয়া দেখিলেন—সান্ত্বনা; তাহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গিয়াছে। তিনি ব্যস্ত হইয়া যাইয়া তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন, তাহার বুকের চাঞ্চল্য আপনার বুকে অনুভব করিলেন। সে একটু স্থির হইলে তিনি বলিলেন, "মা, যা' শুনেছ, তা'তেই সব বুঝতে পেরেছ। তোমার সাধনা এ ব্যাধিকে জয় করবেই। আজ হ'তে আমি প্রশান্তর সেবা-শুশ্রূষার ভার তোমাকে দিলাম—এ কায তোমার।"

শঙ্করাচার্য্য সংবাদ জানিতে চাহিয়াছিলেন। ইন্দুবালা তাঁহাকে সব সংবাদ দিতে গমন করিলেন।

বৃদ্ধা সাধনাকে বলিলেন, "আমাকে একটা ভিক্ষা দিতে হ'বে।"

সাধনা বলিলেন, "ভিক্ষা কি?"

"আমি প্রশান্তকে রেখে যেতে পারব না—এখানেই পড়ে থাকব।"

"আপনি থাকবেন, সে আমার সৌভাগ্য। ঠাকুর করুন, আপনাকে থাকতে বলবার মুখ তিনি যেন দেন।"

(২৫)

প্রিয়জনের রোগশয্যাপার্শ্বে বসিয়া জীবন-মরণে সংগ্রাম যাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, তখন কর্ত্তব্য কিরূপ কঠোর ও একাগ্রতা কিরূপ তীক্ষ্ণ হয়। তখন মনে হয়, বাহ্যজগৎ সঙ্কুচিত হইয়া সেই রোগশয্যায় পরিণতি লাভ করিয়াছে। সান্ত্বনার তাহাই হইল। সাধনা রোগীর পরিচর্য্যার প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতেন বটে, কিন্তু পরিচর্য্যার ভার সান্ত্বনাকেই দিয়াছিলেন।

প্রশান্তকুমারের মাতা পরিচর্য্যা করিবার চেষ্টা করিতেন বটে, কিন্তু তিনি যেন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিলেন। আঘাতের পর আঘাত জরার সঙ্গে যুক্ত হইয়া তাঁহাকে দুর্ব্বল করিয়াছিল—তাহার পর এই আঘাত-বেদনা, তিনি যেন আর সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না।

কিন্তু যে শিক্ষা অনুশীলনের ফলে ও সাধনার বলে সান্ত্বনাকে সর্ব্ববিধ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সংযম অক্ষুণ্ণ রাখিবার ও আপনার মর্য্যাদা রক্ষা করিবার শক্তি প্রদান করিয়াছিল, আজ সেই শিক্ষার জন্যই সে ধৈর্য্য ও স্থৈর্য্য হারাইল না। দারুণ উৎকণ্ঠা ও আশঙ্কার মধ্যেও তাহার মনে তপ্তমরুমধ্যবাহী শীর্ণ জলধারার মত তৃপ্তির ধারা বহিতেছিল—সে কেবল সে সেবার অবকাশ পাইয়াছে বলিয়া। যে স্বামী নব-পরিণীতা—প্রকৃত পক্ষে অপরিচিতা তাহার জন্য পিতা, মাতা, গৃহ—সব ত্যাগ করিয়া সংসারার্ণবে বটপত্ররূপে তাহাকেই অবলম্বন করিয়া ভাসিতে প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিলেন এবং সে তাঁহার ত্যাগের মর্য্যাদা উপলব্ধি না করিয়া প্রত্যাখ্যান করায় কক্ষচ্যুত উল্কার মত এত দিন ঘুরিয়াছেন—আজ সে তাঁহার রোগে তাঁহাকে সেবা করিবার সুযোগ পাইয়াছে। সে এক দিন তাঁহার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিয়া পত্নীর কর্ত্তব্যে অবহেলা করিয়াছিল;—বুঝি তাহার সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত শেষ হইয়াছে, আর সেই জন্যই সাধনা কল্যাণ মূর্ত্তিতে মাতৃরূপে তাহাকে বক্ষে তুলিয়া লইয়াছেন এবং তাঁহারই জন্য আজ সে এই সুযোগ পাইয়াছে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যখন তাহার মনে হইত—এই কি শেষ সুযোগ?—তখনই তাহার হৃদয় অবসন্ন হইয়া আসিত। সে চেষ্টা করিয়া সে ভাব দমিত করিত।

বিকারের ঘোরে প্রশান্তকুমার মধ্যে মধ্যে কথা কহিত। সান্ত্বনা উৎকর্ণ হইয়া তাহা শুনিত। কিন্তু সে সব অসংলগ্ন কথা প্রায়ই ধর্ম্মতত্ত্বসম্বন্ধীয়। সে যখন স্বামীর তপ্ত ললাটে সিক্ত বস্ত্রখণ্ড প্রদান করিত, তখন বিকারঘোরে প্রশান্তকুমার কখন কখন তাহার হাত ধরিত। সেই স্পর্শে সান্ত্বনার মনে হইত, বুঝি তাহার সুপ্ত নারী-হৃদয় জাগিয়া উঠিতেছে। এক দিন সাধনার স্নেহের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া সে তাহার দৌর্ব্বল্য স্বীকার করিয়াছিল—স্বামীর চলিয়া যাইবার কথায় বলিয়াছিল—"তাঁ'র সেই দৃষ্টি—তা'তে কি অভিমান, কি বেদনা, কি তিরস্কার! সেই মুখ আর সেই দৃষ্টি আমি ভুলতে পারব না। আমি জগন্নাথের শ্রীমুখ দেখবার সময় সেই মুখ আর সেই দৃষ্টি দেখেছি; আমি দ্বারকানাথকে দর্শন করবার সময় সেই মুখ আর সেই দৃষ্টি দেখি, দেখি—আর কাঁদি।" সে দৌর্ব্বল্য হইতে সে ত মুক্তিলাভ করে নাই—করিতে পারে নাই,

বুঝি চাহেও নাই! কোন কোন স্মৃতি কালের সঙ্গে সঙ্গে নিষ্প্রভ না হইয়া যেন আরও সুস্পষ্ট হয়।

এত দিন পরে প্রথম দর্শনে সে সেই মুখ—পরিবর্ত্তনহেতু—চিনিতে পারে নাই; কিন্তু এখন দেখিতে দেখিতে পরিবর্ত্তনের মধ্যে পরিচিত প্রতিভাত হইয়াছে। কিন্তু সেই দৃষ্টি—এ দৃষ্টি যে ভাবশূন্য!

দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল। সান্ত্বনা একাগ্রভাবে রোগীর সেবা করিতে লাগিল—তাহার মুখে অনিদ্রার মলিনতা ও উৎকণ্ঠার ছায়া সপ্রকাশ হইল।

সাধনা কেবলই দেবতার চরণে প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন—প্রশান্ত যেন সারিয়া উঠে।

আরও এক জন প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তিনি—শঙ্করাচার্য্য। সান্ত্বনার প্রতি স্নেহ, সাধনার প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রশান্তকুমারের প্রতি প্রশংসা সন্ন্যাসীর হৃদয়েও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বিশেষ জীবমাত্রেরই কল্যাণ কামনা করা তাঁহার ধর্ম্ম।

কয় দিন পরে একদিন ডাক্তাররা বলিলেন, "আজ রোগের গতি ভাল বা মন্দ এক দিকে সুস্পষ্ট হ'বে।" সেদিন সাধনা ও ইন্দুবালা বিশেষ সতর্ক রহিলেন এবং এক জন চিকিৎসককেও রাত্রিতে গৃহে রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন।

মধ্যরাত্রিতে রোগীর দেহের তাপ লইয়া সান্ত্বনা দেখিল, রোগ দ্রুত কমিয়া যাইতেছে। সে ডাক্তারের নির্দ্দেশানুসারে তরল পথ্যের সঙ্গে ঔষধ দিয়া রোগীকে লক্ষ্য করিতে লাগিল। তাহার মনে হইল, রোগীর নিদ্রা এত দিন পরে স্বাভাবিক হইয়াছে। সে রোগীর হাত তুলিয়া লইয়া নাড়ীর গতি পরীক্ষা করিতে লাগিল। সেই সময় প্রশান্তকুমার মুদ্রিত চক্ষু উন্মীলিত করিল। সান্ত্বনা দেখিল—দৃষ্টি আর ভাবহীন নহে।

প্রশান্তকুমার কক্ষটি দেখিল—সান্ত্বনাকে দেখিল; তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?"

স্বামীর কাছে স্ত্রীকে নিজ পরিচয় দিতে হইবে! সান্ত্বনা মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা করিল—স্থৈর্য্য হারাইল না—বলিল, "সান্ত্বনা।"

"সান্ত্বনা!"—বলিয়া প্রশান্তকুমার তাহার দিকে চাহিল। যে দৃষ্টি এত বৎসর সান্ত্বনার বুকে জলদঙ্গারের মত অনুভূত হইয়াছে, এ সে দৃষ্টি নহে; এ দৃষ্টি উজ্জ্বল, কোমল, বিস্ময়পূর্ণ, জিজ্ঞাসু—কিন্তু প্রশান্ত।

রোগী নয়ন মুদ্রিত করিল। তাহার মানসিক চাঞ্চল্যের নিদর্শন সান্ত্বনা পাইল না। তাহার পর সহসা চক্ষু মেলিয়া সে আবার সান্ত্বনার দিকে চাহিল; বলিল, "এ কি স্বপ্ন?"

সান্ত্বনা কোন কথা বলিতে পারিল না। সে কি বলিবে? এ যে স্বপ্নাতীত!

তাহার পর প্রশান্ত বলিল, "তুমি যদি সান্ত্বনা তবে যখন আশা, উদ্যম, উৎসাহ সব ছিল, তখন যে জীবন ব্যর্থ করে দিয়েছিলে, আজ তা'কেই এমন সেবায় মৃত্যু হ'তে উদ্ধার করলে কেন?"

কি অভিমান! এত দিনের সাধনাও তাহার বিনাশ সাধন করিতে পারে নাই। আজ দেহের দৌর্ব্বল্য তাহাকে আর আত্মগোপন করিতে দেয় নাই! সান্ত্বনার বুকে ব্যথা কি সুখ—তাহা সে বুঝিতে পারিল না। কিন্তু সে উত্তর দিতে বিলম্ব করিল না; বলিল, "বোধ হয়, সে দিন যে অপরাধ করেছিলাম তা'র জন্য প্রায়শ্চিত্ত করে ক্ষমা ভিক্ষা করবার সৌভাগ্য আমার অদৃষ্টে ছিল বলেই—"

বলিতে বলিতে সান্ত্বনা আর তাহার অভ্যস্ত স্থৈর্য্য রক্ষা করিতে পারিল না। সে সম্বরণ করিতে পারিবার পূর্ব্বেই দুই বিন্দু অশ্রু তাহার চক্ষু হইতে গড়াইয়া প্রশান্তকুমারের হস্তে পড়িল।

প্রশান্তকুমার বলিল, "ক্ষমা! তুমি অপরাধ করেছ, এ ধারণা ত আমার মনে স্থান পায় নি। কিন্তু—"

প্রশান্ত কথা শেষ করিল না। বোধ হয়, তাহার মানসিক চাঞ্চল্য তাহাকে অভিভূত করিতেছিল। সান্ত্বনা ব্যগ্র হইয়া উঠিয়া রোগীকে একমাত্রা উত্তেজক ঔষধ দিল। অল্পক্ষণের মধ্যে প্রশান্তকুমার আবার ঘুমাইয়া পড়িল।

ললাটে কর বুলাইলে রোগী যেন আরাম বোধ করিত। সান্ত্বনা অন্যান্য দিনের মতই তাহার ললাটে কর বুলাইতে লাগিল। কিন্তু আজ তাহার হস্ত কম্পিত হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে সে বুঝিল, এত দিন পরে রোগীর তপ্ত ললাটের উত্তাপাতিশয্য দূর হইয়াছে।

সাধনা দুই তিন বার আসিয়া রোগীর অবস্থা লক্ষ্য করিয়া যাইলেন।

প্রত্যূষে যখন প্রশান্তকুমারের মাতা আসিয়া

শয্যাপার্শ্বে বসিলেন, তখনও সে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। অল্পক্ষণ পরেই তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে বৃদ্ধাকে দেখিল—আবার দেখিল, তাহার পর সেই শীর্ণা—জরাজীর্ণা—বিষাদপ্রতিমাকে চিনিতে পারিল; বলিল, "মা, তুমি?"

বৃদ্ধা কাঁদিয়া উঠিলেন, "বাবা আমার! যা'র প্রতি অন্যায় ব্যবহার করে' তোকে হারিয়েছিলাম, সেই—আমার সতীলক্ষ্মী বৌমা সাবিত্রীর মত তোকে বাঁচিয়েছে—"

তাঁহার কণ্ঠস্বরে সাধনা ও ইন্দুবালা ব্যস্ত হইয়া সেই কক্ষে আসিলেন।

সান্ত্বনা উঠিবার উদ্যোগ করিলে সাধনা বলিলেন, "বস, মা, বস।"

সান্ত্বনা মাথার উপর কাপড় টানিয়া দিল—আজ তাহার আবার বাহ্য জগতের কথা মনে পড়িল।

সাধনা যাইয়া যুগলকিশোরের ঘরের সম্মুখে প্রাঙ্গণ হইতে উদ্দেশে দেবতাকে প্রণাম করিলেন এবং তাহার পর আসিয়া শঙ্করাচার্য্যকে প্রণাম করিলেন।

(২৬)

এতদিন রোগীর শুশ্রূষা করাই সান্ত্বনার একমাত্র কায ছিল—সে অনন্যকর্ম্মা হইয়া সেই কায করিয়াছিল—তখন বর্ত্তমান ত্যাগ করিয়া ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি দিবার অবসর তাহার ছিল না। এখন সে কাযের গুরুত্ব আর নাই। সাধনা লক্ষ্য করিলেন, তাহার দৃষ্টিতে আর উৎকণ্ঠার বিকাশ নাই বটে, কিন্তু মুখে চিন্তার বিষণ্ণ ভাব—যে স্বাভাবিক স্নিগ্ধ প্রশান্ত ভাব তাহার মুখে সর্ব্বদা পরিলক্ষিত হইত, তাহা আর নাই। তিনি তাহাকে আবার শঙ্করাচার্য্যের পরিচর্য্যার ভার আংশিকরূপে প্রদান করিলেন। শঙ্করাচার্য্য বৃন্দাবনে আসিলে গোস্বামী প্রভৃতি তাঁহাকে সম্মানদানের নানা আয়োজন করিয়াছিলেন; কিন্তু যত দিন প্রশান্তকুমার জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে ছিল, তত দিন তিনি সেরূপ কোন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে সম্মত হয়েন নাই। তখন তিনি দ্বারকায় ফিরিবার আয়োজন করিবেন জানিয়া নানা মন্দিরে তাঁহার উপদেশ শ্রবণের জন্য ব্যবস্থা হইতে লাগিল। কিন্তু সাধনা তাঁহাকে প্রতিশ্রুত করাইয়াছিলেন—তাঁহার পুত্র-পুত্রবধূকে আশীর্ব্বাদ না করিয়া এবং বাঙ্গালার বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তনগান না শুনিয়া তিনি যাইতে পারিবেন না। সাধনা তাহার ব্যবস্থা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

সাধনার নিকট সকল কথা শুনিয়া শঙ্করাচার্য্য মধ্যে মধ্যে সান্ত্বনাকে ও প্রশান্তকুমারকে উপদেশ দিতেন। তিনিও লক্ষ্য করিতেন, সান্ত্বনা যেমন প্রশান্তকুমারও তেমনই বিষণ্ণ।

একদিন মধ্যাহ্নের পর সাধনা শঙ্করাচার্য্যকে প্রশান্তকুমারের অধিকৃত কক্ষে লইয়া যাইলেন। প্রশান্তকুমার অনেকটা সুস্থ হইয়াছে, কিন্তু তখনও দুর্ব্বল। তাহার মাতা তথায় ছিলেন—ইন্দুবালাও ছিলেন। সান্ত্বনা পার্শ্বের কক্ষে রোগীর পথ্য প্রস্তুত করিতেছিল।

সাধনা প্রশান্তকুমারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, আমার প্রার্থনা দেবতা পূর্ণ করেছেন—তোমাকে পেয়েছি। দ্বারকা হ'তে আসবার পথে সাবিত্রীতে আমি সান্ত্বনার জন্য এই প্রার্থনাই করে'ছিলাম। কিন্তু তোমাকে যেন বড়ই চিন্তিত দেখি! কেন?"

প্রশান্তকুমার সরলভাবে বলিল, "ঘটনাচক্রে জীবন একভাবে গড়বার চেষ্টা এত দিন করেছি; কিন্তু সব গড়া যেন সমুদ্রের তীরে ছেলেদের গড়া বালুর ঘরের মত ঘটনার তরঙ্গে মুছে যাচ্ছে! তাই ভাব্‌ছি—এ কি?"

পার্শ্বের কক্ষ হইতে সান্ত্বনা এই কথা শুনিল। সে-ও যে এই ভাবনাই ভাবিতেছে!

শঙ্করাচার্য্য বলিলেন, "তুমি শাস্ত্র আলোচনা করেছ—অভিভূত—বিমূঢ় হ'বে কেন? তুমিই বলেছ, তুমি সন্ন্যাসী নও। ভগবান কেন তোমাকে সন্ন্যাস নিতে মতি দেন নি, তা', বোধ হয়, এতদিনে বুঝতে পারলে? কর্ম্মেই তোমার অধিকার—সে অধিকার কি কোনরূপে ক্ষুণ্ণ হ'তে পারে?"

ধীরে ধীরে প্রশান্তকুমার বলিল, "কিন্তু যে কর্ত্তব্যের অনুশীলন করিনি, তা'র ভার যেন দুর্ব্বহ হ'তে পারে।"

প্রশান্তকুমারের মা কাঁদিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "বাবা, আমি তোকে কখন যেতে দেব না।"

শঙ্করাচার্য্য তাঁহাকে বলিলেন, "কাঁদছেন কেন? আপনার ছেলে ভীরু নয়—কাপুরুষ নয়—বীর; ভয় পায়নি, কর্ত্তব্যপালন করবার শক্তি চায়। যিনি ধর্ম্ম ও কর্ম্ম—কর্ত্তব্য, অভিন্ন বলেছেন—যিনি দয়াময় হয়েও মহাযুদ্ধে

অর্জ্জুনের রথে চক্রধররূপে সারথ্য করেছিলেন, তিনি এইরূপ আধারেই শক্তি দেন।"

সাধনা বলিলেন, "তুমি তীর্থে তীর্থে লোকসেবার ব্যবস্থায় আনন্দলাভ কর। সেই কায করবে। সান্ত্বনা তোমার কাযে অন্তরায় না হয়ে তোমার সহায় হ'বে। সে শিক্ষা তা'র হয়েছে। বৃন্দাবনে এই কুঞ্জ আমার বাবা তাঁ'র মাতামহীর জন্য করেছিলেন। তাঁ'র মৃত্যুর পর কুঞ্জের উপযুক্ত ব্যবস্থা হয় নি। এই কুঞ্জ আমি তোমাদের দু'জনকে দিলাম; আর আমার যা' আছে, তা'র অর্দ্ধেক তোমরা তোমাদের ইচ্ছামত ব্যবহার করবে। আমি ছেলেয় আর মেয়েয় কোন প্রভেদ করব না। তোমার পিসীমা আর আমি—আমাদেরও তোমার কাযে সাহায্য করতে দিও।"

প্রশান্তকুমার বলিল, "এ কি সংশয়ের অন্ধকারে—কর্ত্তব্যের আলো! আপনি কে?"

সাধনা বলিলেন, "আমি সান্ত্বনার মা।"

"মা?"

"মা। যে পতিপরিত্যক্তা সতীর কন্যাকে তুমি ধর্ম্মপত্নী করেছ—যা'র উপর অভিমান করে' তুমি সংসার ত্যাগ করেছিলে—আমি তা'কে গর্ভে ধরিনি বটে, কিন্তু আমি তা'র মা। সব কথা তুমি পরে শুনবে। আজ জেনে রাখ, সান্ত্বনা যাঁ'র প্রথম সন্তান, আমার ছেলে তাঁ'র দ্বিতীয় সন্তান। আজ সান্ত্বনাকেও এ কথা জানাবার সময় হয়েছে।"

প্রশান্তকুমার শ্রদ্ধাযুক্ত দৃষ্টিতে সাধনার দিকে চাহিল—তাহার পর উঠিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল। সাধনা আশীর্ব্বাদ করিলেন, "সুখী হও।"

সাধনা উঠিয়া পার্শ্বের কক্ষে—যথায় সান্ত্বনা ছিল তথায় —গমন করিলেন। রোগীর পথ্য তথায় রহিয়াছে—সান্ত্বনা নাই। তিনি তাহার সন্ধানে যাইয়া দেখিলেন, সে যুগলকিশোরের কক্ষদ্বারে প্রণতা। তিনি যাইয়া তাহার মস্তক আপনার বক্ষে টানিয়া লইলেন; বলিলেন, "মা, মন কি বড় বিক্ষুব্ধ হয়েছে?"

সান্ত্বনা বলিল, "দেবতার চরণে আর মা'র বুকে কি শান্তিলাভে বিলম্ব হয়?"

সাধনা সস্নেহে সান্ত্বনার মুখচুম্বন করিলেন।

সেই সময় গৃহদ্বারে দিলীপের কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল—"মা!"

প্রাঙ্গণে আসিয়া ঠাকুর ঘরের সম্মুখে মা'কে ও দিদিকে দেখিয়া সে ডাকিল—"দিদি!"

তাহার দিকে চাহিয়া সান্ত্বনা দেখিল, তাহার পশ্চাতে স্মৃতিকে সঙ্গে লইয়া গণপতি।

সম্পূর্ণ

ছোটনাগপুরের পথে

শ্রীজিতেন্দ্রকুমার নাগ এম-এস্‌সি, বি-এল্

অনেক দিনের কথা। তৎকালীন ছোটনাগপুরের দুর্গম পথ ভেঙ্গে সঞ্জীবচন্দ্র পালামৌ ঘুরে এসে লিখেছিলেন "বঙ্গবাসীদের কেবল মাঠ দেখা অভ্যাস, মৃত্তিকার সামান্য স্তূপ দেখিলেই তাহাদের আনন্দ হয়।" এই প্রদেশের নিবিড় অরণ্যানীর মাঝে মাঝে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদ ছিল তা আজকের পরিব্রাজকের নিকট সুগম হলেও তখন এমন ছিল না। এখন এই ঘন বন ও পাহাড়শ্রেণীর মধ্য দিয়ে মোটরের ধূলা উড়িয়ে অতি অল্প সময়ে গ্রামের পর গ্রাম, পাহাড়ের পর পাহাড় পার হই বটে, কিন্তু তখন যাঁরা এই পথে যাতায়াত করতেন, তাঁদের ধৈর্য্য ধরে দিনের পর দিন হিংস্র বন্য পশুর আবাসের পাশ দিয়ে, অবুঝ সাঁওতাল বীরদের সঙ্গে মিতালি পাতিয়ে, পাল্‌কি, পুস্ পুস্ বা গরুর গাড়ী করে একটু একটু করেই অগ্রসর হতে হত। পথে বাহক কুলী বদল হতে, সরাইতে দুটী ভাত ফুটিয়ে নিয়ে ক্ষুধা নিবারণ করতে, বা হঠাৎ রাত্রি হলে, বৃষ্টি পড়লে মাঝে পথে থাম্‌তে থাম্‌তে তবে গন্তব্য স্থানে পৌঁছাতে হত।

আজ সভ্যতার প্রভাবে সকল কিছুরই উন্নতি হয়েছে।

মানুষ দূরত্বের ব্যবধান নষ্ট করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। মন্থর গতিটা যেন একটা মস্ত বড় কুড়েমি। দূরত্বের ব্যবধান বর্ত্তমান সভ্য মানব রাখতে চায় না। তাই এত বড় পৃথিবীটাকে সে ক্রমশঃ নিজের নিকটে আনবার স্বতঃই চেষ্টা করছে। সেদিন যে সমস্ত তীর্থস্থানে যেতে ধর্ম্মপ্রাণা বৃদ্ধা প্রপিতামহীদের, দিনের পর দিন অক্লান্ত ভাবে পায়ে চলার পথকেই আশ্রয় করতে হত, আজ সেখান থেকে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে বিমানচারী পুণ্য সঞ্চয় করে ফিরে আসছেন। সেদিন যা ছিল কঠিন, অসম্ভব, আজ তা হয়েছে সহজ, সম্ভব। মানুষের জয়যাত্রার পথে এমনি ধারা নিত্য ঘট্‌বে; কিন্তু একটা প্রশ্ন করি যে, দ্রুত গতির ফলে আমরা জগৎটাকে কতটুকু চিন্‌তে পারি? দুই মাস ধরে তখনকার লোকে জগন্নাথ দর্শন করতে যেত,—সে কি শুধু জগন্নাথই দর্শন করে যেত, না, এই দীর্ঘ পথের সঙ্গে নিগূঢ় সম্বন্ধ পাতিয়ে তাকে মনের মধ্যে গ্রহণ করত, তার অস্তিত্ব তার সম্পদকে ভাল করে জান্‌ত, শিক্ষা করত। এটাও যে ভ্রমণের সঙ্গে কত বড় প্রয়োজন, তা আজকের 'হাইকিং'এর সূচনা থেকে বুঝতে পারা যায়। ওদের দেশেও এটা বুঝতে পেরেছে; তাই ছুটী পেলেই হাইকিং করতে বেরোয়। এতে দেশের সঙ্গে এমন ভাবে পরিচয় হয় যার ছাপ কিছুদিন মনে থেকে যায়। ৮০।১০০ মাইল গতিতে রেলপথে যাওয়াটার আজকাল কোন মাধুর্য্যও নেই, নূতনত্বও নেই। যাক্, যা বল্‌তে বসেছি বলি। কিন্তু তারও পূর্ব্বে একটা কথা—ভিজা মাটীর বাংলাদেশ থেকে ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে বা মাঠ দেখায় অরুচি জন্মালে, পাশেই বিহার উড়িষ্যা বা ছোটনাগপুরে প্রায়ই স্বাস্থ্যান্বেষী বা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যপিপাসু ভদ্রলোকেরা গিয়ে থাকেন। এতে নূতনত্ব কিছু নেই। বাল্যকাল থেকে এমনি কতবারই

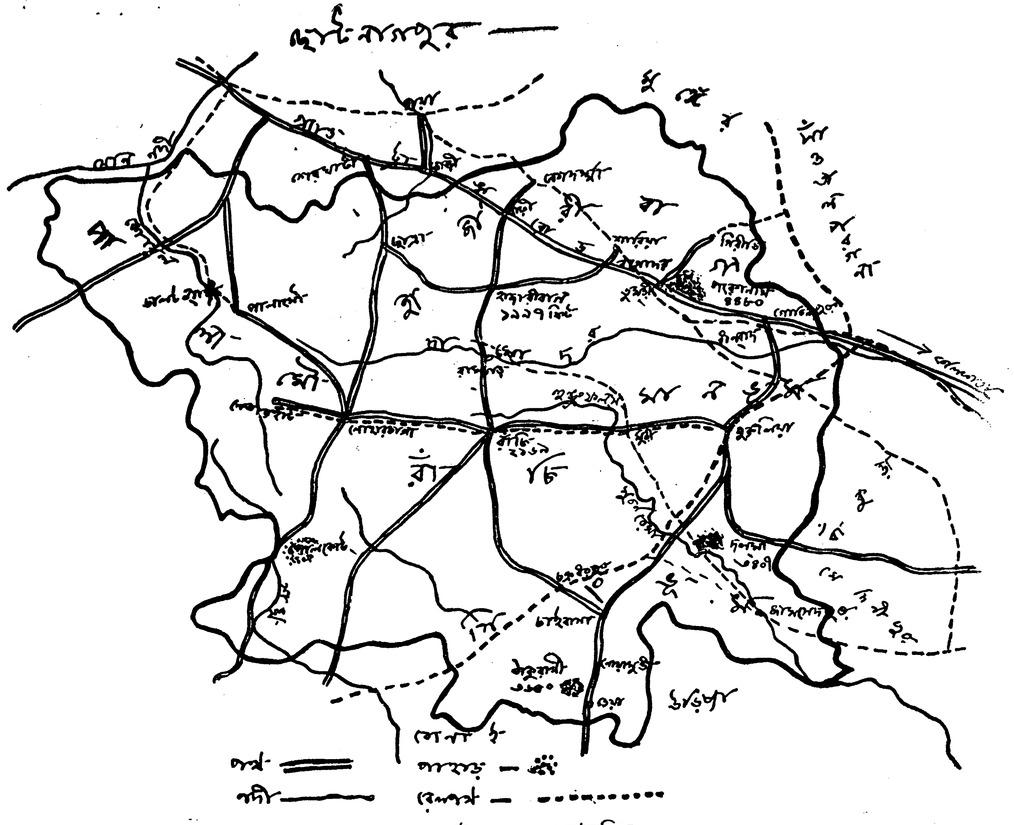

ছোটনাগপুরের মানচিত্র

ত এই পথে আনাগোনা করা গেছে, কিন্তু আজ যে কেন তা' লিপিবদ্ধ করতে বসেছি, তাহাই ভাবি।

ডিসেম্বর মাস, শিশিরভেজা মাঠের উপর দিয়ে একটানা দৌড় মেরে রাত্রি আড়াইটের সময় বম্বে মেল "হাজারীবাগ রোড" ষ্টেশনে নামিয়ে দিল। এবারে আমার মত ভবঘুরের সঙ্গ কেউ নিতে চায় নি। তাই একা, ঘুমন্ত সহযাত্রীদের মাঝ হতে গ্র্যাণ্ড্ কর্ডের এই ষ্টেশনে নেমে পড়লাম। ষ্টেশনটা ভাল বলতে হবে,—নিশুতি রাতের আঁধার ঘুচিয়ে বিজলীবাতির আলো পথিককে নূতন পথে চল্‌তে সহায়তা করে। একটা বেহারী কুলী এসে পোর্টম্যাণ্টো আর বিছানাটা মাথায় নিয়ে পথ প্রদর্শন করে নিয়ে গেল মোটরবাসের আড্ডায়। পৌষের ঠাণ্ডা বাতাস মুখে এসে লাগে। ওভারব্রিজে পার হতে গিয়ে হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়াই—অন্ধকারের অবগুণ্ঠনে লজ্জাবতী প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় করতে। শুক্লা রাতের আলোয় দেখা যায় দূরে দূরে পাহাড় আর গভীর বন। তেপান্তরের পারে, দুএকটা রাঙ্গামাটীর পথ চলে গেছে উঠে নেবে তরঙ্গায়িত প্রান্তরের পাশ দিয়ে, মাঝ দিয়ে। পাশে রেলওয়ে পাওয়ার হাউস থেকে একটানা ডায়নামোর মৃদু শব্দ সুপ্ত পল্লীর বুকের উপর দিয়ে ভেসে চলে যায়—আমারও কাণে আসে, কিন্তু পীড়িত করে না। সুবৃহৎ নগরীর একঘেয়ে কোলাহলে কাণে তালা ধরে গেছল, সহরের ধূমল হাওয়া মলিন প্রাসাদচূড়ার দৃশ্য যে চক্ষুকে পীড়িত করেছিল, সেই চোখের কোলে হেথায় এসে আনন্দ উঠ্‌ল ফুটে, চারিপাশের উন্মুক্ত পর্ব্বতকান্তারবেষ্টিত প্রান্তর ও মালভূমির পানে তাকিয়ে।

বেহারের এই বিভাগটী কলকাতা থেকে এমন কিছু দূরে নয় স্বীকার করি, তবু এখানকার সৌন্দর্য্য অনুভব করতে ছুটী পাই কই? ভাগ্যে তবু রহস্যময় সৃষ্টিকর্ত্তা আমাকে যাযাবর প্রকৃতির করে সৃজন করেছেন। তাই অবসর পেলেই সহরের শিকল ছিঁড়ে চঞ্চল পা দুটী আমার এমনি করে নড়ে উঠে। শ্রদ্ধেয় জলধরবাবুর সেই কথাটা মনে পড়ে "জীবনভোর আমার ঘুরেই কেটেছে।" এই ঘোরায় যে কি আনন্দ তিনি পান, তা বাহিরে বেরোলেই আমি পদে পদে অনুভব করে থাকি। যাঁর একটু বোহেমিয়ান প্রবৃত্তি আছে, তিনি বেশ বুঝতে পারেন যে, নগরীর কোলাহলপূর্ণ পথঘাট, সিনেমা, রঙ্গালয়, ক্লাব, সমাজ প্রভৃতির নকল আমোদপ্রমোদ হতে কত বেশী পরিতৃপ্তি আমরা অনুভব করি যখন সবুজ ধানে ভরা ক্ষেতের পাশ দিয়ে, দূরের অভ্রভেদী গিরিচূড়া নিরীক্ষণ করতে করতে, বটবৃক্ষের স্নিগ্ধচ্ছায়ে উপবিষ্ট রাখাল ছেলের মেঠো সুরের বাঁশী শুন্‌তে শুন্‌তে পথ চলি।

"হাজারীবাগ রোড" রেলওয়ে ষ্টেশন থেকেই সহজ পথ চলে গিয়েছে হাজারীবাগ সহরে যাবার। এই স্থানটীকে স্থানীয় লোকে বলে থাকে শারিয়া। এখানে পূর্ব্বে একটী গ্রাম ছিল মাত্র। গ্র্যাণ্ড্ কর্ড খোলা হবার পর এখানকার জল হাওয়া ভাল বলে এবং রেলপথের সুবিধার জন্য এটী চেঞ্জারদের উপনিবেশে পরিণত হয়েছে। অবসর জীবন যাপন করবার জন্য বহু বঙ্গবাসী এখানে বাড়ী করে রেখেছেন। একটী পোষ্ট অফিস্ আছে এবং প্রতি বুধবার হাট হয়ে থাকে। তা ছাড়া একটী রেলওয়ে কোয়ার্টার আছে। রাতের পরিচয় বলে, আর কি আছে জানবার সুবিধা হয় নি। এখান থেকে হাজারীবাগ সহর বিয়াল্লিশ মাইলের পথ।

অটোবাসের ড্রাইভার আমায় তার পাশের সীট্ দিলে। ভাড়াটা অবশ্য বেশী নিলে—১৷৷৵০। পরে জান্‌তে পারলাম এক টাকা এক আনা রেট্। গ্লাস স্ক্রীন তুলে দিলেও ঘড়্ ঘড়্ করে যখন গাড়ী খোলা মাঠের উপর দিয়ে ছুট্‌তে আরম্ভ করল, তখন আমার আপাদবক্ষ-আবৃত রাগের ভিতর দিয়েও ঠাণ্ডা দুরন্ত হাওয়া দেহের লোমকূপে পর্য্যন্ত পরশ দিতে লাগে। তাপের জন্য একটী বর্ম্মা চুরুট ধরিয়ে পথের সৌন্দর্য্য দেখ্‌তে দেখ্‌তে অগ্রসর হওয়া গেল।

দশ মাইল এসে বুড়ো গ্র্যাণ্ড্ ট্রাঙ্ক রোডে বগোদর জংসনে পৌছান গেল। পূর্ব্বে কল্‌কাতা থেকে একবার মোটরে ভ্রমণ করতে বেরিয়ে এই বগোদরএ কিছুক্ষণের জন্য আলাপ করা গেছল, কিন্তু এই নিশুতি রাত্রে সে আমাকে চিন্‌তে পারল কি না জানি না—ডাকবাংলোর বাবুর্চ্চিটা নিশ্চয় ভুলে গেছে তার কারির ডিসটার কি সুখ্যাতিই না করেছিলাম সেদিন। বগোদর বেশ বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম,—ট্রাঙ্ক্ রোডের উপরেই দোকানপত্তর, হাট, বাজার। থানা আছে, পোষ্ট্ আপিস্ আছে, Circuit হাউস আছে; আর আছে একটী ভাল সাহেবী হোটেল—Hampton

Court। কয়েকজন বাঙ্গালী কর্ম্মচারীকেও বাইক্ চড়ে যেতে দেখেছিলাম। বোধ হয় রামগড় এষ্টেটে চাকুরী করে থাকেন।

ট্রাঙ্ক্ রোডের পশ্চিমে হাজারীবাগ রোড দিয়ে ডাকগাড়ী আবার ছুট্‌তে আরম্ভ করে দিলে। এইবার সত্যিকার ছোটনাগপুরের পার্ব্বত্য জঙ্গল আরম্ভ হল। এই কাঁকরে ধূসর পথ এঁকে বেঁকে সাপের মত পাহাড় বন কেটে চলে গেছে ছোটনাগপুরের তরঙ্গায়িত বক্ষের উপর দিয়ে। সেবারে এর সঙ্গে একবার পরিচয় হয়েছিল ভরা ভাদরের এক সকালে। এর সৌন্দর্য্য অকৃত্রিম, অপূর্ব্ব। রাত্রি শেষের চন্দ্র পাণ্ডুনীল আকাশে রহস্যের সৃষ্টি করেছে,—তার জ্যোৎস্নাস্নাত হিমল হাওয়ায় ভেজা বন্য গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে এসে পথের উপর আলো ছায়ার বৈচিত্র্য আনে। দিগন্তে মিলিয়ে যাওয়া তারকাখচিত আকাশের তলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় নীলাভ মেঘের মত—মনে হয় তার অন্তঃপুরে কি যেন এক গাম্ভীর্য্যের সৃষ্টি করেছে। বাসের ইঞ্জিনের অবিরল শব্দ গহন রাতের তেপান্তরী স্তব্ধতা ভেদ করে যাত্রীগণের কাণের কাছে যেন ঘুমপাড়ানী গান গেয়ে যায়। এই গান শুনতে শুনতে এবং গাড়ীর দোলানীতে অনেকেই তন্দ্রাভিভূত হয়ে গেলেন। শুক্লা রাতের প্রদীপ্ত চন্দ্র সামনের শিমূল, ঝাউ বা শিশু গাছের পশ্চাতে কেবলই পিছু হাঁটতে থাকে।

বগোদর থেকে ১৬ মাইল ছুটে বাস এসে থাম্‌ল 'তাতিঝোরায়'। বেশ সুন্দর স্থান। জঙ্গলের পাশেই একটী ক্ষুদ্র মালভূমির উপর ছোট্ট একটি গ্রাম। এক পাশে একটী পরিষ্কার ইন্‌স্পেক্‌সন বাংলো। খালি থাক্‌লে এমন নির্জ্জন স্থানে দুএকদিন অবস্থান করলে প্রচুর আনন্দ পাওয়া যায়। পাশে পাহাড়ের খাদ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে পার্ব্বত্য নদী "শিবানী"—যেন ছোট্ট একটী মেয়ে। এরই মৃদু কলকণ্ঠে গিরিরাজের সঙ্গীহীন জীবন রসপূর্ণ হয়ে যায়। প্রয়োজন হলে খাদ্য কিছু গ্রামে অনুসন্ধান করলে পাওয়া যায়। বাসের ড্রাইভার থানা থেকে ছাড়পত্র নিয়ে এল। আমরা যে যার সীট্ দখল করলাম।

রাত আর নেই। দুরন্ত ঠাণ্ডা বাতাস শিরশিরিয়ে চলে যাচ্ছে বনতরু ভেদ করে, পাহাড়ের বক্ষ জুড়িয়ে। বাস ছুটেছে দ্রুত, বাকী ১৭ মাইল পথ ভেঙ্গে ভোরেই হাজারীবাগের ডাক পৌঁছে দেবার জন্য। আনমনা মন গাড়ীর গতির সঙ্গেসঙ্গেই আপনার ক্ষ্যাপামীর খেয়ালে কি যে

হাজারীবাগের পথে এখনও চলে "পুস্ পুস্"

ভেবে যায় তার কোন ঠিক থাকে না। পশ্চিম গগনে হেলে পড়েছে চন্দ্র, ফেরার পথে,—আমার অন্তরবীণায় মনে হল চুপে চুপে কে যেন একটা মালকোষ সুর তুলেছে।

রাত্রিদিনের সন্ধিক্ষণে হাজারীবাগ সহরের সঙ্গে নূতন করে আমার দৃষ্টিবিনিময় হল। জ্যোৎস্নাভরা কুয়াসায় এবার পূবগগনের রক্তরাগের আভা ফুটে উঠেছে। গৃহস্থের উদ্যানলতার মাঝে সূর্য্যমুখী সপ্তরথীর আগমনপ্রতীক্ষায় মুখ ফিরাচ্ছে পূর্ব্বপানে। সুদূর দিগন্ত হতে কোন অসীম অনন্ত জ্যোতির্ম্ময়ের আলো এসে পড়ল আমার চলার পথে। মনে পড়ল পারস্য কবির গাথা—

"রাত পোহালো শুন্‌ছ সখি
দীপ্ত উষার মাঙ্গলিক"

পৌষের প্রত্যূষের শুভ ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে ছোটনাগপুরের এই সুন্দর শান্তিময় স্থানটীতে নেমে পড়লাম বাস থেকে। তল্পী-তল্পা নিয়ে ঘুমন্ত পুরীর মাঝ দিয়ে ধীরে ধীরে নিদ্রামগ্ন হোষ্টেলের দ্বারে এসে আঘাত করে বল্লেম "দ্বার খোলো, অতিথি এসেছে এক, দ্বার খোলো ত্বরা করি"। পূবের আকাশে সীতাগড় পাহাড়ের পাশ দিয়ে এলেন সূর্য্যদেব—সিঁদুরে-রাঙা রূপ নিয়ে যেন প্রকৃতির সাথে রোম্যান্স্ করতে।

বহুদিন যাবৎ এই অরণ্যময় পার্ব্বত্য জনপদ ছিল আদিম অধিবাসীদের বাসস্থল। ভূতত্ত্ববিদগণ বলেন এই ছোটনাগপুর ভারতবর্ষের অতি প্রাচীন ভূমি, যে সময়ে

উত্তরভারত সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত ছিল, তখন বিন্ধ্যপর্ব্বতের ও ইষ্টার্ণঘাটের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরিমালার রেশ নিয়ে এই ছুটিয়া নাগপুরও ছিল আজকের মধ্যভারতের ন্যায় দাক্ষিণাত্যের অন্যতম সীমান্তরেখা। তার পর দ্রাবিড় সভ্যতার পত্তন হল। তাদের হটিয়ে আর্য্যাবর্ত্তে আর্য্যরা তাঁদের সভ্যতা বিস্তার করলেন। কিন্তু ভারতবর্ষের আদিম জাতিসমূহ আসাম, মহীশূরের নীলাগিড়ি, মধ্যভারতের নাগপুর এবং ছোটনাগপুর প্রদেশের পাহাড়ে, জঙ্গলে সভ্যতার অন্তরালে আপন অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। এই প্রদেশ যুগের পর যুগ ধরে আপন ভূগর্ভে এত সম্পদ সঞ্চয় করে রেখেছে যে, সকল প্রকার খনিজদ্রব্য এই স্থান থেকে অপহরণ করে নিয়ে যায় লোকে।

প্রাচীন ইতিহাসে এই স্থানটীকে বল্‌ত ঝারখাণ্ড্ বা বন্যদেশ। মহারাজ অশোক এই দুর্গম পথ ভেঙ্গে কলিঙ্গ বিজয় করতে এসেছিলেন। মুসলমান রাজ্য ভারতে প্রসারলাভ করলে ছোটনাগপুরও বাদ পড়ল না। সাঁওতাল কিম্বদন্তী আছে যে তাহাদের একজন প্রাচীন রাজার রাজধানী ছিল বর্ত্তমান হাজারীবাগের নিকট ছই চম্পায়। মহম্মদ তোগ্‌লকএর অন্যতম সেনাপতি ইব্রাহিম আলি সাঁওতালদের পরাজিত করে এই রাজার দুর্গ অধিকার করে সমগ্র প্রদেশটী রেখে চলে আসেন। তার পর আকবরের রাজত্ব পর্য্যন্ত কোন রকম বহির্দেশীয় আক্রমণের কথা শুনা যায় না। আইন ই আকবরিতে পাওয়া যায় ছই চম্পাকে বিহারের একটী পরগণা রূপে গণ্য করা হয়েছিল। এর থেকে প্রায় পনের হাজার টাকা রাজস্ব আদায় হত। ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে ছোটনাগপুরের রাজা মোগলদের অধীনতা স্বীকার করে তাঁর রাজ্যটীকে একটী করদরাজ্যে পরিণত করেন।

পলাশীর যুদ্ধে বাংলা অধিকার করার প্রায় বৎসর দশেক পরেই ১৭৬৫ সালে বেহারের একটী অংশ হিসাবে ছোটনাগপুরও ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে চলে আসে। তখন হতে অবশ্য বহুদিন পর্য্যন্ত ছোটনাগপুর বাংলা সরকারের জুরিস্‌ডিকসনের অন্তর্গত হয়ে ছিল। তার পর ইংরেজদের এদেশে প্রতিপত্তি বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে এই অসভ্য জাতির উপর দৃষ্টি পড়ে খৃষ্টান মিশনারীদের। ১৮৫৩ সালে জার্ম্মাণ Evangelic Lutheran মিশন প্রথম হাজারীবাগে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করতে আসেন। তাঁরা অবশ্য শিক্ষা বিস্তারের জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু সিপাহী-বিদ্রোহের দেশব্যাপী অনলে তাঁহাদের এ প্রয়াস ব্যর্থ হয়।

কিছুদিন পরে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ডাবলিন বিশ্ববিদ্যালয় মিশন এইখানে আস্তানা গ্রহণ করে পুনরায় মিশনারী কাজ সুরু করে দেয়।

অতিথি এসেছে এক, দ্বার খোলো ত্বরা করি

১৯১২ সালে ছোটনাগপুর বিভাগকে পাঁচটী জেলায় ভাগ করা হয়েছে। বরাকর নদীর পর মানভূম থেকে আরম্ভ করে শোন নদীর এদিকে পালামৌ, মধ্যে হাজারীবাগ, এর তলায় হল রাঁচি আর সিংভূম। পরেশনাথ, দল্‌মা আর ঠাকুরাণী হল সবচেয়ে উঁচু পাহাড়। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পাহাড়ের বুকের উপর দিয়ে শঙ্খ, কোয়েল, সুবর্ণরেখা দামোদর, উস্ প্রভৃতি কয়েকটা ছোট বড় নদী চলে গেছে। বহু পূর্ব্বে হাজারীবাগ বলে কোন জেলা ছিল না। রামগড়কেই প্রথম বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট জেলায় পরিণত করে শেরঘাটী আর ছাত্রায় হেড্‌কোয়ার্টার করেছিল। উপস্থিত হাজারীবাগ

সহরই বর্ত্তমান হাজারীবাগের সদর। এই সহরের পত্তন ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে। স্থানীয় রাজা ও আদিম অধিবাসীদের আয়ত্তে রাখবার জন্য কোম্পানী এইখানে একটী ক্যাণ্টন্‌মেণ্টের সৃষ্টি করেন। সেই থেকে সহরটী একটী ফৌজদারী কেন্দ্র রূপে বর্ত্তমান আছে। তিনটী মহকুমা—হাজারীবাগ, ছাত্রা এবং গিরিডি; সাতটী থানা—বাড়ী, কোদর্ম্মা, বগোদর, গুমিয়া, রামগড়, মাণ্ডু এবং হাজারীবাগ।

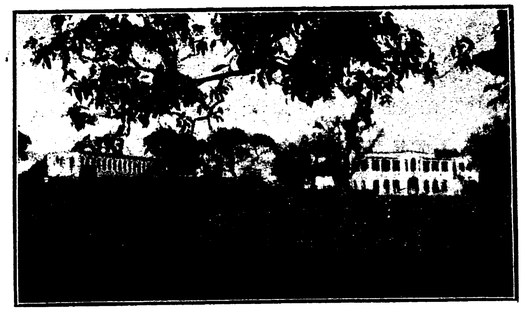

রিফরমেটরী স্কুল

হাজারীবাগ সহরটী বেশ সুন্দর—ছোট্টখাট্ট এবং সুসজ্জিত। রেলপথ নেই বলেই বোধ হয় এর গ্রাম-সুলভ শান্তিটুকু বজায় আছে। কলিকাতার নিকটে হাজারীবাগকে সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম এবং উপযুক্ত স্বাস্থ্যনিবাস

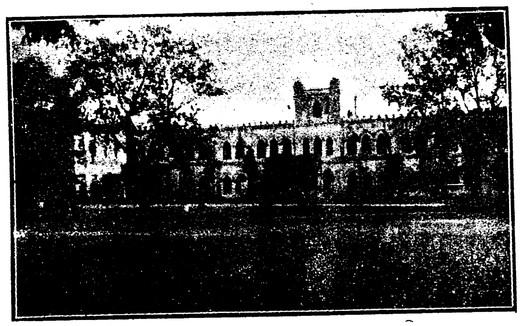

সেণ্ট্‌ কলাম্বা কলেজ

বল্লে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। সহরের গুরুত্ব এছাড়াও হচ্ছে এই যে এটা মিশনারী এবং গভর্ণমেণ্টের একটী ফৌজদারী আড্ডা। ব্যবসা বাণিজ্যেও সহরটী একটী অন্যতম কেন্দ্র। এদিকে গালা, খয়ের, সবাইঘাস, মহুয়া, আম্র এবং বাঁশ, শাল প্রভৃতি গাছ থেকে প্রচুর আয়ের এবং বাণিজ্যের খোরাক আসে। তাহা ছাড়া এ স্থানটী একটা প্রধান অভ্রখনির অধিকারীদের কর্ম্মকেন্দ্র। দ্রষ্টব্যের মধ্যে, সেণ্ট্রাল জেল, রিফরমেটরী স্কুল, পুলিশ-ট্রেনিং কলেজ, সেণ্ট কলাম্বা কলেজ, কনভেণ্ট, পিঁজরাপোল, জেনানা হাসপাতাল প্রভৃতি কয়েকটী প্রতিষ্ঠানের নাম করা যেতে পারে।

হাজারীবাগ সহরে ঘুরে বেড়িয়ে বুঝতে পারি কেন সৌখীন মোগলেরা এর নাম দিয়েছিল—হাজারী—বাগ, সহস্র বৃক্ষের উদ্যান। এই বৃক্ষরাজি পরিপূর্ণ স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যলীলা নিরীক্ষণ করে যিনি এই নামকরণ করেছিলেন তাঁর রুচির তারিফ্‌ করি। বিশাল ছোট-নাগপুরের পর্ব্বত অরণ্যের মধ্যে এই মালভূমির সৌন্দর্য্য বোধ করি সবচেয়ে সুন্দর। সহরের চারি পাশে ক্ষুদ্র

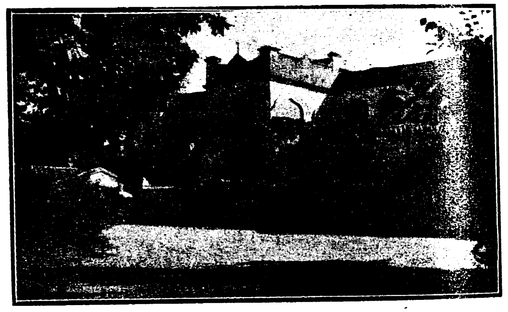

জেনানা হাসপাতাল

বৃহৎ গিরিমালা। তোরণদ্বার স্বরূপ পূব দিয়ে প্রবেশ করতেই হাজারীবাগ রোডের পাশেই চোখে পড়ে টাওয়ার হিল্‌। এই পাহাড়ের উপর থেকে পূর্ব্বে সার্ভে করা হত। তার টাওয়ারটা আজও অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়ে আছে। আর এক সীমান্তে সীতাগড় তার আটাশ শত ফিট উচ্চ বিশাল বপুটীকে নিয়ে নিত্য সূর্য্যোদয়ের প্রতিভাত আভায় রাঙা হয়ে থাকে। এটা সহর থেকে প্রায় মাইল পাঁচেক দূরে হবে। এর উপর কয়েকটী চা বাগান আছে। সহরের পশ্চাতে রাঁচি রোডের পাশে বামুনবে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। এখানে সহজে মানুষ যায় না। রবির আলোয় দূর থেকে দেখা যায় তার পায়ের কাছে চরে বেড়াচ্ছে গরুমহিষ। নিকটে গেলে রাখালছেলের

কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। উত্তরপশ্চিম কোণে ক্যানারী হিল্‌। নাতিদূরে সহরের বাসিন্দাদের একটী সুগম্য বায়ুসেবনের আড্ডা। দক্ষিণ স্পেনের জিব্রালটারের সহিত সাদৃশ্য থাকায় ইয়োরোপীয়েরা একে Gibraltar নাম দিয়েছে। এর চতুষ্পার্শ দিয়ে চলে গেছে পরিষ্কার রাস্তা—মোটরে ভ্রমণ করবার ভারী সুবিধা। পাহাড়ের পাদদেশে ঘন বনের তরুচ্ছায় কুঞ্জে কুঞ্জে চেঞ্জাররা প্রায়ই বনভোজন করতে বা শিকার করতে এসে থাকেন। সেই জন্য এই পাহাড়টী মুখর। এই ক্যানারী হিলের নিকটেই হাজারীবাগের বিশাল কৃত্রিম লেকগুলিতে প্রায়ই

হাজারীবাগ লেক্‌

লোকে সান্ধ্য ভ্রমণ করতে আসেন। মণিবাবুর রমলাতে এই লেকের ধারে রজত-রমলার রোম্যান্সের কথা পাঠকের স্মরণে আসতে পারে। এখান থেকে বৃক্ষের আড়ালে অস্তগামী সূর্য্যের সোণার রূপ দেখে মনে পড়েছিল এক অচিন কবির লাইনগুলি—

Oh! Setting Sun! I bow to thee,
With golden splendour and crimson rays
Thou art painting the blue behind the tree
Thy parting kiss on my darling's face
hath charmed me.

সহরটিতে ইংরাজদের দৃষ্টি পড়বার পর প্রথমে এখানে একটী সাহেবদের Penitentiary বা প্রায়শ্চিত্ত সাধনের বিহার ছিল। সে সময়ে বহু অনুতপ্ত গণ্যমান্য অপরাধী ব্যক্তিগণের এখানে চরিত্র সংশোধনার্থ রাখা হত। কিন্তু পরিচালনের দোষে ১৮৮২ সালে এটা বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং তার বহুকাল পরে লেকের ও-পাশে সহরের উত্তর-পশ্চিম সীমানায় বালক কয়েদীদের জন্য reformatory school স্থাপন করা হয়। পেনিটেন্সিয়ারীর কতকগুলি বাড়ী উপস্থিত আইরিশ মিশন অধিকার করে আছেন। এঁরা সাঁওতাল, ভুঁইয়া প্রভৃতি আদিম জাতিগুলিকে এক দিক থেকে যেমন দীক্ষিত করছিলেন অপর দিকে শিক্ষাবিস্তারের জন্য স্কুল, কলেজ, গির্জ্জা প্রভৃতি ক্রমশঃ নির্ম্মাণ করছিলেন। বর্ত্তমানে সহরের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকের অনেকখানি স্থান এঁদের অধিকারে। এঁরা খৃষ্টান ছাড়া এদিকে জমির অংশ বড় একটা কাউকে ইজারা দিতে চান না। সেই জন্য হার্ণগঞ্জের দিকে চেঞ্জারদের জন্য বেশী বাড়ী নির্ম্মাণ হচ্ছে না। অথচ সহরের মধ্যে এই দিকটাই সর্ব্বাপেক্ষা ফাঁকা এবং স্বাস্থ্যকর। অবশ্য উত্তরকালে কি হয় বলা যায় না।

একদিন সকালে উপরিউক্ত Dublin University Missionএর সেণ্ট কলাম্বা কলেজ দেখ্‌তে যাওয়া গেল। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রকাণ্ড বিল্ডিং। পাশেই একটা সুবৃহৎ অট্টালিকায় ছাত্রদের হোষ্টেল অনেকটা কলকাতার St. Paul's কলেজের মত। ভিতরেই টেনিস্‌ ফুটবল খেলার মাঠ। ক্লাস ঘরগুলিতে বেশ হাওয়া খেলে। কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মার্কাম্‌ সাহেবের সঙ্গে আলাপ হল। তিনি বিনয় করে বল্লেন "আপনি কলকাতার লোক। আমাদের জঙ্গলের ভিতর কলেজ। এমন কি সম্পদ আছে যে আপনাকে দেখাব।" এখানে বি-এ, আই-এ এবং আই-এসসি পড়ান হয়। ঘুরে লাইব্রেরী ও ল্যাবরেটারী দেখা গেল। কলেজের অবস্থানটি ভারী সুন্দর। সহরের এক সীমানায় উন্মুক্ত মাঠের শান্ত আবহাওয়ায় ছাত্রেরা প্রকৃতিকে অনুভব করতে পারে। বিদ্যা-চর্চ্চার উপযুক্ত স্থান। আমাদের কল্‌কাতার মত ইমারত-ঘেরা বাজারের নিকটে ট্রামগাড়ীর ঘড়ঘড়ানীর পাশে বদ্ধ হাওয়ায় বসে ক্লাস্‌ করতে হয় না। আর সত্যি কথা, আমাদের দেশ ছাড়া সকল দেশেই বিশ্ববিদ্যালয় নগরের কোলাহল থেকে দূরেই থাকে। সম্প্রতি লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নূতন সৌধটী সেই রকম জায়গাতেই নির্ম্মাণ করা হয়েছে। হাজারীবাগ কলেজে কয়েকজন বাঙ্গালী অধ্যাপক আছেন। তাঁরা অনেকেই কলেজের নিকট বলে হার্ণগঞ্জের দিকেই থাকেন। শুনলাম ছাত্রসংখ্যা ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে বলে কলেজটা তুলে দেবার প্রস্তাব চল্‌ছে।

কলেজের নিকটেই মিশনারী স্কুল—একটী মেয়েদের, একটী ছেলেদের। তারই অনতিদূরে ক্ষীরগাঁও যাবার পথে নির্জ্জন স্থানে মেয়েদের বেশ বড় একটী মিশনারী হাসপাতাল বিল্ডিং।

কলেজের উত্তরে মাঠ পেরিয়ে পোষ্ট আফিসের পাশেই ট্রেনিং কলেজ। পাটনা, কটক, গয়া প্রভৃতি সহরে ভাল পুলিশের চাকুরী সংগ্রহ করতে হলে এই কলেজ থেকে পাশ করা চাই। নিরিবিলি দেখে বিহার উড়িষ্যা সরকার এই কলেজটীকে হাজারীবাগে স্থাপন করেছেন। এই পাড়াটাতে সাহেব এবং বিলাসীদের বাস—পরিষ্কার ঝরঝরে, গাছের বাহুল্যে সুশীতল। এরই সুগন্ধ বাতাস সেবন করতে করতে পাঠকগণ চলে আসুন হাজারীবাগ রোডে। এখানে দেখতে পাবেন Hampton Court। ছোট ছোট শুইট্ নিয়ে বাবুরা বাস করছেন। সাহেবরাই বেশী। এঁরা এটাকে দিশী স্কটিশ্ হাইল্যাণ্ড্ মনে করেন। লম্বা লম্বা মোটরের রাস্তা—মনের আনন্দে চারচাকায় ঘুরে বেড়ান।

এই পাড়ায় বিরাজিত শান্তিটুকু অনুভব করতে কোন কোন দিন দল কেটে শীতের সায়াহ্নে বেরিয়ে আসতুম এই দিকে পদব্রজে। বৃক্ষের পাতার ফাঁকে চাঁদের আলো পথের আঁধার দেয় ঘুচিয়ে। এই স্তিমিত আলোয় চোখ জুড়িয়ে পথ চলতে থাকি। থেকে থেকে পাশের বাগান থেকে ফুলের মৃদু সুগন্ধ আসে ভেসে। ঝিল্লীর শব্দের মাঝে কাণে আসে গৃহস্থের আড্ডার অট্টহাস্য বা সঙ্গীতালাপ। শ্রান্ত মনের ঘুমন্ত বীণায় ঝঙ্কার উঠে' সারা দেহে অপরূপ এক পুলকের সঞ্চার করে। অদূরে গির্জ্জার ঘণ্টা ওঠে বেজে, মনে পড়ে এক অদৃশ্য অনন্ত রহস্যময় পুরুষের কথা।

হাজারীবাগকে আমার ভাল লেগেছে—এখানে রেলগাড়ীর ঘড়ঘড়ানী নেই, তীর্থযাত্রার ভিড় নেই, গোলমাল নেই। এর দেখবার মতন তাজ নেই, মিনার নেই। না আছে পীঠস্থান, তীর্থ বা কোন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের স্মৃতিচিহ্ন, না আছে বিশপ ফল, না আছে ম্যাল্। তবু এর আছে বন উপবন, তেপান্তরী মাঠ, পাহাড় নদী—বিশ্বপ্রকৃতির স্বচ্ছন্দ এবং সহজ লীলা। এর ফাঁকা নির্জ্জন পথ, বালুময় ক্ষুদ্র নদী,—শিবানী, কুনার, গরীব চাষার গ্রাম, শস্যভরা ক্ষেত, এইগুলিই এর সম্পদ। হাটে হয়ত এর দাম নেই; কিন্তু আমার কাছে এর দর উঠেছে। একে ভালবেসে ফেলেছি বলেই এত দেশ ঘুরেও আমিও আজ পাঠকের নিকট তেমনি এর কথা পাগলের মত বকে যাচ্ছি।

কলেজের সামনে রাঁচি রোড থেকে যে পথটা বরাবর চলে গেছে পূবমুখো হার্ণগঞ্জের ভিতর দিয়ে সীতাগড়ের পাদদেশ পর্য্যন্ত, সেই পথ ধরে একদিন সঙ্গী জুটিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। মাঝ পথে এসে প্রায় মাইল তিন চার দূরে চোখে পড়ল বেলজিয়ান্ রোম্যান্ ক্যাথলিক্দের কন্ভেণ্ট।

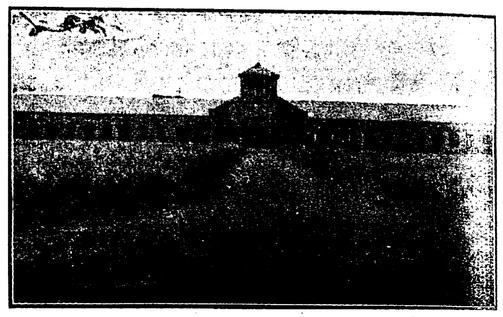

বেলজিয়ান্ কন্ভেণ্ট্

সাত সাগর তের নদী পার হয়ে এত দূরে এরা এসেছে ঘর ছেড়ে। প্রায় জন পঞ্চাশ রোম্যান ক্যাথলিক এখানে লেখাপড়া করছেন। সকলেই স্ত্রীবর্জ্জিত হয়ে ব্রহ্মচর্য্য পালন করে আপন মনে সাধনা করে যায়। দেখলাম বট্যানি ও থিওজফির ক্লাস হচ্ছে। রান্না বিভাগে কয়েকজন নিজ হস্তে রন্ধনকার্য্যে ব্যাপৃত। বিলাতী কায়দায় বাড়ী—মাঝখানে প্রার্থনা করবার হল। এক পাশে ক্লাসঘর সমস্ত, অপর পাশে থাকবার ঘর। দেশ বিদেশ থেকে ধর্ম্ম-পিপাসু পাদ্রীগণ এখানে এসে একরকম বানপ্রস্থ অবলম্বন করেছেন বল্লেই হয়।

আর একদিন, মনে নেই কবে, দল জুটিয়ে সহরের সব পাড়া ঘুরতে বেরোন গেল। প্রধান রাজপথ তখন জমে উঠেছে—যত কিছু দোকান-পত্তর হাটবাজার এরই দুই পাশে। দু-পাশে বিহারী ও মারোয়াড়ীদের ভদ্রাসন এবং দেবালয়। এটী হল সহরের কেন্দ্র। উত্তরমুখো চলেছি। বাঁ পাশে পড়ল ক্ষীরগাঁও, বড়ম্ বাজার ও পাগমিল্। পুরাতন পাড়া বলে একটু যেন ধূলো—লোকজনও বেশী। বড়ম্ বাজার হল সবচেয়ে পুরাতন পাড়া। এখানে স্থায়ী বাসিন্দা বাঙ্গালীর বাস বেশী। বড়বাজার এবং পাগমিলেও

বাঙ্গালী ভদ্রলোকদিগের বহু বাড়ী আছে। তবে পাগমিলটা একটু অভিজাত শ্রেণীর। ক্ষীরগাঁওতে চেঞ্জারদেরই ভীড় হয়ে থাকে Seasonএ। মেন রোডের উপর জৈনদের একটী মহাবীরের মন্দির,—পার্শ্বনাথ পাহাড়ের মন্দিরের অনুরূপ। বিস্তর ব্যবসায়ী মারোয়াড়ীদের বাসের ফলে এইটী হয়েচে বলে মনে হয়। অথচ ভাল একটী বড়গোছের হিন্দু দেবমন্দির নাই বল্লেই হয়। বড়বাজারের মধ্যে একটী আছে বটে কিন্তু তার তত জৌলুষ নেই। বড়ম্ বাজারের মোড়ে এসে বোস্ ব্রাদার্সে চুরুট কিনে (শীতের দিনে তাপ পাবার জন্য অবশ্য) বাঙ্গালী চায়ের দোকানে তৃষ্ণা নিবারণ

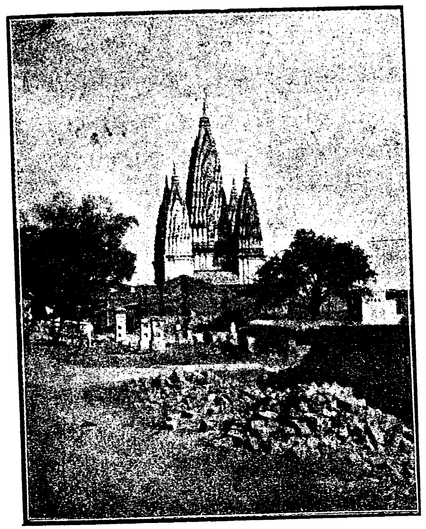

জৈন মন্দির

করে মেন রোডের উপরেই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ঢোকা গেল। বেশ ছোট্টখাট্ট টাইল্-ছাওয়া কুটীরটী। সামনের কেয়ারীকরা বাগানে সীজন্ ফ্লাওয়ার ফুটে আছে—অসংখ্য। মন্দিরের আচার্য্য মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ হল। উপাসনা হলের পাশেই বারাণ্ডায় একটী দাতব্য হোমিও-পাথিক চিকিৎসার স্থান—আর্ত্ত রোগাতুর দুঃস্থরা এসে শিশি করে ওষুধ নিয়ে যাচ্ছে। এখান থেকে আর একটু এগিয়ে নববিধান সমাজ—উপস্থিত অনেকটা শ্রীহীন এবং অনাদরে পড়ে আছে।

মাঘোৎসবে এখানে আনন্দ মেলা হয়। স্থানীয় মহিলারা এতে যোগদান করে মেলামেশা এবং পরস্পর পরিচয় করে থাকেন। এই স্থলে বলে রাখি—হাজারীবাগে খৃষ্টান

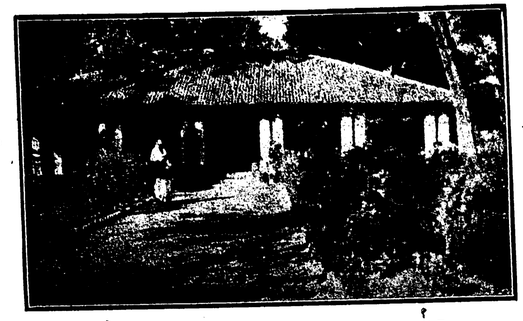

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

মিশনারীদের পরেই ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের উপর প্রথম দৃষ্টি পড়ে। শুনলাম বহু ব্রাহ্ম সম্ভ্রান্ত বংশীয়েরা এখানে এসে মাঝে মাঝে বাস করতেন। তাঁরাই এই মন্দির দুটীর সৃষ্টি করে যান। বর্ত্তমানে গিরিডিতে এঁদের উপনিবেশ বর্দ্ধিষ্ণু হওয়াতে, এ স্থানের প্রতি নজর কমে গিয়াছে। আচার্য্য মহাশয়ের উপাসনা শোনবার লোভে একদিন রবিবার সকালে মন্দিরে যাওয়া গেল—কিন্তু উপাসকদের উপস্থিতি বড় পাতলা হয় দেখলাম।

যাই হোক্ নববিধানের সম্মুখেই হাজারীবাগ হাসপাতাল দর্শন করতে ঢোকা গেল। হাসপাতালের গৃহটী কিন্তু মোটেই উপযোগী নয়। এত বড় হাতায় কেন যে

হাসপাতাল

পুরাতন ঘরগুলিতে এখনও রোগীদের রাখা হয় কে জানে। সম্ভবতঃ অর্থাভাবেই। তবে শুনলাম চিকিৎসা ভাল হয়ে

থাকে। কয়েকজন বাঙ্গালী ডাক্তারও আছেন। সব রকম বিভাগই আছে। তবে ভাল জল-হাওয়ার দেশ, ভগবানের কৃপায় রোগীর সংখ্যা অল্পই।

হাজারীবাগ নাম সার্থক হয়েছে এই সহরটীর। এর পথ, কুটীর, প্রাসাদ ঘিরে এত বৃক্ষের প্রাচুর্য্য বোধ করি আর

সীতাগড়ের পথে

কোথাও নেই। এই garden cityতে শীতের হাওয়ায় গাছের পাতা, ডাল পালা ওঠে দুলে। তারই ফাঁকে রৌদ্র এসে আলো ছায়ার খেলা চলে মাঠের ওপর পথের ওপর। তাই হাঁটতে হাঁটতে চলেছি—শ্রান্তি বোধ হয় না। পাগমিলের ভিতর দিয়ে ছাত্রার পথ দিয়ে পশ্চিমমুখো চলেছি। খানিকক্ষণ বাদে একটী পশুচিকিৎসালয় দেখা গেল। এও জৈনদের কীর্ত্তি। এরা সীতাগড়ের নিকট একটী পিজরাপোল করেছে। বছর বছর সোদপুরের মত সেখানেও

ছোটনাগপুর ব্যাঙ্কিংএর বিল্ডিং

গোপাষ্টমীর মেলা হয়ে থাকে। হ্যাঁ একটা কথা বল্‌তে ভুলেছি, বড় রাস্তায় আসতে একটী সুন্দর নূতন গৃহ চোখে পড়েছিল। সেটা হল ছোটনাগপুর ব্যাঙ্কের গৃহ। ওখানকার লোকের এটী ভারী সুবিধার। ফটো নিতে ভুলি নাই।

ফেরার কয়েক দিন পূর্ব্বে আমাদের দল পুরু হয়ে গেল। আমার আত্মীয়াদের নিয়ে একদিন বিকালে সান্ধ্য ভ্রমণে বেরিয়ে পথের মাঝে ডাকবাংলোতে সহসা এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। নাম তাঁর শশাঙ্ক রায়। তিনি আবার আমার ভগ্নীদেরই সহপাঠিনী নীলিমা দেবীকে সদ্য বিবাহ করে এসেছেন মধুচন্দ্রে কলকাতা থেকে সটান মোটরে করে। অধমকে পেয়ে তাদের ভারী আনন্দ; কারণ মনের মত গাইড্ পাচ্ছিল না তারা। সকাল থেকে এলোপাতাড়ী গাড়ী নিয়ে ঘুরেছে, একটা চেনা মুখ পায়নি। আমাদেরও সুবিধা হয়ে গেল। ওর গাড়ী নিয়ে খুব ঘোরা গেল কদিন। আর সত্যি কথা মোটর ভ্রমণোপযোগী রাস্তাগুলি দেখে আমার মোটর হাঁকাবার জন্য ক'দিন হাত দুটো নিশ্‌পিস্ করছিল।

এবার লেখকের বেদে পা দুটী রেহাই পেল। পরদিন সদলবলে সহরের উত্তর সীমানায় রিফরমেটারী স্কুল দেখতে যাওয়া গেল। সাহেব সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অনুমতি নিয়ে গাইড্ নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করা গেল। মস্ত বড় কম্পাউণ্ড্। প্রথমেই দোতালায় ৩।৪টী ব্লক্ কয়েদী ছেলেদের শয়ন ঘর। দণ্ডীকাটা ফ্লোরের উপর একটী করে কম্বল পাতা বিছানা। রাত্রে এখানে সকলকে অর্গলবদ্ধ হয়ে নিদ্রা যেতে হয়। একতলায় কারখানা ইয়ার্ড—ছেলেদের বয়নশিল্প বা তাঁত চালান, চরকায় সূতা কাটা, ছুতোরের কাজ, হাপরেতে কামারের কাজ প্রভৃতি শেখানো হচ্ছে। পাশের একটী হলে নিকেল করান, জুতো তৈরী করা বা জামা তৈরী করা অর্থাৎ মুচি, দর্জ্জি প্রভৃতির কাজ শেখানো হচ্ছে। একটী বিভাগে ড্রয়িং ক্লাস হয়। একটু মেধাবী বন্দী ছেলেদের আঁকা বা draughtsmanship শিক্ষা দেওয়া হয়। সকালে দুই ঘণ্টা করে এর ক্লাস হয়—বাহিরে থেকে ভাল শিক্ষক আসেন। রন্ধনশালায় আধুনিক প্রথায় চুল্লীতে রুটী সেঁকা হচ্ছে। কয়েদীদের সাহায্যে ভাত বা অন্য সমস্ত রান্না-বান্নাও হচ্ছে পালা করে। কয়েদীদের তিনটী করে খাবার দেওয়া হয়—সকালে জলযোগ (গুড় ছোলা এই রকম গোছের), ১০।১১টার সময়ে রুটী তরকারী এবং সন্ধ্যার সময় ভাত। সকালে রুটী দেবার

অর্থ হচ্ছে ভাত দিলে সকলে আলস্য করে দৈনিক কার্য্যে অবহেলা করবে সেই জন্য।

পাশেই প্রকাণ্ড হৌজ্—ছেলেদের স্নানের জন্য। কম্পাউণ্ডের এক সীমানায় দোতলা একটী বিল্ডিংএ বিদ্যালয়। সেখানে সকালে ছেলেদের (অল্প বয়স্ক) লেখা-পড়া শেখানো হয়। আমরা যখন গেলাম তখনও স্কুল চল্‌ছে। বারাণ্ডায় মেঝের উপর বসে ন্যাড়ামাথা কয়েদী বালকগণের অধ্যয়ন চলেছে। বাঙ্গালী ছেলের পাল নিয়ে অধ্যাপনায় রত একজন বাঙ্গালী শিক্ষক। তাঁর কাছে জান্‌তে পারলাম যে ছেলেরা কেউ এসেছে ঢাকা, চাট্‌গাঁ থেকে, কেউ বা বরিশাল, খুল্‌না। মায় আসাম থেকেও কেউ কেউ এসে থাকে। একটী ক্লাসে উর্দ্দু পড়াচ্ছেন একজন মুসলমান শিক্ষক। হিন্দী পণ্ডিত বেহারী ছেলেদের নিয়ে ক্লাস করছেন এবং একটী মাত্র ছেলে নিয়েও উড়ে ভাষার ক্লাস চলেছে। এই প্রাইমারী স্কুল দেখে আমার মনে পড়ল সায়েন্স্ কলেজের বারাণ্ডায় নৈশ অবৈতনিক বিদ্যালয়এর কথা। স্কুলের প্রতি ঘরে একটী করে রাজার ছবি এবং কয়েকটী যীশুর ছবি ছাড়া আর তেমন কিছু চোখে পড়ে না।

ফটকের বাহিরে আসবার আগে দেউড়ির পাশেই এই জেলের হাসপাতালে প্রবেশ করা গেল। অপরিচ্ছন্ন বদ্ধ একটী হলের এক কোণে দেখলাম একটী ছেলে শুয়ে আছে একা, নিকটে কেউ নেই।

নীলিমা অনুকম্পা ভরে জিজ্ঞেস করলেন—'তোর কি হয়েছে রে?'

"জ্বর হয়েছে মা" বলে ছেলেটী ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইল। নীলিমা তার কপালে হাত দিয়ে শুশ্রূষা করবার মত ভাব দেখাতেই বালকের চোখ দুটী চক্‌চক্ করে উঠ্‌ল। মনে মনে বুঝলাম একটী ছোট্ট বেদনার থম্‌কানো হাওয়া আমাদের দলের মাঝখান দিয়ে ছেলেটীর শয্যার চারপাশ ঘুরে ঘরের বদ্ধ হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

"কোথায় বাড়ী তোর, কদ্দিন আছিস্ এখানে?" গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করে বাতাসটাকে অল্প হাল্কা করবার চেষ্টা করলাম।

"বাড়ী আমার? বরিশালে। এই ত সবে ১৮ মাস হয়েছে। এখনও তিন বছরের উপর থাকতে হবে"—বল্‌তে বল্‌তে ওর গলা ভারী হয়ে এল।

আসবার সময় একটা কমলালেবু কোথা থেকে বের করে নীলিমা ওর হাতে দিলে। শশাঙ্ক আবার পকেট থেকে পয়সা বার করতে যায়। তাকে আবার থামাই। এখুনি ওয়ার্ডার টের পেলেই মুস্কিল।

উপস্থিত রিফরমেটরী স্কুলে ১৭৬জন বালক আছে। এখানে সাধারণতঃ পাঁচ বছর করে রাখা হয়। তবে ১৮ বছর বয়স হয়ে গেলে কাউকে তেমন রাখা হয় না। তাকে হয় ছেড়ে দেওয়া হয় না হয় ত জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কয়েদী বিভাগ ছাড়া প্রাইভেট বিভাগ আছে। সেখানে অনেক সময় ধনী পিতা অবাধ্য পুত্রের শোধনার্থে তাকে এখানে প্রেরণ করে থাকেন। তার জন্য ফি আছে। আজকাল প্রাইভেট্ ওয়ার্ডে তেমন ছেলে হয় না। এ গৃহটী স্বভাবতঃই বেশ পরিষ্কার এবং আসবাবপত্রে সজ্জিত। স্কুলের ব্যবস্থা মন্দ নয়। বিজলীবাতির আলো ও কলের জলের ব্যবস্থা আছে। ডায়নামো, পাম্প সব কয়েদীরাই চালায়। পরিদর্শনের শেষে চতুর গাইড্ মেয়েদের ডেকে নিয়ে গেল stores ডিপার্টমেণ্টে কিছু গছাবার উদ্দেশ্যে। ছেলেরা অনেক রকম জিনিষ প্রস্তুত করেছে—পাঠকবর্গ তার নমুনা কলিকাতার একাধিক প্রদর্শনীতে দেখে থাকবেন। আমার আত্মীয়ারা লংক্লথ ও টাওয়েল কিন্‌লেন গোটাকতক। আমি গোটা কতক বেতের জিনিষ কিনলাম। শশাঙ্ক এবং নীলিমা বিস্তর জিনিষ কিন্‌ছিল। আমার উপদেশে শেষ পর্য্যন্ত তারা গোটা চারেক বিছানার চাদর এবং কয়েকটা কলাইকরা বালতি মগ কিন্‌ল তাদের চলন্ত সংসারের জন্য। গাড়ীতে ওঠবার সময় কিছু চাঁদা দিতে হল। ফিরতে বেলা হয়েছিল; তার উপর শুনলাম সেণ্ট্রাল জেলে প্রবেশের অনুমতি পাওয়া কঠিন। অতএব দূর থেকেই বন্দীশালাকে গড় করে ফিরতি পথ ধরা গেল। তবে শুনলাম এই সেণ্ট্রাল জেলে যাঁরা কারাদণ্ড ভোগ করতে আসেন তাঁরা ওখানকার জল হাওয়ার গুণে ফিরবার সময় বেশ মোটা-সোটা এবং স্বাস্থ্যবান হয়ে ফিরে যান। বাড়ী ফেরার পথে পড়ল জেলা স্কুল, কাছারী, পোষ্ট অফিস্, সেণ্ট ষ্টীফেন্‌স্ গির্জ্জা প্রভৃতি। জেলা স্কুল বেশ বড়গোছের হাই স্কুল। ছেলেরা এখান থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে পারে। মেয়েদের তেমন ব্যবস্থা নাই। এর নিকটেই বেশ সুন্দর একটী ছাত্রাবাস। কাছারী পাড়ায় দ্রষ্টব্য হচ্ছে নূতন সেসন্‌স্

কোর্ট বিল্ডিং। এখানে মাঝে মাঝে ছোট নাগপুরের জুডিসিয়াল কমিশনার এসে বড় বড় ফৌজদারী কেস্ শোনেন এবং আপীল গ্রহণ করেন। বেবন্দোবস্তী মহাল বলে হাজারীবাগ জেলার বিচারকর্ত্তা হলেন একজন ডেপুটী কমিশনার। কয়েকজন ম্যাজিষ্ট্রেটও আছেন।

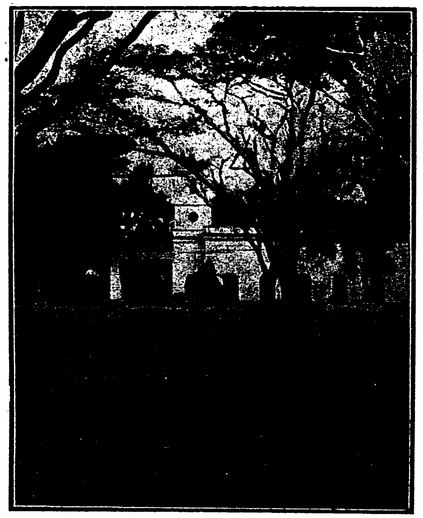

সেণ্ট্ ষ্টীফেন্‌স চার্চ্চ

দেওয়ানী বিভাগে আছেন মুন্সেফ। সুপারিটেণ্ডেণ্ট অব্ পুলিস শান্তিরক্ষা করে থাকেন। এই কাছারীতে বহু বাঙ্গালী ভদ্রলোক প্র্যাক্‌টিস্ করে থাকেন। তবে আজকাল

জেলা স্কুল

প্রাদেশিকতার হুজুগে বেহারী উকিল মহাশয়দের অবস্থা ভাল। সেণ্ট ষ্টীফেন্‌স্ গির্জ্জায় একদিন উপাসনা শুন্‌তে গিয়ে বিলাতের কবির গ্রাম্য গির্জ্জার বর্ণনা মনে পড়েছিল। বৈচিত্র্য কিছু নেই,—মামুলী যা সব জায়গায় এখানেও তাই। নিকটে একটী গোরস্থান আছে।

সেদিন বিকালে ক্যানারীতে গিয়ে বনের মধ্যে নব-দম্পতীর অনুরোধে চা এবং খাদ্য সেবন করে, বেড়িয়ে,

ছাত্রনিবাস—জেলা স্কুল

ফটো তুলে এবং শিকার করে মন্দ কাট্‌ল না। রাত্রে আমার আত্মীয়ের বাড়ী একচোট বেশ গানের মজলিস্ হল—আমার ভ্রাতা শিল্পী শ্রীঅমূল্য নাগ তাঁর বাঁশীর মিষ্টি সুরে সকলকে বেশ আনন্দ দিলেন।

আর ক'দিনই বা আছি হাজারীবাগে। কিন্তু এই ক'দিনে বন্ধুর পাল্লায় পড়ে দৈনিক কর্ম্মতালিকা পরিবর্ত্তনে যোগদান করতে হল। একদিন বরকাগাঁও, একদিন ছাত্রা, একদিন সীতাগড়ে বনভোজন। একদিন মিসেস্ নন্দীর বাড়ী নিমন্ত্রণ। একদিন মিষ্টার বসুর টি পার্টি। এমনি করে

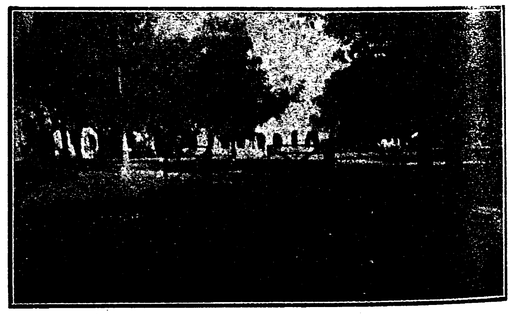

সেসন্‌স্ কোর্ট

কেটে গেল। আড্ডায় এমন জমে গেলাম যে হাজারীবাগ ছেড়ে আসা অসম্ভব বলে মনে হল। অথচ, রাঁচি; মানভূম এবং গয়া, পালামৌ যাবার কথা রয়েছে।

"ডায়েরী—১৮ই পৌষ,

উঃ কি জমান না জমে গেছলাম। না এবার যে পথ ধরে চল্‌ব ভেবেছিলাম সে পথ অনুসরণ করতে হবে। কাল শশাঙ্ক চলে গেছে। এবার আমিও যাব। কিন্তু এঁরা যে ছাড়তে চান না। অনেক করে এঁরা ছাড়ছেন। কিন্তু সকাল থেকে মেঘ করে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে, সূর্য্যদেবের পাত্তা নেই, চোখ বুজে মেঘের আড়ালে বসে আলিস্যি ভাঙ্গছেন। হাজারীবাগ মালভূমির উপর প্রায়ই না কি মেঘ এমনি ভাবে জড় হয়ে থাকে। দিন কতক এমনি ভাবে থেকে, বৃষ্টি নামিয়ে চলে যায়। আমার এক বান্ধবী বলতেন তাই, "এখানকার আপন ভোলা ধাতু কখন কি খেয়ালে ডাকে বোঝা যায় না।" আমারও আজ তাই হল, রাঁচি রোডে বাস হর্ণ দিয়ে চলে গেল, আমি রহিলাম পড়ে। ঝড় দিয়ে বৃষ্টি এল নেমে। গৃহস্বামী আমার শ্রদ্ধেয় আত্মীয় শ্রীশরৎচন্দ্র নাগ মহাশয় এ জলে শীতে কিছুতেই যেতে দেবেন না। অগত্যা ঘরে বসে দেখতে লাগলাম বাড়ীর পিছনে মাঠ জঙ্গল পাহাড়এর উপর দিয়ে ঝর্ ঝর্ করে জল পড়ে যাচ্ছে। দুরন্ত চঞ্চল পা দুটীকে আরাম কেদারায় আলোয়ান দিয়ে ঢেকে বসেছি, ঠাণ্ডার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য। ভায়া কোথা থেকে খানিকটা আগুন নিয়ে এলেন। সকলে আমায় ঘিরে বসে বললেন গল্প বল। কিন্তু এমন দিনে কি গল্প বলা যায়—আমার মন যে তখন অদূরে ওই ব্রিজের তলা দিয়ে কুনার নদীর সঙ্গে

অবগাহন

ছুটেছে—পাহাড় ধোয়া জল নিয়ে এঁকে বেঁকে ছোটনাগপুরের তরঙ্গায়িত ভূমির মধ্য দিয়ে।" পরদিন অটোবাসে রাঁচির উদ্দেশে বেরিয়ে পড়া গেল।

লাল আলো

শ্রীগোবিন্দপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

ও বাড়ীটায় আজ বুঝি বিয়ে। তাইতেই দেখ্‌ছি একগাদা লাল আলো দিয়ে গেট সাজানো হয়েছে। হ্যাঁ, লাল আলোই বটে! শুধুই লাল আলো। দরজার চারধারে, কার্ণিশের গায়ে, ছাদের আল্‌সেয়—যেদিকেই তাকাও সব দিকেই লাল আলো।···সারা রাস্তাটাই যেন লাল করে তুলেছে!·····সত্যি! এম্‌নি কোরে যদি কেবল লাল আলোই জেলে রাখা যেতো!

তাই তো—

প্রিয়নাথ ভাবলো তাই তো! বহু কাল আগেকার সব পুরুনো কথা আজ কেন মনে পোড়ছে তার? সেই একদিন—যেদিন বাঙ্গলার প্রোফেসর বোলেছিলেন—যদি বাঁচার মত না বাঁচতে পারলে তবে এ জগতে বেঁচে লাভ কি!

এ সংসারে যখন এসেছো তখন কেবল রঙীন্ বাতি জেলে দাও আসে-পাশে। যেই দেখ্‌বে রঙীন বাতি আর জ্বাল্‌তে পারছো না, আয়ুর পেছনে নিরন্ধ্র-অন্ধকার তাড়া কোরে আসছে, অমনি তাকে নিঃশব্দে নিঃশেষ কোরে দেবে—সেদিন এ কথা প্রিয়নাথের কী ভালোই লেগেছিলো। কলেজের ছুটীর পর সে এই কথাই মনের ভেতর তোলপাড় কোরতে কোরতে বাড়ী ফিরছিলো,—অকস্মাৎ একটা কৃষ্ণকায় মূর্ত্তি তার সামনে এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে বোলেছিলো—কানা অন্ধকে একটা পয়সা দাও বাবা; ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ হবে।

প্রিয়নাথ তখন কি কোরেছিলো তা এখনও তার বেশ মনে আছে। সে জিজ্ঞেস কোরেছিলো—তুমি অন্ধ?

—হ্যাঁ বাবা, দেখতেই পাচ্ছো। ঠকাবো না।

—তুমি চোখে দেখ্‌তে পাও না, দু'মুঠো খেতেও পাও না ভালো কোরে। আচ্ছা এ্যাতোতেও তোমার বেঁচে থাক্‌তে ইচ্ছে করে?

তার এ কথায় অন্ধ অবাক হোয়ে হাঁ কোরে চেয়েছিলো অনেকক্ষণ।

এর পরে প্রিয়নাথ তার মুখের কাছে দাঁত খিঁচিয়ে বোলেছিলো—মরতে পারো না? অন্ধ হোয়ে বেঁচে থাকবার চেয়ে তোমার মরবার সাধ হয় না? আফিম কেনবার পয়সা আছে? নেই? আচ্ছা এই নাও, নিয়ে আফিম কিনে খেয়ে ফ্যালো গিয়ে—! কথা শেষ কোরে তার হাতে একটা সিকি গুঁজে দিয়ে সে বাড়ী চোলে এসেছিলো।

এই রকম আরও দু'তিন দিনের কথা প্রিয়নাথের মনে পোড়তে লাগলো। সব পাগলামী! নিছক পাগলামী! —না পাগলামী নয়। এমন যদি কোন দিন ঘটে—ধরো যেদিন তার জীবনের গতিপথ অকারণে মুখ ফিরিয়ে নিলো, তার পথের সরলতা ধীরে ধীরে হোয়ে উঠলো বন্ধুরতায় পরিপূর্ণ—সেদিন সে বাঁচতেই পারবে না।···আচ্ছা, যদি সে খোঁড়া হোয়ে যায়? মনে করো ট্রাম কিংবা বাস্ থেকে নাম্‌তে গিয়ে খুব একটা চোট লাগ্‌লো যা থেকে বাঁচতে গেলে হয় তো একটা আস্ত ঠ্যাঙই কেটে ফ্যালা দরকার। সে কী কষ্ট! দু'বগলে দু'টো কাঠের ঠেকনো লাগিয়ে কাটা পায়ে কাঠ জুড়ে টকাস্ টকাস্ কোরে হাঁটা। ছিঃ ছিঃ! সে কথা মনে কোরলেও তার কান্না আসে। না—এমন হোলে তার পক্ষে বেঁচে থাকা—সে একেবারে অসম্ভব।—আচ্ছা তা না হয় নাই হোলো। তার বদলে তার সমস্ত গা ছেয়ে কুষ্ঠ দেখা দিলো। দেহের তামাটে রঙ সাদা হোয়ে উঠলো দিনে দিনে। কেবল জায়গায় জায়গায় রইলো গোটাকতক সাবেক রঙের দাগ—চুণকাম করা অফিসরুমের দেওয়ালে উড়ে বেহারার পানের পিচ ফ্যালার দাগের মত। কী ঘেন্না! এমন হোলে কি কোন ভদ্দরলোক বেঁচে থাকতে পারে; না পথে বেরিয়ে কাওকে মুখ দেখাতে পারে!—বেশ, ওসব না হয় কিছুই হোলো না। মাঝ থেকে তার চাকরীটা গ্যালো চোলে! না—না—না, প্রিয়নাথ এসব ছাই ভস্ম আর ভাবতে পারে না। এসব যা-তা ভাবতে গেলে নিঃশ্বাস বন্ধ হোয়ে আসে।

—সামনের বিয়ে বাড়ীতে লাল আলো জোলছে তা জোলুক! তাতে তার এসব ভাব্‌বার কী আছে?

রাত্তির অনেক হোয়েছে। প্রিয়নাথ জান্‌লা ছেড়ে, লাল আলো থেকে মুখ তুলে নিয়ে, অপ্রসন্ন মনের ক্ষিপ্ত ভাবনাগুলোকে সংযত কোরে, ঘরে শুতে এলো। তার বৌ শেফালিকা অনেক আগেই তাকে ডেকে গিয়েছে। এখন সে ঘুমিয়ে পোড়েছে!···প্রিয়নাথের জীবনটা বেশ! দুঃখ নেই, কষ্ট নেই, শেফালিকাকে নিয়ে, একা সংসারে, প্রশান্তির নীড়ে, মাস গেলে আশীটি টাকার সাহায্যে সে স্বর্গ রচনা কোরে চলে।

শোবার জন্যে প্রিয়নাথ খাটের ধারে এগিয়ে এলো। তার বড়ো ইচ্ছে হোলো ঘুমন্ত শেফালিকাকে সে একবার ভালো কোরে ছাখে। সে আলো জাল্‌লো না। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে আলমারী খুলে ছোট্ট একটা টর্চ বার কোরে নিয়ে এলো। তার পর তার সঙ্কীর্ণ এবং তীব্র আলোক রশ্মিটুকু শেফালিকার মুখের ওপরে ফেললো।—ভারী সুন্দর মুখ! টুলটুলে গাল দুটো যেন গোধূলির সমস্ত আভা অপহরণ কোরে নিয়েছে। ভুরু যোড়া কালো—হঠাৎ দেখলে মনে হয় একেবারে সুদক্ষ চিত্রকরের তুলির টানে আঁকা। ওতে কোন খুঁত নেই। কিন্তু একটু নজর কোরে তাকালেই বোঝা যায়, না তা নয়—একেবারে নিখুঁত নয়।—তা হোক্! শেফালিকাকে ঐ অ-নিখুঁত ভুরুতেই মানায় ভালো। ও ভুরু ওরই নিজস্ব সম্পদ।—আবার চোখ দুটো কী চমৎকার! ঘুমের ঘোরেও পুরোপুরি বোজে নি! নীচের দিক দিয়ে, মেঘের ফাঁকের তারার মত আধ-ঢাকা মণি দুটো দেখা যাচ্ছে।—নাক্‌টা খুব লম্বা নয়।—তা না হোক—প্রিয়নাথের মনে হোলো এই লম্বা-নয় নাকে শেফালিকাকেই দেখ্‌তে হয় সুন্দর।—আর কপালের ওপরে চুলগুলো সব এসে পোড়েছে। অসংবদ্ধ এলো চুল! বালিসের সঙ্গে কুস্তি কোরে ফেঁপে উঠেছে—মার্ভেলস্।

টর্চ নিবিয়ে প্রিয়নাথ শেফালিকার গালে দুটো টোকা

মেরে আপন মনে বোল্‌লো—এই শেফালিকা—একদিন এর ঐ গাল এমন রঙীন, এমন নিটোল থাক্‌বে না নিশ্চয়! একদিন এর দেহের, এর রূপের সব দিক দিয়েই ভাঙ্গন সুরু হবে।···সেদিন?

শেফালিকার এক পাশে একটু স্থান কোরে নিয়ে প্রিয়নাথ শুয়ে পোড়লো। আর সে ভাবতে পারে না। বিয়ে বাড়ীর লাল আলো আর ত এখন চোখে আস্‌ছে না—তবু এমন উচ্ছৃঙ্খল ভাবনা কেন?

সকালবেলা চা দিতে এসে শেফালিকা বোল্‌লো—তোমার কাল কি হোয়েছিলো বল তো? সারারাত্তির বিড় বিড়—একটুও ঘুমুতে দাও নি! মাগো! বুড়ো ছেলের আবার এ কি পাগলামী!

প্রিয়নাথ চোম্‌কে উঠ্‌লো—লাল আলো! না না কিছু নয়।—এঃ, চা-টা যে একেবারে কুল্লীবরফ হোয়ে গিয়েছে!

তাড়াতাড়ি চা-টুকু শেষ কোরে, একটা জামা গায়ে চড়িয়ে সে বাজারের দিকে রওনা হোলো। আজ একটু চট্‌পট্ সেরে নিতে হবে। একটু সকাল সকাল বাড়ী থেকে বেরুতে হবে—কারণ আজ যে তার আফিসে জয়েন করবার দিন। পুরো দু'মাস ধোরে ছুটী উপভোগ কোরে এখন সে হাঁপিয়ে পোড়েছে। কাঁহাতক নিষ্কর্ম্মা হোয়ে লোকে বাড়ী বোসে থাক্‌তে পারে!

ঘণ্টাখানেক পরে প্রিয়নাথ যখন বাজার সেরে বাড়ী ফিরলো তখন সাড়ে ন'টা আন্দাজ হবে। আর আধ ঘণ্টার ভেতরে চান খাওয়া সেরে না বেরুতে পারলে সে সাড়ে দশটায় হাজরে দিতে পারবে না। সে তাই তাড়াতাড়ি তেল মেখে নিয়ে কলতলায় ঢুক্‌লো। ওপরে শেফালিকা তখন রান্নায় ব্যস্ত। প্রিয়নাথ বালতির ভেতরে গামছা ডোবাতে ডোবাতে হাঁকলো—ভাত বাড়ো—ভাত বাড়ো! ঠাঁইটা কোরে রেখে দাও—

—চিঠ্‌-ঠি! বাবু চিঠ্‌ঠি হ্যায়!

পিওন এসেছে চিঠি নিয়ে। প্রিয়নাথ দ্রাম কোরে কলতলার দরজায় ধাক্কা দিয়ে বাইরে এলো।—আজ কি পিওনও আসবার সময় পেলো না! যত গোলমাল তার আফিসে যাবার আগে! না, দেরী হোয়ে যাচ্ছে। ভিজে হাতেই সে চিঠিটা খুলে ফেল্‌লে।—আরে! এ যে আফিসের চিঠি! কাল ছেড়েছে ব্যাটারা!

ওপর থেকে শেফালিকা শুধালো—কার চিঠি গো? নান্তু লিখেছে বোধ হয়!

প্রিয়নাথ জবাব দিলো—আমারই। হঠাৎ আবার চিঠি লিখ্‌লো কেন। এই ত সে দিন—কথা অসমাপ্ত রেখেই সে সদর দরজার গোড়ায় পথের ওপরে ধপ কোরে বোসে পোড়্‌লো। শেফালিকা দুম্‌দাম্ কোরে নীচে নেমে এলো—কি হোয়েছে এ্যাঁ? তুমি যে অমন কোরে বোসে পোড়লে! ওমা! ও কি গো···অমন কোরছো কেন?

কিছুক্ষণ প্রিয়নাথের মুখ থেকে রা সোরলো না। দু'হাতে চোখ ঢেকে, হাঁটুর ভেতরে মাথা গুঁজে সে ঝিম মেরে বোসে রইলো। তার কেবলই মনে হোতে লাগলো, এ বিশ্বসংসারের আলোটুকু এক লহমায় কালো হোয়ে গিয়েছে। —হায়! হায়! কি হবে তার!

শেফালিকা দরজার পাশ থেকে আবার ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞেস কোরলো—ওগো তোমার পায়ে পড়ি, লক্ষ্মী বলো কি হোয়েছে?

কি হোয়েছে?—আস্তে আস্তে উঠে এসে উদাস সুরে প্রিয়নাথ বোললো—কি হোয়েছে? কি আর হবে বেশী। শুধু চাকরীটা চোলে গ্যালো।

—চাকরী চোলে গ্যালো? চাকরী চোলে গ্যালো কি কথা?

—হ্যাঁ চাকরীই চোলে গ্যালো—প্রিয়নাথ বোল্‌তে লাগলো—সেই খবরই এই চিঠিতে এসেছে। পাঁচ বছরের কম যাদের চাকরী তাদের সবারই যাচ্ছে, আমারও গ্যালো। উঃ এই বাজারে! এইবার শুকিয়ে মরা ছাড়া আর উপায় নেই!

গভীর রাত।

দেয়ালের ঘড়িতে দোলন-কাঁটা টক্ টক্ শব্দে আওয়াজ কোরে এক একটা সেকেণ্ডের পলায়ন ঘোষণা কোরছে। দূরে একটা পুরোনো ভাঙ্গা বাড়ীর পাশে একটা ছোট পুকুর; তার ওপরে একটুক্‌রো কুয়াশা পেঁজা-তুলোর মত জমে রোয়েছে। আরও ওধারে কাদের বাড়ীর জান্‌লা দিয়ে একটা আলো দেখা যাচ্ছে—যেন রেলগাড়ীর গার্ডের হাতের একচোখো লণ্ঠন। নিঃশব্দে সব লক্ষ্য কোরছে। ও-পাশ থেকে একটা কুকুরের ডাক শোনা গ্যালো। সঙ্গে সঙ্গে

আর একটা এবং অতঃপর অনেকগুলো কলরব কোরে উঠলো।

প্রিয়নাথ টর্চ জেলে মিয়ে শেফালিকার মুখের ওপরে অতি সন্তর্পণে নিক্ষেপ কোরলো। শেফালিকা ঘুমুচ্ছে—একেবারে নিঃসাড়ে। তার বাঁ হাতখানা এলিয়ে পোড়েছে পাশবালিসের ধারে। কপালের সিঁদুর আধ-মোছা হোয়ে এসেছে। এইমাত্র হয় তো কোন একটা স্বপ্ন দেখে হেসেছিলো—সেই হাসির ক্ষীণ রেখা এখনও তার ঠোঁটের কোণায় জেগে রোয়েছে। ভারী মজা কিন্তু!

প্রিয়নাথ আস্তে আস্তে তার রাইটিং টেবিলের কাছে এগিয়ে এলো।—হ্যাঁ, সে যা কোরবে ঠিক কোরেছে তার আর নড়চড় হবার যো নেই—তা ভীষ্মের প্রতিজ্ঞার মতই কঠিন!

টেবিলের এক পাশে মুদির দোকানের হিসেবের খাতা পোড়ে। এক মাসের পুরোপুরি তার দোকানে বাকী। মাসকাবারে সেই দেনা তাকে শোধ কোরতেই হবে! তার ওপরে আছে দুধওলা, তেলওলা এবং আরও অনেকে। স্যাকরার কাছে শেফালিকার হার গড়ানোর দরুণ তিনশো টাকা বাকী। অনেক দিন হোয়ে গেছে—সেটা এ মাসে ফেলে দিতেই হবে।

প্রিয়নাথ কলমটা আর একটুকরো কাগজ টেনে নিয়ে লিখতে বোস্‌লো। এই সময়ে তার অনেক কথা মনে পোড়ছে।—এই বাড়ী, জানা-অজানা আত্মীয়-স্বজন, এপাড়া-ওপাড়ার বন্ধুর দল এবং আরও অনেকের কথা। সব চেয়ে বেশী মনে পোড়ছে শেফালিকার কথা—তা পড়ুক।

প্রিয়নাথ লিখ্‌তে সুরু কোরলো—

প্রিয়তমাষু!

যাবার বেলায় এই তোমাকে শেষ সম্ভাষণ জানিয়ে যাচ্ছি। বাঁচা আমার পক্ষে অসম্ভব। অতি ক্ষুদ্র দুঃখকেও আমি বুক পেতে নিতে পারি নে—পারি নে কারণ, বেঁচে থাক্‌তে গেলে যে সমস্ত স্বাভাবিক ক্ষমতা থাকা দরকার, তা আমার নেই। এই জন্যেই আজ আমাকে নিঃশব্দে আত্মহত্যা রচনা কোরতে হোচ্ছে। এতে তুমি দুঃখ কোরো না শেফালিকা। যতক্ষণ আমার স্বচ্ছন্দে বেঁচে থাকবার মত অবস্থা ছিলো ততক্ষণ আমি জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ কোরেছি। এখন তার গতি ফিরেছে—তাই তার যবনিকা পাত করা দরকার। তোমাকেই জিজ্ঞেস করি—আমার জীবন-পথে যে সমস্ত দুঃখ একে একে এগিয়ে আস্‌ছে তাদের সঙ্গে লড়াই কোরে বেঁচে থাকায় কি লাভ?

আর এক কথা। যাবার সময় তোমাকে আজ একটা কথা বোলে যেতে চাই। যে দুঃখ আমার জন্যে ছিলো তোলা, আমি চোলে গেলে তা তোমাকেই আঘাত দেবে। সেই জন্যেই বলি—আমার দেখানো পথ তুমিও ভবিষ্যতে অবলম্বন কোরো। তাহলে সুখী হবে। এর জন্যে তোমাকে আমার সাহায্য করা উচিত—কারণ আমি তোমার বন্ধু। আলমারির মাজের থাকে বিষ রইলো। ওর অর্দ্ধেকটুকু আমি নিজের কণ্ঠে ঢেলে দিচ্ছি—আর বাকীটুকু দিয়ে গেলাম তোমাকে। সুখী হও—

তোমার ওপর আমার অবিনশ্বর প্রেম জেনো……

ইতি তোমার প্রিয়নাথ।

চিঠিখানা শেষ কোরে প্রিয়নাথ সেটা ধীরে ধীরে শেফালিকার মাথার বালিসের নীচে গুঁজে রেখে আলমারির কাছে এগিয়ে গ্যালো। মনের ভেতর তার যেন কান্না জোমে আস্‌ছে। বুক ধড়্‌ফড়্‌ কোরছে। এ যেন নিজের ঘরে নিজে চুরি করা। প্রিয়নাথ আলমারি খুলে কি একটা জিনিষ বার কোরলো। বার কতক সে এই পদার্থটুকু নাকের কাছে ধোরে গন্ধ পরখ কোরলো।—এমন কিছু তীব্র নয়। কিন্তু এরই কয়েক কণা পেটে গেলে এর তীব্রতার কাছে সমস্ত বিশ্ব যাবে কালী আর পরিম্লান হোয়ে। প্রিয়নাথের হাতটা কেঁপে উঠ্‌লো।

তার অন্তর তাকে কেবল তাড়া দিতে লাগলো—নাও খেয়ে নাও। দেরী কোরলে এ সুযোগ কি আর ফিরে পাবে? এক্ষুণি যদি শেফালিকার ঘুম ভেঙ্গে যায়!—নাও, নাও—

সে উত্তর দিলে—দাঁড়াও খাচ্ছি। তাড়াতাড়ি কিসের। দু'পাঁচ মিনিট বেশী বেঁচে থাক্‌লে কি আর ভাগবত অশুদ্ধ হোয়ে যাবে? মরণ ত আমার শিরোধার্য্য। কে আর বাঁচাবে বলো? আমি ত আর এমন নই যে যমকে ডেকে এনে বোলবো—আমার কাঠের বোঝাটা তুলে দিয়ে যাও!

প্রিয়নাথ পদার্থটুকু আর একবার শুঁকলো। এলো-মেলো কত কথা তার মনে পোড়তে লাগ্‌লো—এই সুন্দর, এই মিষ্টি জীবন—তা তাকে নষ্ট কোরতে হবে! লোকে খোঁড়া হোয়ে বেঁচে থাকে—অন্ধ হোয়ে বেঁচে থাকে—চাকরীও ত কত লোকের যায়—! কিন্তু তা বোলে কি সকলেই আত্মহত্যা করে?

এমন সময় তার হাতের টর্চ-লাইটটা মেজেয় পোড়ে গিয়ে চুরমার হোয়ে গ্যালো এবং পরক্ষণেই সেই শব্দে শেফালিকার ঘুম ভেঙ্গে গ্যালো। সে বিছানার ওপরে উঠে বোসে শুধালো—কে?

প্রিয়নাথ তাড়াতাড়ি হাতের বিষটুকু জানালার বাইরে ফেলে দিয়ে উত্তর কোরলো—আমি।

বিয়ে বাড়ীতে আজ বৌভাত। এই এত রাত্তির পর্য্যন্ত সব আলোগুলোই জ্বোল্‌ছে। কিন্তু প্রিয়নাথ দেখলো সে আলোগুলো আজ আর লাল নয়। সবুজ, নীল, গোলাপী, সব রকমে মেশানো। শুয়ে শুয়ে সে কত রকম আলো জ্বোলছে তাই গুণতে লাগ্‌লো—এক, দুই, তিন—অনেক রকম।—হ্যাঁ ছ' সাত রকমই বটে!

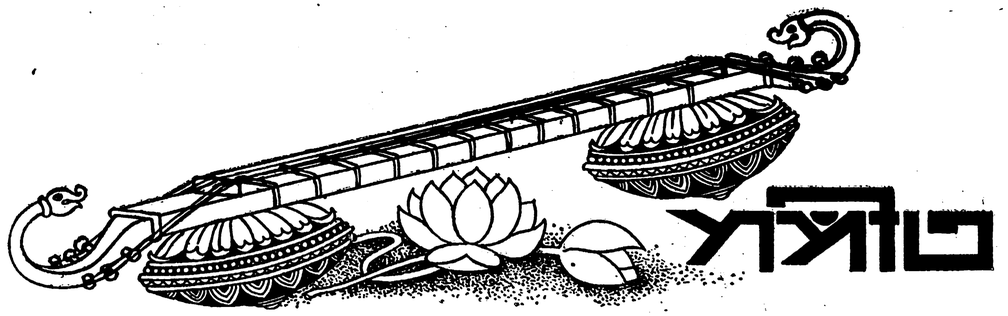

সঙ্গীত

[এই গানখানি কুমারী নীলিমা বসু কলম্বিয়া রেকর্ডে গাহিয়াছেন। আজ আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত এই সু-কণ্ঠী গায়িকার সঙ্গে আমাদের চির বিদায়ের কথা বলিতেছি।

কুমারী নীলিমা বসু

জন্ম—১৯২০ খৃষ্টাব্দ মৃত্যু—১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ

কুমারী নীলিমা বসু আর ইহ-জগতে নাই। বিগত ৬ই জানুয়ারী তারিখে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তিনি চব্বিশ পরগণাস্থ টাকী সৈদপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত কুমারনাথ বসু মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় তাঁহার জন্ম হয়। সরকারী চাকুরী ব্যপদেশে তাঁহার পিতা রেঙ্গুনে অবস্থান করাতে তাঁহার সঙ্গীতের বাল্যশিক্ষা রেঙ্গুনেই আরম্ভ হয়। অতঃপর আট বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি রেডিও আর্টিষ্ট হন। কন্যার সঙ্গীতানুরাগ ও কণ্ঠ-লালিত্য দেখিয়া তাঁহার পিতা অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়া তাঁহাকে সঙ্গীত শিক্ষার সুযোগ দিয়াছিলেন। কলিকাতায় রাখিয়া কন্যাকে উচ্চ সঙ্গীতে পারদর্শিনী করিবার জন্য তিনি সুপ্রসিদ্ধ খেয়াল গায়ক শ্রীযুক্ত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে তাঁহার গৃহশিক্ষকরূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কাশীবাবুর শিক্ষা-কৌশলে কুমারী নীলিমা অতি অল্প দিনেই অদ্ভুত সঙ্গীতজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছিলেন।

কুমারী নীলিমা বসুর রেকর্ডের গানে সকলেই মুগ্ধ। তিনি আমাদের দূর-দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গিয়াছেন সত্য কিন্তু তাঁহার সুরসাল কণ্ঠস্বরে তিনি চিরকাল আমাদের অন্তরে জাগ্রত রহিবেন।]

কথা ঃ—শ্রীনরেশ্বর ভট্টাচার্য্য সুর ও স্বরলিপি ঃ—শ্রীশৈলেশকুমার দত্তগুপ্ত

রামপ্রসাদী—দাদ্‌রা

কে বলে মা তোমায় কালো।
(তোমার) অঙ্গ হ'তে ঠিক্‌রে পড়ে
হাজার রবি শশীর আলো॥
নিখিলের এই মণিকোঠায়
উজল তুমি হাজার রঙ্গে,
কত রূপের চন্দ্র-কণা
ঝরছে তোমার নয়ন-ভঙ্গে,
মন-মোহিনী বেশ দেখে তো
মহেশ দেহ-শব বিছালো॥

ভক্ত কবি রামপ্রসাদের
তুমি মাগো গানের স্তুতি,
ভক্তি-বালক রামকৃষ্ণের
প্রাণের তুমি পরম দ্যুতি,
(আজ) অনাথা এ কাঙালিনীর
হৃদয়ে প্রেম-জ্যোতি জ্বালো ॥

২ + ॥
ধা II ধা পা পা | মা মা -া I গা মা -া | -মগা -রসা সা I রা মা পা |
কে ব লে মা তো মা য়্ কা লো - - - - - কে ব লে মা

| ধা ধা -া I ধা পধা ণর্সা | -র্সণা -ধপা -পধা I -ণণা -ণধা -পমা | -গা -মা -া I
তো মা য়্ কা লো - - - - - - - - - - - - - -

I া ধা ধা | ণা -া র্সা I -া র্সা র্সা | ধা -র্সা র্সা I -া ণা ধা |
- তো মার্ অ ঙ্ গ - হ’ তে ঠি ক্ রে - প ড়ে

| ধা ধা -ণা I ধা পা -া | পা ধা -া I ধা পধা -ণর্সা | -র্সণা -ধপা -পধা I
হা জা র্ র বি - শ শী র্ আ লো - - - - - - -

I -ণণা -ণধা -পমা | -গা -মা ধা II
- - - - - - - - “কে”

২ +
সা II রা -মা পা | ধা ধা ণধা I ধণা -ধণা ধমপা | া া পা I ধা পা পা |
নি খি লের্ এই ম ণি কো ঠা - - য়্ - - উ জল্ তু মি

| মা মা ধা I পা মা -া | -া -া ধা I ধা মা পা | ধা -া ধা I
হা জা র্ র ঙে - - - ক ত রূ পের্ চ ন্ দ্র

I ধা ধা -া | -া -া ধা I ধা ণা -র্সা | ধা ধা র্সা I ণা ধা -া |
ক ণা - - - ঝর্ ছে তো মার্ ন য় ন্ ভ ঙ্গে -

স্মৃতি-তীর্থে

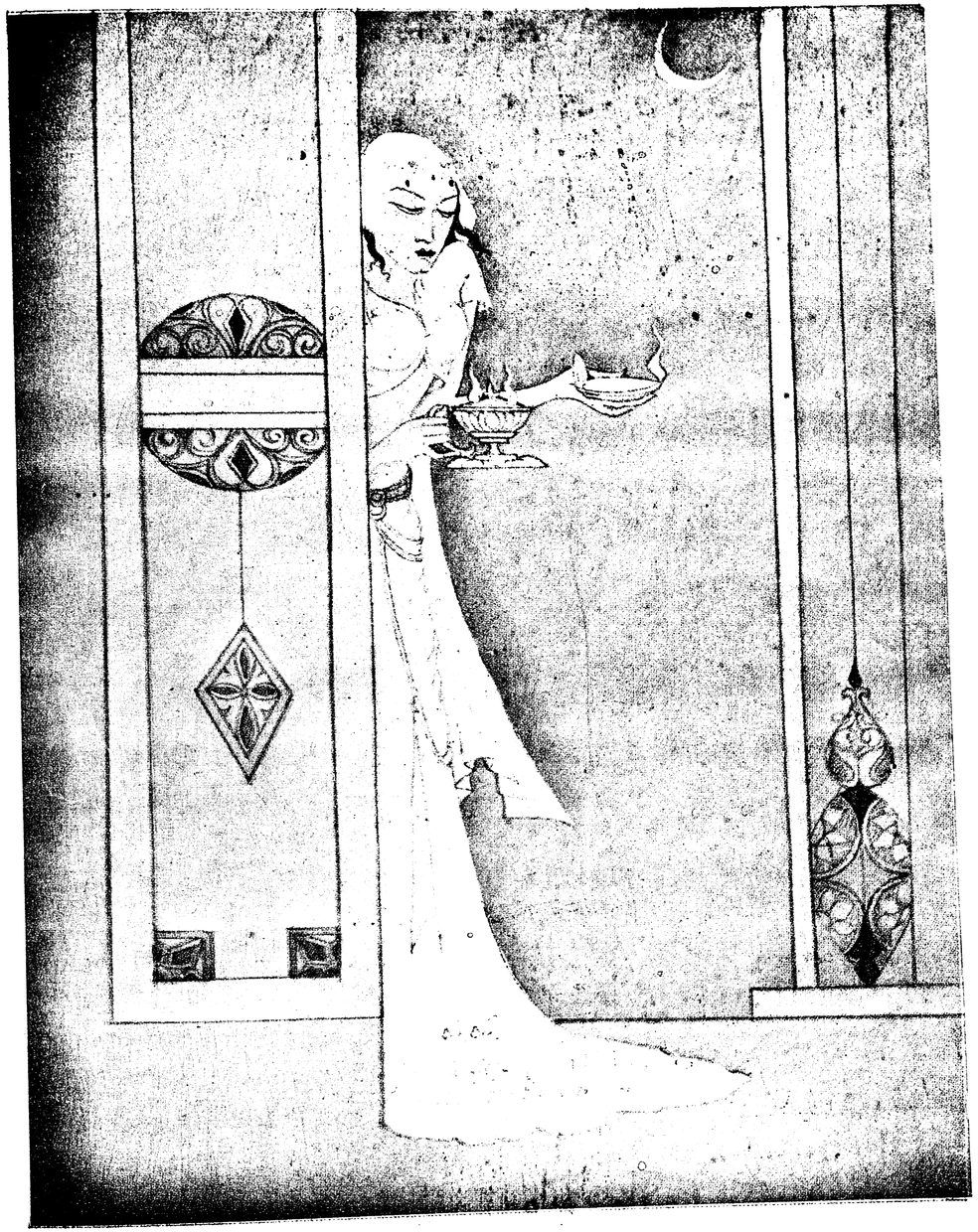

শিল্পী—শ্রীযুক্তা হাসিরাশি দেবী

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

COLOURED ILLUSTRATION

| -া -া মা I মণা ণা ণা | পা ণা ণা I ণা ণর্সা -ণধা | ধা ধা -ণা I
- - মন্ মো হি নী বে শ্ দে খে তো - - ম হে শ্

I ধা পা -া | পা -া পা I ধা পধা -ণর্সা | -র্সণা -ধপা -পধা I -ণণা -ণধা -পমা |
দে হ - শ ব্ বি ছা লো - - - - - - - - - - - - - -

| -গা -মা ধা II
- - "কে"

২ +
সা II রা মা পা | ধাঃ -ধঃ ধা I ধণা ধণা -পা | -া -া পা I ধা পা পা |
ভক্ ত ক বি রা ম্ প্র সা দে র্ - - তু মি মা গো

| মা মা -ধা I পা মা -া | -া -া ধা I ধা মা -পা | ধা -া ধা I
গা নে র্ স্ত তি - - - ভক্ তি বা লক্ রা ম্ কৃ

I -া ধা -া | -া -া ধা I ধা ণা র্সা | ধা ধা র্সা I ণা ধা -া |
ষ্ ণে র্ - - প্রা ণের্ তু মি প র ম্ জ্যো তি -

| -া -া মা I মণা ণা ণা | পা ণা ণা I ণা ণর্সা -ণধা | ধা ধা ণা I
- - অ না থা এ কা ঙ্ গা লি নী - র্ হৃ দ য়ে

I ধা পা -া | পা -া পা I ধা পধা -ণর্সা | -র্সণা -ধপা -পধা I -ণণা -ণধা -পমা |
প্রে ম - জ্যো - তি জ্বা লো - - - - - - - - - - - -

| -গা -মা ধা II II
- - "কে"

পান্থ-নিবাস

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

১৭

আশাভঙ্গের একটা মস্ত বড় দুঃখ আছেই। কিন্তু তপন নিজের অবস্থার সঙ্গে সুরেন্দ্রবাবুর অবস্থার যতই তুলনা করে, ততই তাহার মনে হয়, সুরেন্দ্রবাবুদের ব্যবহারে সে যত ক্ষুব্ধ হইয়াছে ততটা ক্ষুব্ধ হওয়ার মতো কিছু নাই। বিশেষ, সুরেন্দ্রবাবুকে দেখিলে তাহার ক্ষোভ আরও কমিয়া যায়। ভদ্রলোক তাহাকে দেখিলে চোরের মতো সরিয়া পড়েন। নিতান্ত সামনে পড়িয়া গেলে কি যে বলিবেন ভাবিয়া পান না। বড় ভালো লোক। তাহার চাকুরীর জন্যও কম শ্রমস্বীকার করেন নাই।

তপন ভিতরের কথা জানে না। কাহার আপত্তিতে যে এ বিবাহ ভাঙিয়া গেল সে সংবাদও সঠিক জানে না। তবে শ্যামলীর মায়ের সস্নেহ বচন তাহার ভালো লাগে নাই। তথাপি সে ইহাদের প্রাণপণে ক্ষমা করিতে চেষ্টা করে। তাহার পক্ষে মস্ত বড় সান্ত্বনার কথা এই যে, শ্যামলী তাহাকে ভালোবাসিয়াছে,—সে নিরপরাধ,—এবং এই মুহূর্ত্তে তাহারই মতো কষ্ট পাইতেছে।

তপন প্রাণপণে ইহাদের ক্ষমা করিতে চেষ্টা করে। তবু মন যেন কেমন এলোমেলো হইয়া গিয়াছে। কিছু ভালো লাগে না,—কিছুতে মন দিতে পারে না।

সেদিন রবিবার। মেসে হট্টগোল চলিতেছে। কাল মেস বদল করা হইবে। তপনের এই হট্টগোল ভালো লাগিতেছিল না। ভাবিল একবার ছোটদাদার বাড়ীটা ঘুরিয়া আসা যাক। ইহার মধ্যে আর একদিনও ওদিকে যাওয়া হয় নাই। অথচ যাওয়া খুবই উচিত ছিল,—বিশেষ চাকুরীটা হওয়ার পর। তপন আলোয়ানটা গায়ে ফেলিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

তখন ছোটদাদার বাড়ীতে শ্যামলী ও বৌদিদিতে এই প্রসঙ্গেই কথা হইতেছিল।

শ্যামলীর দুঃখ এই একটি মেয়েই বোঝে। তাহার সঙ্গে বৌদিদির পরিচয় খুব বেশী দিনের নয়। কিন্তু ইহারই মধ্যে উভয়ের মধ্যে প্রীতির বন্ধন স্থাপিত হইয়াছিল। শ্যামলীকে সে চিনিয়াছে। বুঝিয়াছে, নিঃসঙ্গ গৃহকোণে মনের দুঃখ মনে চাপিয়া মেয়েটি হাঁফাইয়া উঠিয়াছে। তাহার কাছে দুদণ্ড মনের কথা কহিয়া তবু খানিকটা সান্ত্বনা পাইবে।

রবিবারে সকাল-সকাল খাওয়া দাওয়া সারিয়া সে শ্যামলীদের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল। একথা সেকথার পর অবশেষে শ্যামলীর মাকে কহিল,—শ্যামলীকে আমাদের ওখানে নিয়ে যাচ্ছি মা। সন্ধ্যের আগেই পাঠিয়ে দোব।

শ্যামলীর মা একগাল হাসিয়া বলিলেন,—তোমার বাড়ী নিয়ে যাবে সে কি আর জিগ্যেস করতে হবে মা, না অনুমতি নিতে হবে? কিন্তু আজ বাদে কাল বিয়ে হবে। তারা তো আর আমাদের মতো গেরস্থ নয় মা, রাজা বললেই হয়। এখন কি আর পাড়া-বেড়ানো চলে?

বৌদিদিও কম পাত্র নয়। সেও একগাল হাসিয়া শ্যামলীকে বুকে জড়াইয়া কহিল,—শ্যামলী বুঝি রাজরাণী হ'লে আর আমাদের সঙ্গে কথা কইবে? না, আমাদের বাড়ী যাবে? সেই জন্যেই তো আজকে নিয়ে যেতে চাচ্ছি মা। আজও জোর আছে তাই এসেছি।

এ কথার পরে আনন্দে ও গর্ব্বে শ্যামলীর মা গলিয়া গেলেন। কহিলেন,—সে কি কথা, বৌমা, আছেই তো তোমাদের জোর। তোমার বাড়ী যাবে, তুমি নিজে নিতে এসেছ,—তার ওপর কি 'না' বলতে পারি? তা, সন্ধ্যের আগে যেন পাঠিয়ে দিও বৌমা। নইলে উনি আর রক্ষে রাখবেন না।

বৌদিদি শ্যামলীকে বাহুপাশ হইতে মুক্ত করিয়া দিয়া কহিল,—তাহ'লে যাও ভাই, শীগগির কাপড়টা ছেড়ে এস। দেরী কোরো না।

মায়ের ন্যাকামিতে শ্যামলীর সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা করিতেছিল। সে যেন পলাইতে পারিলে বাঁচে! কহিল,—চলুন।

বৌদিদি হাসিয়া কহিল,—কাপড়টা ছেড়ে এস।

আপনার অত্যন্ত সাধারণ পরিধেয় বস্ত্রের দিকে শ্যামলী

একবার চাহিল। তার পর বৌদিদিকে একটা ঠেলা দিয়া কহিল,—তা হোক। আপনারা তো আর বাবুগঞ্জের মুখুয্যেরা নন বৌদি, আপনাদের বাড়ীতে এই পোষাকেই চলবে।

বলিয়া খোঁচাটা কতখানি মাকে আঘাত দিল তাহা দেখিবার জন্য না দাঁড়াইয়াই বৌদিদির আগে-আগে নীচে নামিতে লাগিল।

মেয়ের খোঁচা খাইয়া শ্যামলীর মা এক পলকের জন্য স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। কিন্তু তখনই হাসিয়া বৌদিদিকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,—শোনো মেয়ের কথা! সবাই বুঝি বাবুগঞ্জের মুখুয্যেদের মতো বড় লোক হয়!

যে কথা প্রাণান্তেও শ্যামলী কাহাকেও বলে নাই, এই স্নেহপরায়ণা মেয়েটি পাশে বসিয়া তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিতেই তাহা প্রকাশ হইয়া গেল। শ্যামলী তাহার বুকে মুখ লুকাইয়া ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

বৌদিদি তাহার চোখ মুছাইয়া দিয়া, মুখে মাথায় সস্নেহে হাত বুলাইয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিল, অমন ভাঙিয়া পড়িলে তো চলিবে না। মেয়েমানুষের জীবনে এমন ছোট-খাটো ব্যাপার কিছুই নয়। প্রথম প্রথম মনে হয় বটে, এত বড় দুঃখ ওইটুকু নরম বুকে সহ্য হইবে না। কিন্তু দেখিতে দেখিতে সবই সহ্য হইয়া যায়। যাহাকে একদিন না দেখিলে মৃত্যুকামনা করে, তাহাকে আর মনেও পড়ে না। এই নিয়ম।

—আপনিও সেই কথা বলছেন বৌদি?

—সবাই সেই কথা বলবে ভাই। বিয়ের আগে কোন্ মেয়ের জীবনে এমন একটা-আধটা ঘটনা না ঘটে! তাই ব'লে তাই কি কেউ মনে রাখে, না মনে থাকে? আমারও আজ কম দুঃখ হবার কথা নয় ভাই। আমার এক দিকে তুমি, আর এক দিকে ঠাকুরপো। তবু মনে হয়, তোমার বাপ-মা যেখানে বিয়ের ঠিক করছেন, সেই তোমার সত্যিকার স্থান।

অকস্মাৎ শ্যামলী মাথা তুলিয়া চাহিল। আহত ফণিনীর মতো দৃপ্ত ভঙ্গীতে কহিল,—কেন? তাদের অনেক টাকা আছে তাই?

বৌদি হাসিয়া কহিল,—তাই। টাকা কি সোজা জিনিস ভাই?

শ্যামলীর মুখ-চোখ ঘৃণায় কুঞ্চিত হইয়া উঠিল—ছিঃ! ছিঃ! আপনিও—

বৌদি কিন্তু তথাপি হাসিতে লাগিল। বলিল,—সত্যি কথা বলব না?

—না, সত্যি কথা নয়। আমি ছেলেমানুষ, টাকার মহিমা হয় তো বুঝি না। কিন্তু আপনিও তো আমার চেয়ে বেশী বড় নন। আপনি শুধু আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন।

বৌদি এই আক্রমণে ভড়কাইয়া গেল। হঠাৎ কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না।

শ্যামলী বলিতে লাগিল,—টাকা ওদের কত আছে জানি না। শুনি তো অনেক আছে। কিন্তু সে টাকা আমার কোনো কাজেই লাগবে না। শুধু কোনো দিন যদি ডুবে মরতে হয়, সেই টাকার থলি গলায় বেঁধে মরা চলবে। আর কিছু নয়।

এবারে বৌদি হাসিয়া কহিল,—এই কথা আজকে ব'লে যাচ্ছ, আবার কিছুদিন পরেও জিগ্যেস করব। সেদিন কিন্তু তুমিই এর উল্‌টো কথা বলবে।

—কক্ষনো না।

ঠিক এমন সময় নীচে তপনের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। সে স্বর শুনিয়া শ্যামলী যেন চকিত হইয়া উঠিল। বৌদি ধীরে ধীরে উঠিয়া দরজার গোড়ায় দাঁড়াইল।

—এস, ঠাকুরপো।

এ যেন অন্য লোকের কণ্ঠস্বর! রহস্যপ্রিয়া কলহাস্যময়ী বৌদিদির নয়।

—তুমি একটু ওঘরে বসবে ঠাকুরপো? আমি এক্ষুনি আসছি।

তপন দেখিল, ঘরের মধ্যে শোফায় শ্যামলী নতমুখে বসিয়া আছে। এই কয়দিনেই তাহার ক্ষীণ দেহলতা ক্ষীণতর হইয়াছে। তপনের মাথায় যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল। শ্যামলীকে যে তাহার অনেক কথা বলিবার আছে। অপ্রত্যাশিতভাবে সেই সুযোগ পাওয়া গিয়াছে। এ জীবনে হয় তো আর এমন সুযোগ মিলিবে না।

তপন সকাতরে কহিল,—এই ঘরেই একটু বসি না, বৌদি। আমি বেশীক্ষণ বসব না।

দরজার একটি কপাটে ঠেস দিয়া বৌদি যেমন দাঁড়াইয়া ছিল তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল। দৃঢ়কণ্ঠে কহিল,—না, তুমি ও ঘরেই বোস গে।

বৌদির এই আদেশের বিরুদ্ধে আর একটি কথাও কহিতে না পারিয়া তপন নীরবে পাশের ঘরে চলিয়া গেল। বৌদি ফিরিয়া আসিয়া শ্যামলীর পাশে বসিল।

কহিল,—ভালোবাসা কি অতই সোজা ভাব শ্যামলী, যে একটি মনের মতো পুরুষ পেলেই হ'য়ে গেল? ঘর চাই না? বাড়ী চাই না? ছেলে চাই না? তবে ভালোবাসা স্থিতি লাভ করবে কোথায়? তুমি কি ভেবেছ ঠাকুরপোকে ভুলতে তোমার বেশী দিন লাগবে? মোটেই না। এর পরে যদি কখনও নানা কাজের ফাঁকে মনে পড়ে সেদিন মনে-মনেই লজ্জা পাবে,—ভাববে, কি ছেলেমানুষীই একদিন ক'রেছিলে!

তপনের আগমনের পর হইতেই শ্যামলী আর কথা কহিতেছিল না কিন্তু সে যে বৌদির কথার এক বর্ণও বিশ্বাস করিতেছিল না তাহা তাহার মুখ দেখিয়াই বোঝা যাইতেছিল।

বৌদি জোরে জোরেই কহিতে লাগিল,—তারও পরে যদি কোনো দিন তোমাদের দেখা হয়,—মনে করো কোনো ট্রেণের কামরায়,—তুমি অসঙ্কোচে তাকে সুমুখে বসিয়ে টিফিন কেরিয়ার থেকে খাবার বের ক'রে খাওয়াবে। তুমি দুঃখ করবে, তোমার ছোট ছেলেটার শরীর কিছুতে সারছে না। কত জায়গায় কত চেঞ্জে যাওয়া হ'ল কিছুতে কিচ্ছু না। আর সে দুঃখ করবে তার বাতের অসুখটা কিছুদিন থেকে বড়ই কষ্ট দিচ্ছে। এ ছাড়া আর কোনো কথাই কেউ খুঁজে পাবে না।

বলিয়া বৌদি আপন মনেই খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

কহিল,—তোমাদের আজকের ভালোবাসার মূল্য আছে না কি?

একলা ঘরে বসিয়া তপন অস্থির হইয়া উঠিতেছিল। বিশেষ, বৌদির শেষের কথাগুলা সবই তাহার কাণে যাইতেছিল। বৌদির ঘরের দরজার সম্মুখে আসিয়া অন্য দিকে চাহিয়া বলিল,—আচ্ছা, আজকে আমি উঠলাম। অন্য একদিন আসব। ছোটদাকে বলবেন।

—সে কি? চা খেয়ে যাবে না?

—আজ থাক বৌদি।

হঠাৎ শ্যামলী উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—শোনো। একটু দাঁড়াও।

তপন পা বাড়াইয়াছিল, থমকিয়া দাঁড়াইল।

শ্যামলী শান্তে আস্তে তাহার পায়ের কাছে একটি প্রণাম করিয়া দ্বারের অন্তরালে দেওয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়াইল। এই ব্যাপার এতই আকস্মিক যে তপন তাহাকে ভালো করিয়া দেখিবার অবসর পর্য্যন্ত পাইল না। বাহিরে দাঁড়াইয়া শুধু অনুভব করিল, অবরুদ্ধ কান্নায় তাহার দেহলতা বুঝি ভাঙিয়া পড়িতেছে।

বিমূঢ়ের মতো ক্ষণকাল নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিয়া অবশেষে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া তপন ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া গেল।

১৮

মেসে ফিরিয়া তপন দেখিল দরজার সুমুখেই একটা হাত-গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। ছেলেরা তাহার উপর নিজের নিজের জিনিষপত্র বোঝাই করিতেছে। রাত্রে আর রান্না হইবে না। ঠাকুর-চাকর নূতন মেসে উনান-পাতা ও ঘর পরিষ্কার করার কাজে ব্যস্ত। কয়েকজন বাবু সেখানে ইতিমধ্যেই চলিয়া গিয়া সেখানকার কাজ তদারক করিতেছে।

তপনকে দেখিয়াই সকলে হৈ-চৈ করিয়া উঠিল।

—এই যে বাবু মশায়, এতক্ষণ ছিলে কোথায়? নতুন মেসে যেতে হবে না?

—এই যে যাই।

জিনিষপত্র বলিতে তপনের বিশেষ কিছুই ছিল না। চৌকিটা উহারা আগে হইতেই চাকরের সাহায্যে নামাইয়া গাড়ীতে বোঝাই করিয়াছে। ঘরের মধ্যে ছিল শুধু একটা বাক্স আর বিছানা। একটা একটা করিয়া নিজেই সেগুলা বহিয়া আনিয়া তপন গাড়ীতে বোঝাই করিল।

গাড়ীটা লোকেরা টানিয়া লইয়া চলিল। বাবুরা গল্প করিতে করিতে পাশে পাশে চলিল।

তখনও যায় নাই কেবল মুখুয্যে ও অবিনাশ।

বাড়ীটা একেবারে খালি। ঘরে লোক নাই, জিনিষপত্র কিছু নাই। শুধু দেওয়ালে কতকগুলি পেরেক এখনও পোঁতা আছে। ওঘরে বন্ধুর পিতৃবিয়োগের সময় একদিকের দেওয়াল ঘেঁসিয়া গোটা দুই ইট বসাইয়া হবিষ্যান্ন রাঁধা হইয়াছিল। দেওয়ালে কালি পড়ার দাগ এখনও আছে।

তেতালায় একটা ঘরে গোটা দুই ইট পড়িয়া আছে। তাহার উপর বাক্সগুলি বসানো থাকিত। লইয়া যায় নাই কেন কে জানে। হয় তো আর দরকার হইবে না।

বাড়ীটা যে এত জরাজীর্ণ হইয়া গিয়াছে তাহা আর কখনও কাহারও চোখে পড়ে নাই। অথচ এই বাড়ীতেই কতকাল তাহারা কাটাইয়া দিল। কি করিয়া কাটাইল ভাবিতেও বিস্ময় লাগে।

মুখুয্যে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন,—মেসটা এতদিনে তাহ'লে ভাঙল! কি বল অবিনাশ?

অবিনাশ জবাব দিল না। বাহিরের খোলা মাঠের দিকে যেমন চাহিয়া ছিল তেমনি নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল।

এই মেসে তাহারা যে কবে আসিয়াছে আর ভালো করিয়া মনেও পড়ে না। তখন তাহারা নিতান্ত ছেলেমানুষ, —সবে চাকুরীতে ঢুকিয়াছে।

—চল অবিনাশ, আর কেন?

—হ্যাঁ চল।

সিঁড়ির মুখেই কে একটা জুতার খালি বাক্স ফেলিয়া গিয়াছে। বাক্সটা একেবারে ভাঙ্গিয়া যায় নাই। মুখুয্যের তামাক-টিকা রাখিবার কাজে লাগিতে পারে।

চলিতে চলিতে মুখুয্যে সেটাকে কুড়াইয়া লইলেন।

শেষ

যুযুৎসু-কৌশল

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এইবার যুযুৎসু কৌশলের Lock অর্থাৎ "বন্ধন" শ্রেণীভুক্ত প্যাঁচগুলির বিষয় বিশেষ ভাবে লিখিব। প্যাঁচগুলি অভ্যাস করিবার সময় কিম্বা কাহারও উপর খাটাইবার সময় একাগ্রমনে ও ক্ষিপ্রকারিতার সহিত করিতে হইবে নচেৎ কোন কাজেই আসিবে না। কাহাকেও প্যাঁচ মারিতে যাইবার সময় নিজের ও অপরের ধরার অবস্থা, পাঁয়তারা ও মওকা (opportunity) অনুযায়ী প্যাঁচ মারিতে হইবে। সকল সময়ই মনে রাখিতে হইবে যে গায়ের জোর বিনা এই প্যাঁচগুলি অপরের উপর খাটান মোটেই সম্ভবপর হইবে না। সেই প্যাঁচগুলি অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে গায়ের জোর যাহাতে বাড়ে তাহার জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি গায়ের জোর না থাকিলে এ শিক্ষা শিক্ষাই থাকিয়া যাইবে, কোনই কাজে আসিবে না। প্যাঁচগুলি একধার দিয়াই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। অধিকাংশ প্যাঁচই ডান ধার ও বাঁ ধার দুই ধার দিয়াই করিতে পারা যায়। তবে হাতের, পায়ের ও শরীরের অন্যান্য কাজগুলি বদলাইয়া করিতে হইবে। যে প্যাঁচগুলি অপরের ঘুষি আটকাইয়া দেখাইয়াছি তাহার মধ্যে কতকগুলি শুধু তাহার হাত ধরিয়া লইয়াও করিতে পারা যাইবে।

২৯নং প্যাঁচের ১ম চিত্র

২৯নং প্যাঁচের ২য় চিত্র

৩০নং প্যাঁচের চিত্র

২৯নং প্যাঁচ

হাত দুইটী যখন নীচে সাধারণ ঝোলা অবস্থায় থাকে তখন যদি কেহ ডান কনুইয়ের একটু উপরে তাহার বাঁ হাত দিয়া ধরে (২৯নং প্যাঁচের ১ম চিত্র) তবে নিজের ডান হাতটী তাহার ধরা হাতের বাঁ দিক দিয়া তুলিয়া কনুইয়ের কাছে মুড়িয়া বাঁ হাত দিয়া নিজের ডান হাতটী ধরিয়া গুলির কাছে তাহার ধরা হাতের কব্জীটী জোরের সহিত চাপিয়া নীচে নামাইতে নামাইতে ডান পা-টী পিছাইয়া দিয়া তাহার কব্জীর কাছে চাড় দিয়া নিজের

৩১নং প্যাঁচের ১ম চিত্র

দিকে টানিলে (২৯নং প্যাঁচের—২য় চিত্র) তাহাকে নিজের আয়ত্তে আনিতে পারা যাইবে।

যদি কেহ বাঁ কনুইয়ের একটু উপরে তাহার ডান হাত দিয়া ধরে তবে হাতের, পায়ের ও অন্যান্য কাজগুলি উল্টাইয়া উপরি উক্ত ভাবে করিলেই তাহাকে নিজের আয়ত্তে আনিতে পারা যাইবে।

৩০নং প্যাঁচ

হাত দুইটী যখন নীচে সাধারণ ঝোলা অবস্থায় থাকে

৩১নং প্যাঁচের ২য় চিত্র

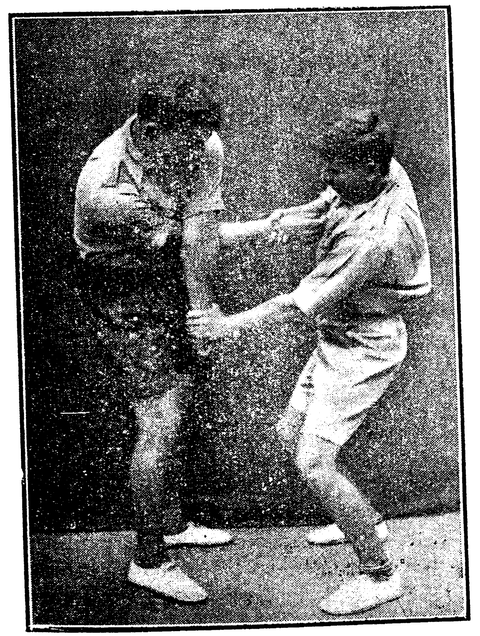

৩৩নং প্যাঁচের ১ম চিত্র

৩২নং প্যাঁচের চিত্র

৩৩নং প্যাঁচের ২য় চিত্র

তখন যদি কেহ ডান কনুইয়ের একটু উপরে তাহার দুই হাত দিয়া ধরে তবে নিজের ডান হাতটী তাহার ধরা হাতের বাঁ দিক দিয়া তুলিয়া কনুইয়ের কাছে মুড়িয়া বাঁ হাত দিয়া নিজের ডান হাতটী ধরিয়া গুলির কাছে তাহার ধরা হাতের কব্জীটী জোরের সহিত চাপিয়া নীচে নামাইতে নামাইতে ডান পাটী পিছাইয়া দিয়া তাহার কব্জীর কাছে চাড় দিয়া নিজের দিকে টানিলে (৩০নং প্যাঁচের চিত্র) তাহাকে নিজের আয়ত্তে আনিতে পারা যাইবে।

৩৩নং প্যাঁচের ৩য় চিত্র

যদি কেহ বাঁ কনুইয়ের একটু উপরে তাহার দুই হাত দিয়া ধরে তবে হাতের, পায়ের ও অন্যান্য কাজগুলি উল্টাইয়া উপরিউক্ত ভাবে করিলেই তাহাকে নিজের আয়ত্তে আনিতে পারা যাইবে।

৩১নং প্যাঁচ

হাত দুইটী যখন নীচে সাধারণ ঝোলা অবস্থায় থাকে তখন যদি কেহ ডান কব্জীটী তাহার ডান হাত দিয়া চাপিয়া ধরে তবে ডান হাতটী তুলিয়া নিজের বাঁ হাতটী তাহার ডান কব্জীর উপর দিয়া লইয়া গিয়া (৩১নং প্যাঁচের ১ম চিত্র) নীচু করিয়া ভিতর দিক হইতে নিজের ডান গুলির কাছে ধরিলে তাহার কব্জীটী দুই হাতের মধ্যে আসিবে। তখন নীচু হইয়া তাহার কব্জীটী চাড় দিতে দিতে নিজের দিকে টানিলে ও ডান পা-টী পিছাইয়া লইলে (৩১নং প্যাঁচের ২য় চিত্র) তাহাকে নিজের আয়ত্তে আনিতে পারা যাইবে।

যদি কেহ বাঁ কব্জীটী তাহার বাঁ হাত দিয়া চাপিয়া

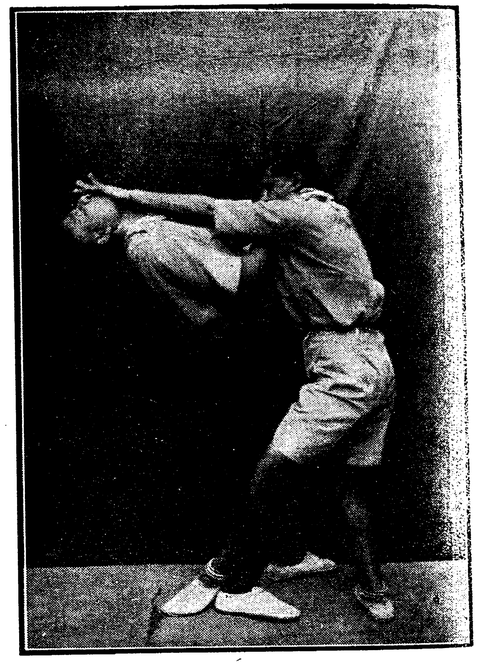

৩৪নং প্যাঁচের চিত্র

ধরে তবে হাতের, পায়ের ও অন্যান্য কাজগুলি উল্টাইয়া করিলেই তাহাকে নিজের আয়ত্তে আনিতে পারা যাইবে।

৩২নং প্যাঁচ

হাত দুইটী যখন নীচে সাধারণ ঝোলা অবস্থায় থাকে তখন ডান হাত দিয়া তাহার ডান কব্জী ও বাঁ হাত নিজের ডান হাতের উপর দিয়া লইয়া গিয়া তাহার বাঁ কব্জী ধরিয়া, তাহার ডান কনুইয়ের উপর তাহার বাঁ কনুইটী চিৎ করিয়া রাখিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার ডান হাতটী কনুই হইতে মুড়িয়া

চাড় দিলে (৩২নং প্যাঁচের চিত্র) তাহাকে নিজের আয়ত্তে আনিতে পারা যাইবে।

৩৩নং প্যাঁচ

যদি কেহ সম্মুখ হইতে তাহার ডান হাত কিম্বা দুই হাত দিয়া গলাটী টিপিয়া ধরে তবে নিজের বাঁ হাতটী তাহার ডান কনুইয়ের নীচে রাখিয়া ও ডান হাতটী তাহার বাঁ হাতের উপর দিয়া লইয়া গিয়া নিজের কব্জীটী বাঁ দিকে ঘুরাইয়া নীচু হইতে তাহার ডান কব্জীটী ধরিয়া (৩৩নং প্যাঁচের চিত্র) তাহার ডান কনুইটী ডান দিকে মোচড়

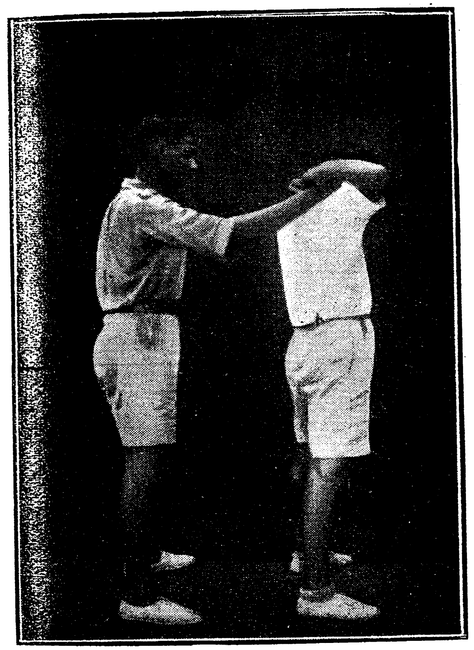

৩৫নং প্যাঁচের ১ম চিত্র

দিয়া নীচে নামাইতে নামাইতে (৩৩নং প্যাঁচের ২য় চিত্র) পুরাভাবে ঘুরাইয়া নিজের বাঁ হাতের গুলির কাছে আটকাইয়া তাহার পিঠে ঝুঁকিয়া তাহার মোড়া, কনুই ও কব্জীতে চাড় দিলে (৩৩নং প্যাঁচের ৩য় চিত্র) তাহাকে নিজের আয়ত্তে আনিতে পারা যাইবে।

৩৪নং প্যাঁচ

যদি কেহ সম্মুখ হইতে দুই হাত দিয়া গলাটী টিপিয়া ধরে ও নিকটে থাকে এবং যদি তাহার ডান পা-টী আগান

৩৫নং প্যাঁচের ২য় চিত্র

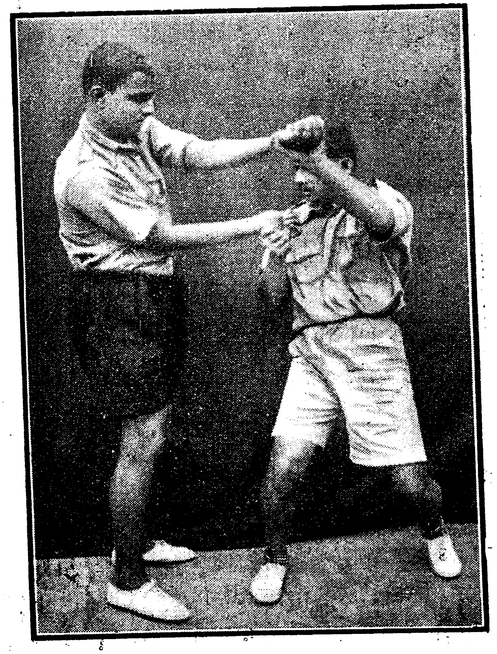

৩৫নং প্যাঁচের ৩য় চিত্র

থাকে তবে বাঁ হাতটী তাহার চিবুকে (কিম্বা বাঁ পুরাবাহুটী তাহার গলার নলীতে) লাগাইয়া এবং ডান হাতটী তাহার কোমরের পিছনে ও বাঁ পাটী তাহার ডান পায়ের ডান দিক দিয়া পিছনে লইয়া গিয়া আটকাইয়া রাখিয়া কোমরটী টানিয়া ও চিবুকটী ঠেলিয়া আট্‌কাইয়া রাখিয়া (৩৪নং প্যাঁচের চিত্র) তাহাকে নিজের আয়ত্তে আনিতে পারা যাইবে।

৩৫নং প্যাঁচ

যদি কেহ পশ্চাৎ হইতে তাহার দুই হাত দিয়া গলাটী টিপিয়া ধরে তবে হাত দুইটী তাহার ধরা হাতের নিকট

৩৫ নং প্যাঁচের—৪র্থ চিত্র

লইয়া গিয়া প্রত্যেক হাতের চারিটী আঙ্গুল দিয়া তাহার বুড়া আঙ্গুলটী ধরিয়া ও নিজের বুড়া আঙ্গুল তাহার বুড়া আঙ্গুল ও অন্য আঙ্গুলের মধ্যস্থলে রাখিয়া (৩৫নং প্যাঁচের ১ম চিত্র) টিপ্পন দিতে দিতে তাহার বুড়া আঙ্গুলটী টানিয়া হাত দুইটী ফাঁক করিয়া (৩৫নং প্যাঁচের ২য় চিত্র) বাঁ পাটী আগাইয়া নিজে ডান দিকে ঘুরিবার সঙ্গে সঙ্গে

৩৬ নং প্যাঁচের চিত্র

৩৭ নং প্যাঁচের চিত্র

(৩১নং প্যাঁচের ৩য় চিত্র) তাহার হাত দুইটী ঘুরাইয়া তাহার ডান কনুইয়ের উপর তাহার বাঁ কনুইটী চিৎ করিয়া রাখিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার ডান হাতটী কনুই হইতে মুড়িয়া দিলে (৩৫নং প্যাঁচের ৪র্থ চিত্র) তাহাকে নিজের আয়ত্তে আনিতে পারা পাইবে।

৩৬নং প্যাঁচ

অপরের পিছনে যাইয়া বাঁ হাত দিয়া তাহার গলাটী জড়াইয়া ও ডান হাত দিয়া তাহার ডান কনুইটী ধরিয়া বাঁ হাঁটুটী তাহার পাছার নীচে রাখিয়া তাহার শরীরটী কোমর

৩৮ নং প্যাঁচের চিত্র

হইতে পিছন দিকে চাড় দিলে (৩৬নং প্যাঁচের চিত্র) তাহাকে নিজের আয়ত্তে আনিতে পারা যাইবে। এই প্যাঁচটী জামা ধরিয়াও করিতে পারা যাইবে।

৩৭নং প্যাঁচ

যদি কেহ সম্মুখ হইতে দুই হাত বগলের নীচু দিয়া লইয়া গিয়া বুকটী জড়াইয়া ধরে ও নিকটে থাকে এবং যদি তাহার ডান পাটী আগান থাকে তবে বাঁ হাতটী তাহার চিবুকে (কিম্বা বাঁ পুরাবাহুটী তাহার গলার নলীতে) লাগাইয়া এবং ডান হাতটী তাহার কোমরের পিছনে ও বাঁ

৩৯ নং প্যাঁচের ১ম চিত্র

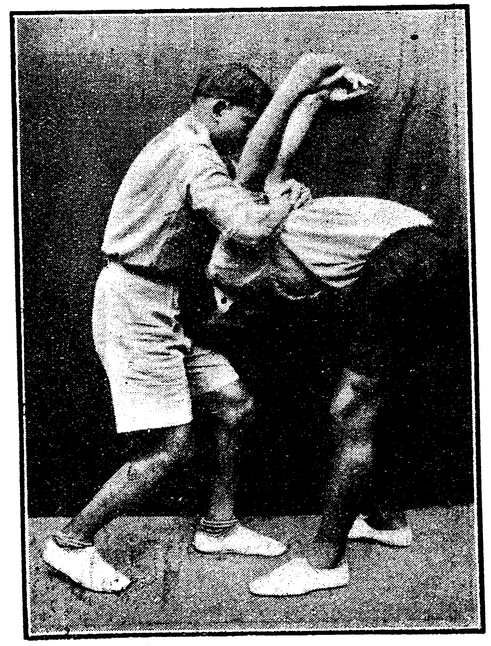

৩৯ নং প্যাঁচের ২য় চিত্র

৪০ নং প্যাঁচের চিত্র

৪১ নং প্যাঁচের ১ম চিত্র

পা-টী তাহার ডান পায়ের ডান দিক দিয়া পিছনে লইয়া গিয়া আটকাইয়া রাখিয়া কোমরটী টানিয়া ও চিবুকটী ঠেলিয়া আটকাইয়া রাখিলে (৩৭নং প্যাঁচের চিত্র) তাহাকে নিজের আয়ত্তে আনিতে পারা যাইবে।

৩৮নং প্যাঁচ

যদি কেহ সম্মুখ হইতে দুই হাত বগলের নীচু দিয়া লইয়া গিয়া কোমরটী জড়াইয়া ধরে ও নিকটে থাকে এবং তাহার গলাটী নিজের ডান দিকে থাকে তবে ডান হাতটী তাহার বাঁ কাঁধের উপর দিয়া লইয়া গিয়া গলাটী থুতনীর

৪১ নং প্যাঁচের ২য় চিত্র

কাছ হইতে জড়াইয়া ধরিয়া বাঁ হাত দিয়া নিজের ডান কব্জীটী ধরিয়া নিজে সোজাভাবে থাকিয়া তাহার ঘাড়টী চাড় দিলে (৩৮নং প্যাঁচের চিত্র) তাহাকে নিজের আয়ত্তে আনিতে পারা যাইবে।

৩৯নং প্যাঁচ

যদি কেহ সম্মুখ হইতে নীচু হইয়া দুই হাত দিয়া কোমরটী জড়াইয়া ধরিতে আসে তৎক্ষণাৎ দুইটী হাত তাহার দুই বগলের নীচু দিয়া চালাইয়া দিয়া ও তাহার মাথাটী নিজের পেটের নীচে রাখিয়া (৩৯নং প্যাঁচের ১ম চিত্র) তাহার ঘাড়টী চাপ দিতে দিতে তাহার হাত দুইটী পিছন দিকে সোজাভাবে তুলিয়া তাহার মোড়াতে চাড় লাগাইয়া (৩৯নং প্যাঁচের ২য় চিত্র) তাহাকে নিজের আয়ত্তে আনিতে পারা যাইবে।

৪০নং প্যাঁচ

যদি কেহ পশ্চাৎ হইতে দুই হাত দিয়া কোমরটী

জড়াইয়া ধরে ও তাহার মাথাটী নিজের ডান ধারে থাকে তবে ডান হাত দিয়া তাহার গলাটী থুতনীর কাছ হইতে জড়াইয়া ধরিয়া বাঁ হাত দিয়া নিজের ডান মুঠোটী ধরিয়া নিজে একটু পিছন দিকে হেলিয়া তাহার ঘাড়টী চাড় দিলে (৪০নং প্যাঁচের চিত্র) তাহাকে নিজের আয়ত্তে আনিতে পারা যাইবে।

৪১নং প্যাঁচ

যদি কেহ হাত দিয়া বুকে ধাক্কা মারে তৎক্ষণাৎ দুই হাত তাহার হাতের উপর রাখিয়া বুকের সহিত চাপিয়া

৪২ নং প্যাঁচের ১ম চিত্র

ধরিয়া (৪১নং প্যাঁচের ১ম চিত্র) আগান পা-টী পিছাইয়া দিতে দিতে নিজের দিকে টানিয়া শরীরটী নীচু হইয়া ঝুঁকিয়া তাহার কব্জীতে চাড় লাগাইয়া (৪১নং প্যাঁচের ২য় চিত্র) তাহাকে নিজের আয়ত্তে আনিতে পারা যাইবে।

৪২নং প্যাঁচ

যদি কেহ হাত দিয়া বুকে ধাক্কা মারিতে আসে, বুকে ধাক্কা দিবার পূর্ব্বেই, নিজের হাত দুইটী বাড়াইয়া তাহার হাতের চেটোতে ধাক্কা দিয়া উপরে তুলিতে তুলিতে তাহার

৪২ নং প্যাঁচের ২য় চিত্র

৪৩ নং প্যাঁচের ১ম চিত্র

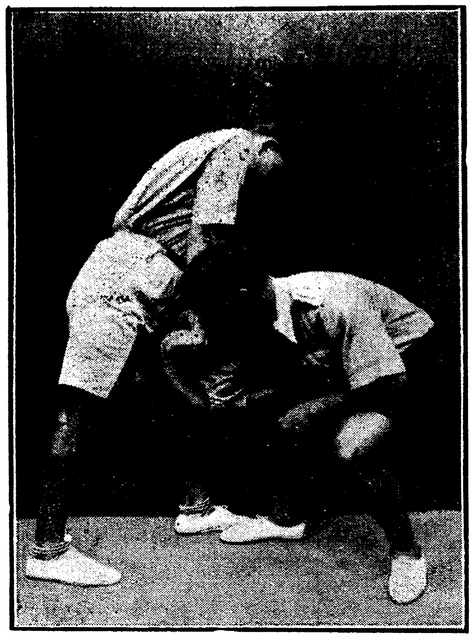

৪৩ নং প্যাঁচের ২য় চিত্র

৪৪ নং প্যাঁচের চিত্র

আঙ্গুল কটী দুই হাত দিয়া দুই ভাগ করিয়া (৪ নং প্যাঁচের ১ম চিত্র) আগান পা-টী পিছাইয়া লইবার সঙ্গে সঙ্গে হাতটী নীচু করিয়া নিজের দিকে টানিলে তাহার কব্জীতে ও আঙ্গুলে চাড় লাগাইয়া (৪২নং প্যাঁচের ২য় চিত্র) তাহাকে নিজের আয়ত্তে আনিতে পারা যাইবে।

৪৩নং প্যাঁচ

যদি কেহ হাত দিয়া বুকে ধাক্কা মারিতে আসে বুকে ধাক্কা দিবার পূর্ব্বেই নিজের হাত দুইটী বাড়াইয়া তাহার

৪৫ নং প্যাঁচের ১ম চিত্র

হাতের চেটোতে ধাক্কা দিয়া উপরে তুলিতে তুলিতে তাহার আঙ্গুল কটী দুই হাত দিয়া দুই ভাগ করিয়া (৪৩নং প্যাঁচের ১ম চিত্র) নামাইয়া পিছান পা-টী আগাইয়া লইবার সঙ্গে সঙ্গে সাম্‌নে ঝুঁকিয়া যাইলে তাহার কব্জীতে ও আঙ্গুলে চাড় লাগাইয়া (৪৩নং প্যাঁচের চিত্র) নিজের আয়ত্তে আনিতে পারা যাইবে।

৪৪নং প্যাঁচ

যদি কেহ তাহার ডান হাত দিয়া বুকে ধাক্কা মারিতে আসে বুকে ধাক্কা দিবার পূর্ব্বেই নিজের হাত দুইটী তাহার

হাতের চেটোতে ধাক্কা দিয়া উপরে তুলিতে তুলিতে তাহার আঙ্গুলটী দুই হাত দিয়া দুই ভাগ করিয়া ডান দিকে মোচড় দিয়া নামাইবার সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাঁটু তাহার কনুইয়ের পিছন দিকে লাগাইয়া তাহার কনুই, কব্জী ও আঙ্গুলে চাড় দিলে (৪৪নং প্যাঁচের চিত্র) তাহাকে নিজের আয়ত্তে আনিতে পারা যাইবে।

৪৫নং প্যাঁচ

যদি কেহ পেটে ঘুসি মারিতে আসে তৎক্ষণাৎ নিজের হাত দুইটী পেটের কাছে তুলিয়া তাহার মুঠোটী দুই হাত

৪৬ নং প্যাঁচের ১ম চিত্র

দিয়া ধরিয়া লইয়া (৪৫নং প্যাঁচের ১ম চিত্র) আগান পা-টী পিছাইয়া লইবার সঙ্গে সঙ্গে সাম্‌নে ঝুঁকিয়া যাইয়া তাহার কব্জীতে চাড় লাগাইয়া (৪৫নং প্যাঁচের ২য় চিত্র) তাহাকে নিজের আয়ত্তে আনিতে পারা যাইবে।

৪৬নং প্যাঁচ

যদি কেহ পেটে ঘুষি মারিতে আসে তৎক্ষণাৎ নিজের হাত দুইটী পেটের কাছে তুলিয়া তাহার মুঠোটী দুই হাত দিয়া ধরিয়া লইয়া (৪৬নং প্যাঁচের—১ম চিত্র) পিছান পা-টী আগাইয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে সাম্‌নে ঝুঁকিয়া যাইয়া

৪৫ নং প্যাঁচের ২য় চিত্র

৪৬ নং প্যাঁচের ২য় চিত্র

তাহার কব্জীতে চাড় লাগাইয়া (৪৬নং প্যাঁচের—২য় চিত্র) তাহাতে নিজের আয়ত্তে আনিতে পারা যাইবে।

পুতুলনাচের ইতিকথা

শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

ছয়

গ্রাম্য জীবনে আবার শশীর বিতৃষ্ণা আসিয়াছে। মাঝখানে কিছুদিন সে যেন অন্যমনস্কের মত এখানে বাস করিয়াছিল। আধখানা মন দিয়া সব সময় সে তাহার কাম্য জীবনের কথা ভাবিত,—শিক্ষা সভ্যতা ও আভিজাত্যের আবেষ্টনীতে উজ্জ্বল কোলাহলমুখর উপভোগ্য জীবন। এখানকার মশকদষ্ট মৃত্তিকালীন জীবন এই সান্ত্বনার জন্য শশীর সহ্য হইয়া আসিয়াছিল যে যখন খুসী গ্রাম ছাড়িয়া যেখানে খুসী গিয়া মনের মত করিয়া জীবনটা সে আরম্ভ করিতে পারে। ইতিমধ্যে পৃথিবীর বিপুলতা অবশ্য কমিয়া যায় নাই, শশীর স্বাধীনতাও হরণ করে নাই কেহ। তবু শশীর মনে হয় চিরকালের জন্য সে গ্রাম্য ডাক্তারের মার্কা মারা হইয়া গিয়াছে,—এই গ্রাম ছাড়িয়া কোথাও যাইবার তাহার শক্তি নাই। নিঃসন্দেহ এ জন্য দায়ী কুসুম। শশীর কল্পনার উৎস সে যেন চিরতরে রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। বিদ্যুতের আলোর মত উজ্জ্বল যে জীবন শশী কল্পনা করিত সে যাযাবরের জীবন নয়,—শশীর নীড়-প্রেম সীমাহীন। কল্পনার তাই একটি কেন্দ্র ছিল শশীর, এক অত্যাশ্চর্য্য অস্তিত্বহীনা মানবী, কিন্তু অবাস্তব নয় : শশীর ভাবুকতা উদ্‌ভ্রান্ত হইতে জানে না। কুসুম যেন তাকে মিথ্যা করিয়া দিয়াছে।

ছোট বোন সিন্ধু আর মতি ছাড়া কারো সঙ্গ শশীর ভাল লাগে না। এত বড় গ্রামে শুধু এই দুটি তার প্রিয়তমা বান্ধবী। নীচে সিন্ধু পুতুল খেলা করে, খাটে বসিয়া শশী অস্বাভাবিক মনোযোগের সঙ্গে সে খেলা চাহিয়া ছাখে।

—খুকী, বড় হয়ে তুই কি করবি?

—পুতুল খেলব।

এই একটিমাত্র জবাবে ক্ষণেকের জন্য শশীর মন যেন একেবারে হাল্কা হইয়া যায়। জানালা দিয়া সে বাহিরের দিকে তাকায়। জানালার নীচে সেদিন কুসুম যে গোলাপের চারাটী মাড়াইয়া দিয়াছিল, শশীর যত্নে আবার সেটি মাথা তুলিয়াছে।

মতি স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করে, আপনার সেই বন্ধুটি পত্র দিয়েছে?

—কে রে মতি, কুমুদ? না দেয় নি—কেন?

—এমনি শুধোচ্ছি।

—এমনি শুধোবি কেন ও-কথা?

—সুন্দোর যাত্রা করে যে!

তা বটে! সুন্দোর যাত্রা করে বলিয়া কুমুদ পত্র দিয়াছে কি না মতির তা জিজ্ঞাসা করা চলে বটে। শশী হাসিয়া বলে, ওর পার্ট তোর খুব ভাল লাগত, না রে মতি?

—আমার একার কেন, সবার লাগত। একটা যাত্রাগান দিন না ছোটবাবু, দেবেন? কত টাকা নেয়?—গম্ভীর মুখে শশীর হাসিকে মতি অগ্রাহ্য করে, বলে, আমার টাকা থাকলে ও-দলটা ভাড়া করে আনতাম ছোটবাবু, আমাদের বাড়ীর সামনে সাইমানা খেঁচে আসোর করে দিতাম, পালা হত সাত দিন।

মতি একটু গম্ভীর হইয়াছে আজকাল। কথা বলিতে বলিতে দুচোখে তাহার একটু ভীরু ঔৎসুক্য দেখা দেয়। কথা শেষ করিয়া কি যেন ভাবে মতি। শশী ভাবে, কে জানে, হয় ত ধীরে ধীরে অবশ্যম্ভাবী আত্মচিন্তাই এবার আসিতেছে মতির। গ্রামের মেয়ে তো, নিশ্চিন্ত থাকিবার বয়সটা ইতিমধ্যে পার হইয়া যাইতে আরম্ভ করিবে তাতে আশ্চর্য্য নাই।

একদিন বাসুদেব বাঁতুয্যে সপরিবারে গ্রামত্যাগের আয়োজন করিলেন। কলিকাতায় মেজছেলে চাকরী করিত, সম্প্রতি সেজছেলেও কোন্ আপিসে চাকুরে হইয়াছে। জমিজমা নাই। গোপালের জন্য কেহ টাকা ধার করিতে আসে না। আসিলেও গোপালের পরামর্শে সুদে আসলে গাপ করিতে চায়। ম্যালেরিয়ায় ভুগিতে আর কেন গ্রামে থাকা? এমন অনেকে গিয়াছে। গ্রাম জুড়িয়া এখানে ওখানে পোড়ো ভিটা খাঁ খাঁ করে। খবর পাইয়া শশী দেখা করিতে গেল। জিনিষপত্র বাঁধাছাঁদা হইতেছে

দেখিয়া হঠাৎ কেমন রাগ হইয়া গেল শশীর। সে নিজে যখন গ্রামের পাঁকে আত্মসমর্পণ করিয়াছে আর কারো যেন গ্রাম ত্যাগ করা অন্যায়।

—আপনার কাছে কতকগুলো টাকা পেতাম বাঁতুয্যেকাকা।

—কলকাতা গিয়ে পাঠিয়ে দেব বাবা। ক'টা টাকা তো,—ছেলেরা মাসকাবারে মাইনে পেলে একটা দিনও দেরী করব না।

শশী মাথা নাড়িল, না, অনেক দিন পড়ে আছে টাকাটা, দিয়েই যান।

শশীর এত টাকার প্রয়োজন কিসের কে জানে! বিশ্রী একটা কলহ বাধিয়া গেল বাসুদেবের সঙ্গে। তার দুই ছেলে রুখিয়া আসিল। কোন পক্ষেরই মান অপমানের পার্থক্য রহিল না। তবু শশী ছাড়িল না,—ছোট নোটবুকটিতে ভিজিট আর ওষুধের জন্য যত টাকার অঙ্কপাত করা ছিল, সমস্ত টাকা আদায় করিয়া ক্ষান্ত হইল। টাকাটা পকেটে পুরিয়া বলিল, দু'দুটো চাকরে ছেলে আপনার,—ডাক্তারের ফি দিতে মরেন কেন বাঁতুয্যেকাকা? কলকাতায় ডাক্তার ডেকে তার সঙ্গে যেন এ রকম করবেন না কখ্খনো, জুতো মেরে যাবে।

ফিরিতে ইচ্ছা হয় না শশীর,—অনেকক্ষণ ধরিয়া আরও তীব্র ভাষায় গালাগালি দিতে ইচ্ছা হয়,—সে একটা কটু আনন্দের নিবিড় স্বাদ পায়। বাসুদেবের বিধবা বৌটি, মৃত ভূতোকে বাঁচানোর জন্য একদিন যে শশীর পথ আটকাইয়াছিল, হঠাৎ তার দিকে চোখ পড়ায় শশী যেন চমকাইয়া গেল। ভূতোর মৃত্যুর তিন মাস পরেও এ-বাড়ীর কাছাকাছি পথ দিয়া যাওয়ার সময় শশী এর বিনানো কান্না শুনিয়াছে। আজও সে কাঁদিতেছিল, নিঃশব্দে। আশ্চর্য্য নয়, যার চিকিৎসায় ভূতো বাঁচে নাই সেই ডাক্তার আসিয়া ভিজিটের টাকার জন্য এমন কাণ্ড করিলে মন যার স্নেহকমল সে কাঁদিবেই। পাংশুমুখে শশী পলাইয়া আসিল।

ভূতোর চিকিৎসার হিসাব সে যে ধরে নাই,—যে টাকা সে আদায় করিয়াছে তার প্রত্যেকটি পয়সা যে এ-বাড়ীর অন্য লোকের অসুখের চিকিৎসা করার দরুণ,—যারা আজও সুস্থ শরীরে বাঁচিয়া আছে,—বৌটি একবারও তাহা ভাবিবে না। ভূতোর জন্য মন কেমন করিলে গাওদিয়ার শশী ডাক্তারকে স্মরণ করিয়া সে শিহরিয়া উঠিবে। হয় ত কোন দিন সহরের প্রতিবেশিনীদের কাছে গ্রামের গল্প বলিবার সময় আজিকার ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিবে, গাঁয়ের ডাক্তারগুলো পর্য্যন্ত এমনি মানুষ দিদি, আমরা গাঁ ছেড়ে এসেছি কি সাধে?

কয়েক দিন পরে শশীর একবার কলিকাতা যাওয়ার প্রয়োজন ছিল,—কয়েকখানা বই ও কতকগুলি ওষুধ কিনিবে। একদিন পরাণ লজ্জিত মুখে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, বলিল, কলকাতা যাবার বায়না নিয়ে মতি কাঁদা-কাটা জুড়েছে ছোটবাবু।

শশী অবাক হইয়া বলিল, কলকাতা যাবে? কার সঙ্গে?

—বলছে আপনার সঙ্গে যাবে।

শশী হাসিয়া বলিল, তুমি বুঝি তাই আমাকে বলতে এসেছ, যদি নিয়ে যাই? তোমার বুদ্ধি নেই পরাণ। নিয়ে আমি যেতে পারি,—গাঁয়ের লোক বলবে কি?

শশী একা মতিকে লইয়া কলিকাতা যাইবে পরাণ সে কথা বলিতে আসে নাই। পরাণও সঙ্গে যাইবে বৈ কি। মোক্ষদা বারকয়েক গঙ্গাস্নানের ইঙ্গিত করিয়াছে,—এ সুযোগ বুড়ী ছাড়িবে মনে হয় না। সুতরাং কুসুমও যাইবে সন্দেহ নাই। মতির জন্য এবার ফতুর হইতে হইবে পরাণকে,—এতগুলি মানুষের কলিকাতা যাওয়া-আসার খরচ কি সহজ! কিন্তু না গেলেও চলিবে না,—মতি দুদিন নাওয়া খাওয়া ছাড়িয়া কাঁদিয়াছে।

হঠাৎ ওর এত কলকাতা যাওয়ার সখ হল কেন?—শশী জিজ্ঞাসা করিল।

পরাণ তা জানে না। মাথা নাড়িয়া জ্ঞানীর মত সে শুধু বলিল, জানেন ছোটবাবু, নাই দিয়ে দিয়ে কর্ত্তা ওর মাথাটা খেয়ে গেছে।

—নাই তুমিও ওকে কম দাও না পরাণ!

শশী মতিকে বুঝানোর চেষ্টা করিল। বলিল, কি চাস তুই আমাকে বল, কিনে আনব তোর জন্যে—কি করবি মিছিমিছি কলকাতা গিয়ে? মতি ভীরু ও শান্ত, শশীর কথা সে চিরকাল মানিয়া আসিয়াছে,—আজ কিন্তু সে কোন কথা কাণে তুলিল না।

শেষে শশী রাগিয়া বলিল, চল তবে চল। তোকে কলকাতায় ফেলে রেখে আমরা চলে আসব। তখন মজা টের পাবি।

নৌকা, ষ্টিমার, রেল, তবে কলিকাতা। সমস্ত পথ মতি অস্থির, উত্তেজিত হইয়া রহিল। কুসুম চারিদিক দেখিতে দেখিতে বেড়ানোর আনন্দ উপভোগ করিতে করিতে চলিল। কিন্তু মতির যেন নদীর বুকে, রেলপথের দুধারে দেখিবার কিছু মিলিল না। অতটুকু মেয়ে, জীবনে এই প্রথম দীর্ঘ পথ ভ্রমণে চলিয়াছে, চোখের পলকে পথ ফুরাইয়া গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইয়া যাওয়ার ভয়টাই ছিল তার পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু তার একান্ত আগ্রহ দেখা গেল তাড়াতাড়ি কলিকাতায় উপস্থিত হইতে। হয়ত সে ভাবিয়াছিল কলিকাতায় পা দেওয়া মাত্র কুমুদের দেখা মিলিবে,—তাকে সহরে অভ্যর্থনা করিয়া লইবে রাজপুত্র প্রবীর!

একবার সে জিজ্ঞাসা করিল, কলকাতায় আমরা কোথায় থাকব ছোটবাবু? আপনার সেই বন্ধুর বাড়ীতে?

শশী বলিল, খুব তাহলে যাত্রা শুনতে পারিস, না? যাত্রা শুনবার লোভে তুই কলকাতায় চলেছিস না কি মতি? থিয়েটার দেখিস একদিন, দেখাবো তোদের—যাত্রার চেয়ে সে ঢের ভাল।

পাঁচ দিন তাহারা কলিকাতায় রহিল। যা কিছু দেখার ছিল সহরে দেখিয়া বেড়াইল। স্নান করিল গঙ্গায়, পূজা দিল কালীঘাটে, ট্রামে চাপিয়া অকারণে ঘোরা-ফেরা করিল। কিন্তু কোথায় মতির রাজপুত্র প্রবীর? শশীর সে বন্ধু, এই সহরের কোথাও সে বাস করে। কিন্তু শশী একবার না করিল তার নাম, না আনিল তাকে ডাকিয়া। সহরের অফুরন্ত বিস্ময় অভিভূত করিয়া না রাখিলে মতির দুচোখ ভরিয়া হয়ত জল আসিত। শিয়ালদর কাছে একটা হোটেলে তাহারা দুখানা ঘর ভাড়া করিয়াছে,—একটা ঘর শশীর একার। একদিন শশী তার এক ডাক্তার বন্ধুর বাড়ী রাত কাটাইয়া আসিল। রাত্রে উঁকি দিয়া তার ঘর খালি দেখিয়া মতি ভাবিল শশী তবে নিশ্চয় কুমুদের কাছে গিয়াছে,—সকালে দুজনে একসঙ্গে আসিবে। কুমুদ ছাড়া জগতে শশীর আর কোন বন্ধু আছে বলিয়া মতি জানে না। পরদিন বেলা দশটা বাজিয়া গেল, সকাল হইতে মতি সিঁড়ি দিয়া হোটেলের সমস্ত লোকের ওঠানামা চাহিয়া দেখিল, কিন্তু শশী অথবা কুমুদ কেহই আসিল না। পরাণের সঙ্গে সেদিন তাদের যাদুঘরে যাওয়ার কথা,—সকাল সকাল খাওয়া দাওয়া সারিয়া বাহির হওয়া দরকার,—মতি নড়িতে চায় না।

—ছোটবাবু আসুক?

—ছোটবাবু এবেলা আসবে না মতি, এলে এতক্ষণ আসত।

—ওবেলা যাদুঘর যাব দাদা, এঁ্যা? এবেলা বড্ড শীত।

পরাণের চাদরটা গায়ে জড়াইয়া মতি ঠির ঠির করিয়া কাঁপে—

কুসুম বলে, মর তুই আহ্লাদী মেয়ে! ছোটবাবু আজ মটরগাড়ী চাপাবে না লো, পিত্যেশ করে থেকে করবি কি? দেরী হল বলে মটর এল সেদিন, মটরে ঢের পয়সা লাগে। নাইবি তো নেয়ে ফ্যাল মতি, নয় ত ভাত দিয়েছি খাবি আয়।

যাইতে হইল মতিকে। জন্তু জানোয়ার দেখিয়া সন্ধ্যার সময় হোটেলে ফিরিয়া সে দেখিল, ঘরে বসিয়া শশী চা খাইতেছে—একা। কুমুদ নিশ্চয় আসিয়াছিল, বসিয়া বসিয়া বিরক্ত হইয়া চলিয়া গিয়াছে।

মতি সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, কখন এলেন ছোটবাবু?

—এই ত এলাম খানিক আগে। কোথা গিয়েছিলি, —যাদুঘর? কাল কিন্তু শেষ দিন মতি, পরশু আমরা ফিরে যাব।

মতির তাতে আপত্তি নাই। আর কলিকাতায় থাকিয়া কি হইবে?

পরদিন সন্ধ্যার সময় শশী বিন্দুর খবর আনিতে গেল। নন্দ থাকিলে রাগ করিবে, হয়ত অপমানও করিবে। করুক। সে জন্য বোনটা বাঁচিয়া আছে কি না এটুকু না জানিয়া বাড়ী ফেরা যায় না। গোপালের খেয়ালে জীবনে যারা দুঃখ পাইয়াছে তাদের জন্য শশীর মনে একটা অতিরিক্ত মমতা আছে। গোপালের কীর্ত্তিতে নিজেকেও সে কেমন অপরাধী মনে করে। মনে হয়, তারও যেন দায়িত্ব ছিল।

পাড়াটা ভাল নয়। যে পথের শেষাশেষি বিন্দুর বাড়ী—সন্ধ্যার পর মানুষকে সে পথে হাঁটিতে দেখিলে চেনা লোক নিন্দা রটায়। তবে বিন্দুর বাড়াটা একটু তফাতে, —ভদ্র পাড়ার গা ঘেঁষিয়া। বাড়ীর পুব দিকে খানিকটা

জমি খালি পড়িয়া আছে। ইঁট সুরকির তলে সমাধি পাওয়া বিন্দু বোধ হয় ওই দিকে চাহিয়া মাঝে মাঝে অবরুদ্ধ নিশ্বাস ত্যাগ করে।

নন্দ বাড়ী ছিল না। বিন্দুকে শশী প্রায় আড়াই বছর পরে দেখিল। প্রায় তেমনি আছে বিন্দু। বিন্দুর ঘরের চেহারাও বিশেষ বদলায় নাই।

—কেমন আছিস বিন্দু?

—ভাল আছি দাদা, কবে এলে? সবাই ভাল আছে?

শশী হাসিয়া বলিল, বলব কেন? চিঠি লিখে খবর নিতে পারিস নে?

বিন্দু বলিল, চিঠি লিখতে বড় আলসেমি লাগে দাদা।

শশী জানে এটা ফাঁকির কথা। নন্দ চিঠি লিখিতে দেয় না। শশীকে খাবার দিয়া বিন্দু নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। গাওদিয়া গ্রামটি সম্বন্ধে আজও বিন্দুর কৌতূহল আছে। কে বাঁচিয়া আছে, কে স্বর্গে গিয়াছে, চেনা ছেলেমেয়েদের মধ্যে কার কার বিবাহ হইয়াছে, কার কটি ছেলেমেয়ে—শশীর মুখে এ-সব খবর শুনিতে শুনিতে বিন্দুর চোখ ছলছল করিতে লাগিল।

শশী বলিল, এর মধ্যে তোর খোকা খুকী কিছু হয় নি বিন্দু?

বিন্দু ঘাড় নাড়িল। কিন্তু মুখে বলিল উল্টা কথা।

—মরে গেল যে?

—মরে গেল? কবে মরে গেল?

—আর বছর।

শেষবার দেখিতে আসিয়া শশীর মনে হইয়াছিল বিন্দুর বোধ হয় ছেলে হইবে। সে ছেলে হইয়া তবে মরিয়া গিয়াছে? বিন্দু দেওয়ালের গায়ে রাধাকৃষ্ণের ছবিটার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। হঠাৎ শশীর মনে হইল শরীরটা বিন্দুর ঠিক আছে; কিন্তু মুখটা তাহার কেমন এক অদ্ভুত রকমের রোগা হইয়া গিয়াছে। মুখের চামড়ার নীচেই যেন শুষ্কতা,—ত্বকের লাবণ্য শুষিয়া লইতেছে।

—তোর অসুখ বিসুখ করেছে না কি বিন্দু?

—কিসের অসুখ? বেশ আছি আমি।

বাহিরে গিয়া বিন্দু কোথা হইতে একপাক ঘুরিয়া আসিল।

—ভালই আছিস বিন্দু, এঁ্যা?

—আছি বৈ কি!

সমস্ত ব্যাপারটা এমন বিস্ময়কর লাগে! এমন রহস্যময় মনে হয় বিন্দুর মুখের গোপন-করা বুড়োটে ভাব, বিন্দুর নিরুৎসাহ নিরুত্তেজ কথা। বিন্দু তার বোন, পাতানো সম্পর্ক নয়। ছুরি দিয়া আঙুল কাটিয়া দিলে দুজনের যে রক্ত বাহির হইবে তাহা এক, কোন পার্থক্য নাই। অথচ বিন্দুকে সে এক-রকম চেনে না, বোঝে না।

শশী মমতার সঙ্গে বলিল, অত দূরে বসলি যে? এদিকে আয়, এখানে বোস।

বিন্দু উদ্ধত ভাবে বলিল, কেন?

শশী বলিল, আয়, সরে আয়, কটা কথা শুধোই তোকে।

ইতস্ততঃ করিয়া বিন্দু কাছে আসিল। তার দুচোখ দিয়া জল পড়িতেছে।

—কাঁদিস কেন?

এ প্রশ্নে বিন্দু একেবারে ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

—কোন দিন তুমি আমাকে কাছে ডেকেছ! কেউ ডেকেছে!

শশী অবাক হইয়া যায়। কিছু বলিতে পারে না। এ বাড়ীতে আসিয়া পরের মত আধ ঘণ্টা বসিয়া সে চিরদিন বিদায় লইয়াছে, তা সত্য। কিন্তু কি করিতে পারিত শশী? কদাচিৎ অতটুকু সময়ের জন্য সে যে আসিত, তাতেই নন্দ পাছে রাগ করিয়া বিন্দুকে কষ্ট দেয় শশীর সে জন্য ভয় করিত। বিন্দুর মনে তাতে এত ব্যথা লাগিত, সেই নিরুপায় অনাদরে? বিন্দু তো কোন দিন কিছু বলে নাই মুখ ফুটিয়া!

অনেক দিনের অভিমানে বিন্দু অনেকক্ষণ কাঁদিল। সে শান্ত হইলে শশী বলিল, তোর ব্যাপারটা কি খুলে বল ত বিন্দু?

—কিছু না দাদা।

শশী বুঝাইয়া বলিল, আজ না বললে আর কোন দিন বলতে পারবি না বিন্দু—অন্য দিন লজ্জা করবে। নন্দ খারাপ ব্যবহার করে?

—হুঁ। আমাকে ভীষণ শাস্তি দিচ্ছে।

ভীষণ শাস্তি? নন্দ ভীষণ শাস্তি দিতেছে বিন্দুকে?

বিন্দুর এমন বাড়ী, এত কাপড় গয়না, এত বিলাসিতার ব্যবস্থা!

—নন্দ তোকে ভালবাসে না বিন্দু?

—বাসে। স্ত্রীর মত নয়।—রক্ষিতার মত।

অ্যাঁ? কিসের মত?—শশী যেন বুঝিতে পারে। গাওদিয়ার বিন্দুকে গ্রাস করা কলিকাতার অনামী রহস্য শশীর কাছে স্বচ্ছ হইয়া আসে।

বিন্দু বলিল, দেখবে? উনি এলে কোন্ ঘরে বসেন দেখবে দাদা? চলো দেখাই।

শশীর দেখিবার সাধ ছিল না, হাত ধরিয়া বিন্দু টানিয়া লইয়া গেল। ওদিকের বড় একখানা ঘরের তালা খুলিয়া সুইচ্ টিপিয়া বিন্দু আলো জ্বালিল।

কি সে তীব্র আলো! গোটা তিনেক বালব্ ঘিরিয়া কাঁচের ঝাড় ঝলমল করে,—শশীর চোখ যেন ঝলসিয়া গেল। দেওয়ালে আটদশটা অশ্লীল ছবি। মেঝে জুড়িয়া ফরাস পাতা। তাতে কয়েকটা বড় বড় তাকিয়া। হারমোনিয়াম, বাঁয়া তবলা এ-সবও আছে।

বিন্দু বলিল, গান শিখিয়েছেন। উনি তবলা বাজান, আমি গান করি।

শশীর আর কিছু দেখিবার অথবা শুনিবার ইচ্ছা ছিল না। সে মরার মত বলিল, ও-ঘরে চল বিন্দু।

বিন্দু শক্ত করিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, না। আসল জিনিষ দেখে যাও।

ঘরে ছোট একটি আলমারি ছিল। টানিয়া দরজা খুলিয়া বিন্দু বলিল, ছাখো।

শশী না দেখিয়াই অনুমান করিয়াছিল। আলমারির তাকগুলি নানা আকারের নানা লেবেলের বোতলে বোঝাই হইয়া আছে।

নিজেকে শশীর অসুস্থ মনে হইতেছিল। এমন কাণ্ডও ঘটে সংসারে? কি শক্ত মেয়ে বিন্দু! এত কাল এ কথা সে চাপিয়া রাখিয়াছিল? ছেলে হইয়া মরিয়া না গেলে, স্নেহ করিয়া কাছে না ডাকিলে, আজও হয়ত সে কিছু বলিত না।

—তুই খাস?

—না খেলে ছাড়ছে কে দাদা? ছাখো, আমার একটা দাঁত বাঁধানো,—প্রথম দিন সাঁড়াশী দিয়ে দাঁত ফাঁক করে গলায় ঢেলে দিয়েছিল। তার পর থেকে নিজেই খাই।

ও-ঘরে গিয়া শশী বলিল, জোর করে বিয়ে দেবার জন্যে, না?

বিন্দু বলিল, না। আমি হাবভাব দেখিয়ে ভুলিয়েছিলাম বলে।

—কিন্তু তা তো তুই করিসনি? তুই তখন কতটুকু!

—ও তাই মনে করে দাদা।

বিন্দুর শুষ্ক চোখ এতক্ষণ জ্বল জ্বল করিতেছিল, আবার স্তিমিত সজল হইয়া আসিল। চোখ মুছিয়া বলিল, কেন মিথ্যে তোমায় বললাম।

শশী ভাবিতেছিল, বিন্দুর কথায় চমকাইয়া গেল। এমন হতাশ হইয়া গিয়াছে বিন্দু? ভাবিতে ভাবিতে শশীর মুখ কালো আর কঠিন হইয়া ওঠে। অন্য দিকে চাহিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, নন্দ আর কাউকে আনে,—বন্ধুবান্ধব?

বিন্দু বলিল, না না, ছি, ওসব বুদ্ধি নেই। যা শাস্তি দেবার নিজেই দেয়।

তার পর মৃদুস্বরে আবার বলিল, অসুখ বিসুখ হলে খুব ভাবে দাদা, সেবাও করে।

শশী অনেকক্ষণ ভাবিল।

—আমার সঙ্গে চলে যাবি বিন্দু?

বিন্দু উৎসুক হইয়া বলিল, কোথায়? কোথায় যাব তোমার সঙ্গে?

শশী বলিল, কাল আমরা দেশে চলে যাই চল,—যাবি?

বিন্দু ব্যগ্র হইয়া বলিল, যাব। চলো এখুনি বেরিয়ে পড়ি দাদা, হঠাৎ যদি এসে পড়ে?

বিন্দুর যেন এক মিনিটও সবুর সহিবে না। এত কাল এখানে সে কেমন করিয়া ছিল কে জানে! গাড়ীতে শশী তাহাকে এই কথাই জিজ্ঞাসা করিল।

পথের পাশে সাজানো দোকানের দিকে চোখ রাখিয়া বিন্দু বলিল, ভেবেছিলাম ক্ষমা করবে।

এত কাল পরে এ কি প্রত্যাবর্ত্তন বিন্দুর? গহনা কই, কাপড় কই, মোটবহর কই? গ্রামের লোক অবাক মানিল। বিন্দুকে জ্বালাতনও কম করিল না। ব্যাপারটা বুঝিবার জন্য সকলেই উৎসুক। জেরায় জেরায় বাহিরে

পুরুষদের ভিতরে মেয়েদের জীবন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। শশী আর বিন্দু নিজে ছাড়া কেহ কিছু জানিত না কেহ কিছু জানিতেও পারিল না। তাই মুখে মুখে নানা কথা প্রচারিত হইয়া গেল।

সেনদিদিই বিন্দুকে যন্ত্রণা দিল সবচেয়ে বেশী। শশীকে অবাক করিয়া কিছু দিন হইতে সেনদিদি হামেশা এ বাড়ীতে আসিতেছিল। গোপালের সঙ্গে তার যেন একটা সন্ধি হইয়াছে। কুর্ত্তায় ভুঁড়ি ঢাকিয়া গোপাল তামাক টানে, অদূরে পিঁড়ি পাতিয়া বসিয়া সেনদিদি তার সঙ্গে করে আলাপ। একদিন সেনদিদির দাগী মুখ আর কানা চোখ দেখিয়া গোপালেরও যেন একটা রোগ আরাম হইয়া গিয়াছিল। আজকাল সে প্রসন্ন, প্রশান্ত। গ্রাম্য রমণীর আবেগপূর্ণ মমতায় সেনদিদি শশীকে আকর্ষণ করিত বটে, এবং লাবণ্যবতীর স্নেহ স্বভাবতই মানুষ একটু বেশী পছন্দ করে বলিয়া সে মমতা দামীও ছিল শশীর কাছে। কিন্তু এ কথা শশী কখনো বিশ্বাস করে নাই যে পড়ন্ত সূর্য্যের মত শেষ যৌবনের অত্যাশ্চর্য্য রূপের অস্ত্রে ছেলেকে বশ করিয়া গোপালের উপর একটা উপযুক্ত প্রতিশোধ গ্রহণের এতটুকু ইচ্ছাও সেনদিদির ছিল। গোপালের বাঁকা মন বাঁকা মানে খুঁজিত। তাই সেনদিদির বর্ত্তমান শ্রীহীনতায় গোপালের প্রসন্ন ভাব শশী বুঝিতে পারে। বুঝিতে পারে না সেনদিদির আসা যাওয়া। চিরকাল যে শত্রুতা করিয়াছে, ক্ষতি করিয়াছে অপূরণীয়, তার সঙ্গে বসিয়া সেনদিদি যে গল্প করিতে পারে, শশীকে তা যেন অপমান করে। মাঝে মাঝে হাসির কথাও বুঝি বলে গোপাল, কারণ, সেনদিদির কুশ্রী মুখখানা অনিন্দ্য হাসিতে ভরিয়া যায়। শশী জানে, খুব অল্প বয়সে সেনদিদির ভার গোপালের ঘাড়ে পড়িয়াছিল। তার পর কত টাকার বিনিময়ে সেনদিদিকে গোপাল যামিনীর কাছে বিসর্জ্জন দিয়াছিল তাও শশী জানে—দেড়শ টাকা! গোপালের গ্রাম্য রসিকতায় সেই সেনদিদি আজ এমন অকুণ্ঠ হাসি হাসিতে পারে ভাবিলে গ্রামের উপর শশীর বিতৃষ্ণা বাড়িয়া যায়।

বিন্দুকে সেনদিদি একদিন একাই প্রায় তিন ঘণ্টা কোণঠাসা করিয়া রাখিল। বাক্যহারা মেয়েটাকে কত কথাই যে বলিল ঠিকঠিকানা নাই। বিন্দু বেশীর ভাগ কথার জবাব পর্য্যন্ত দিল না। তাতে দমিবার পাত্রী সেনদিদি নয়। নিজে প্রশ্ন করিয়া নিজেই একটা পছন্দসই জবাব আবিষ্কার করিয়া বিন্দুর সম্বন্ধে নিজের কাল্পনিক জ্ঞানকে সে অবাধে আগাইয়া লইয়া গেল। মোট কথাটা দাঁড়াইল এই। নন্দ আর একটা বিবাহ করিয়া বিন্দুকে খেদাইয়া দিয়াছে। নন্দর তাহলে তিনটে বিয়ে হল—না দিদি? কি মানুষ নন্দ, এ্যাঁ? শশী বুঝি খবর পেয়ে আনতে গিয়েছিল? তাই তো বলি, হঠাৎ কেন শশী কলকাতা গেল! আমি কি জানি দিদি তোর এমন অদেষ্ট হয়েছে!

এমনি আবেগপূর্ণ মমতা সেনদিদির! কানা চোখ ভরিয়া অশ্রু টলটল করিতে লাগিল!

কুসুম যেদিন শশীর ঘর দেখিয়া গিয়াছিল তার পর নির্জ্জনে কুসুমের সঙ্গে শশীর আর দেখা হয় নাই। একদিন ভোরবেলা সেই জানালা দিয়া কুসুম তাহাকে ডাকিয়া তুলিল। শশী উঠিয়া ছাখে গোলাপের সেই চারাটিকে আজও কুসুম পায়ের তলে চাপিয়া দাঁড়াইয়াছে। কাঁটা ফুটিবার ভয়ও কি নাই কুসুমের!

—আজও চারাটা মাড়িয়ে দিলে বৌ? কত কষ্টে বাঁচিয়েছি সেবার।

—ইচ্ছে করেই দিয়েছি ছোটবাবু, চারার জন্যে এত মায়া কেন? দরকার আছে, তবু ডাকতে আসতে হবে,—রাগ হয় না মানুষের?

শশী বলিল, কি দরকার বৌ?

কুসুম বলিল, তালপুকুরে আসুন একবার, বলছি।

শশী তালপুকুরে গেল। কনকনে শীতে তালগাছগুলি পর্য্যন্ত যেন অসাড় হইয়া গিয়াছে। পুকুরের অনেকখানি উত্তরে একটা তালগাছ মাটিতে পড়িয়া ছিল, শশীকে কুসুম সেইখানে লইয়া গেল। নিজে তালগাছে বসিয়া বলিল, বসুন ছোটবাবু, অনেক কথা, সময় নেবে বলতে।

শশী কিছু বলিল না। কুসুমের অনেকখানি তফাতে বসিল। কুসুম যেন একটু অবাক হইয়া গেল প্রথমে, তার পর হঠাৎ লজ্জায় মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। বিন্দুর ব্যাপারটা শুনিবার জন্য কুসুম শশীকে এখানে ডাকিয়া আনিয়াছে। কৌতূহলের বশে এতক্ষণ তাহার খেয়ালও হয় নাই যে চুপি চুপি শশীকে এখানে ডাকিয়া আনিলে কতখানি উপযাচিকা অভিসারিকার মত কাজ করা হয়।

তার পর বিন্দুর কথা জিজ্ঞাসা করিয়া কুসুম শশীকেও একটু অবাক করিয়া দিল। খেয়ালী কম নয় কুসুম। বিন্দুর কাহিনী শুনিবার জন্য এত কাণ্ড! ও কথা সে তো যেখানে খুসী বলিতে পারিত কুসুমকে!

—ওর কথা শুনে কি করবে বৌ?

কুসুম সবিস্ময়ে বলিল, আমাকে বলবেন না?

শশীর গোপন কথা কুসুমকে না বলার মত সৃষ্টিছাড়া ঘটনা যেন আর নাই। জীবনে আজ প্রথম শশী কুসুমের প্রকৃতির একটা আশ্চর্য্য দিক আবিষ্কার করিয়া অভিভূত হইয়া গেল। একটি বালিকা আছে কুসুমের মধ্যে, মতির চেয়েও যে সরল, মতির চেয়েও নির্ব্বোধ। সংসারকে দেখিয়া শুনিয়া কুসুমের যে অংশটা বড় হইয়াছে, এই বালিকা কুসুমটি তার আড়ালে বাস করে। সংসারকে যখন সে ভুলিয়া যায়, জীবনের যত নিয়ম, যত দায়িত্ব, যত জটিলতা আছে, কিছুই যখন তাহার নাগাল পায় না, তখন এই বিস্ময়কর দিকটা চোখে পড়ে। শশী বুঝিতে পারিল, এত কাল কুসুমের যে পাগলামী তার চোখে পড়িয়াছে,—ওর শান্ত সহিষ্ণু ও গম্ভীর প্রকৃতির সঙ্গে যা কোন দিন খাপ খাওয়ানো যায় নাই,—সে সব বহু দূর অতীতের ছেলেমানুষ কুসুমের কীর্ত্তি,—কুসুমের এখনকার পরিণত দেহ মনে যার অস্তিত্ব কল্পনা করা কঠিন।

বিন্দুর কথা ধীরে ধীরে শশী সব বলিয়া গেল। বলিতে বলিতে সে অন্যমনস্কও হইয়া গেল মাঝে মাঝে। কি রহস্যময়ী আজ তাহার মনে হইতেছে কুসুমকে! কুসুম যখন সেদিন দুপুরে তার ঘর দেখিতে গিয়াছিল, সেদিন প্রথম শশীর মনে হইয়াছিল, গত কয়েক বছর ধরিয়া কুসুমের যত খাপছাড়া ব্যবহার সে লক্ষ্য করিয়াছে, সব তাহার মন ভুলানোর জন্য বয়স্কা রমণীর প্রণয়-ব্যবহার। বড় দুঃখ হইয়াছিল সেদিন শশীর,—নিজের মনকে সে মহার্ঘ মনে করে,—সে মন যেন বিকাইয়া গিয়াছিল কানাকড়ির দামে। শশী এখন তৃপ্তি বোধ করিল। তাই যদি হইত, কুসুমের সংস্পর্শে সে বছরের পর বছর কাটাইয়া দিয়াছিল,—একদিনও সে কি টের পাইত না কুসুম কি চায়? একটি নারী মন ভুলাইতে চাহিতেছে এটুকু বুঝিতে কি সাত বছর সময় লাগে মানুষের? এই কুসুমের মধ্যে যে কুসুম কিশোর বয়সী, সে শুধু খেলা করিত শশীর সঙ্গে। শশী তো তাকে চিনিত না; তাই ভাবিত, এত বয়সেও পাগলামী গেল না কুসুমের।

তালবন হইতে শশী সেদিন হাল্কা মনে বাড়ী ফিরিল।

কুসুমকে বিন্দুরও ভাল লাগিল। কুসুমের কৌতূহল মিটিয়াছিল। বিন্দুর কলিকাতার জীবন সম্বন্ধে সে কোন কথা তুলিল না। সাধারণ নিয়মে বিন্দু বাপের বাড়ী আসিয়াছে, এতে আশ্চর্য্য হওয়ার কিছুই নাই, এমনি ভাব দেখাইল কুসুম। বিন্দুর কাছে সে অনেক সময় আসিয়া বসে, নানা কথা বলিয়া বিন্দুকে ভুলাইয়া রাখিতে চেষ্টা করে। ও-সব পারে সে। সত্য মিথ্যা জড়াইয়া জমজমাট উপভোগ্য কাহিনী রচনা করিতে কুসুম অদ্বিতীয়া। অপরূপ ভ্রান্তি সৃষ্টি করিবার কৌশলও সে জানে চমৎকার। বলে, সহর থেকে সখ করে গাঁয়ে তো এলে ঠাকুরঝি, মরবে ভুগে ম্যালেরিয়ায়। দুবার কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এলে বাপের বাড়ীকে পেন্নাম করে কর্ত্তার কাছে ছুটবে তখন।

গোপাল রাগারাগি করিল,—শশীর সঙ্গে তার কলহ হইয়া গেল। চেঁচামেচি করিয়া সে বলিতে লাগিল যে এমন কাণ্ড জীবনে সে কখনো ছাখে নাই। স্ত্রীকে মানুষ নিজের খুসী মত অবস্থায় রাখিবে এই তো সংসারের নিয়ম। মারধোর করিলে বরং কথা ছিল। কিছুই তো নন্দ করে নাই! যা সে করিয়াছে বিন্দুর তাতে বরং খুসী হওয়াই উচিত ছিল। স্ত্রীকে ভিন্ন বাড়ীতে রাখিয়া হীরা-জহরত দিয়া চাকর দারোয়ান রাখিয়া কেহ যদি নিজের একটা খাপছাড়া খেয়াল মিটাইতে চায়, স্ত্রীর সেটা ভাগ্যই বলিতে হইবে। স্বামীর সে অধিকার থাকিবে বই কি! মদ খায় নন্দ? সংসারে কোন বড়লোকটা নেশা করে না শুনি? তখন বলিলেই হইত, অত কষ্টে বড়লোক জামাই যোগাড় না করিয়া একটা হা-ঘরের হাতে মেয়েকে সঁপিয়া দিত গোপাল,—টের পাইত মজাটা!

—কেন ওকে তুই নিয়ে এলি শশী! তোর এত কর্ত্তালি করা কেন? ছেলেখেলা নাকি এ-সব, আঁ? যা রেখে আয়গে, —আজকেই চলে যা।

—তা হয় না বাবা। আপনি সব জানেন না,—জানলে বুঝতেন ওখানে বিন্দু থাকতে পারে না।

—এতকাল ছিল কি করে?

সে কথা ভাবিলে শশীও কি কম আশ্চর্য্য হইয়া যায়?

গোপাল মেয়েকে জিজ্ঞাসা করে, গয়নাগাঁটি জিনিষপত্র কি করে এলি?

—আনিনি বাবা।

—কেন, আননি কেন?

—আমার কি ছিল যে আনব? আনলে চোর বলে জেলে দিত।

শুনিয়া গোপাল রাগিয়া আগুন হইয়া ওঠে!—জেলে দিত! গোপালদাসের মেয়েকে অত সহজে কেউ জেলে দিতে পারে না। তোরা সব কটা ছেলেমানুষ, কাঁচা বুদ্ধি তোদের। জীবনে তোরা ঢের কষ্ট পাবি এই বলে রাখলাম।

গোলমাল করার ফল হইল এই, শশীর সঙ্গে গোপালের আবার কথা বন্ধ হইয়া গেল। ছেলের সঙ্গে এ-রকম মনান্তর গোপালের বাৎসল্যের জগতে মন্বন্তরের সমান,—বড় কষ্ট হয়। দিন যায়, কলহ মেটে না। গোপাল উসখুস করে। ছেলে যেন আকাশের দেবতা হইয়া উঠিয়াছে,—নাগাল পাওয়া কঠিন। শেষে গোপাল একদিন মরিয়া হইয়া শশীর ঘরে যায়। শশী মোটা ডাক্তারি বইটা নামাইয়া রাখিলে সেটা সে টানিয়া লয়, পাতা উল্টায়, আর ছেলের এত মোটা বই পড়িবার অমানুষী প্রতিভায় সুস্পষ্ট গর্ব্ব বোধ করে। বলে, যতক্ষণ বাড়ীতে থাকো, বই পড়ে সময় কাটাও—শরীর তোমার খারাপ হয়ে যাচ্ছে শশী। এত পড় কেন, পরীক্ষা তো নেই? আগে তো এ রকম পড়তে না দিনরাত?

—ডাক্তারকে সর্ব্বদা নতুন বিষয় জানতে হয়—শশী বলে।

—যা তুমি জানো শশী, গাঁয়ে ডাক্তারি করার পক্ষে তাই ঢের!

—সহরে গিয়ে যদি বসি কখনো—

কি বিচিত্র চক্র কথোপকথনের! বিন্দুর কথা আলোচনা করিতে আসিয়া কি কথা উঠিয়া পড়িল ছাখো! সহর? সহরে গিয়া ডাক্তারি করার মতলব আছে না কি শশীর? তাই এত পড়াশোনা? গোপাল বিবর্ণ হইয়া যায়। এই গ্রামে একদিন এক কুঁড়ে ঘরে গোপালের জন্ম হইয়াছিল। এইখানে একদিন সে ছিল পরের দুয়ারে অন্নের কাঙাল। আজ সে এখানে দালান দিয়াছে। এক বেলায় তার দাওয়ায় পাত পড়ে ত্রিশখানা। চারিদিকে ছড়ানো টাকা, ছড়ানো জমি জায়গা। ঘরে বাহিরে এখানে তাহার আদর্শ বাঙ্গালী জীবনের বিস্তার। এইখানে মরিতে হইবে তাহাকে। শশী এখানে থাকিবে না, অনুসরণ করিবে না তার পদাঙ্ক? গোপাল ব্যাকুল হইয়া বলে, ও-সব সর্ব্বনেশে কথা মনেও এনো না শশী।

শশী বলে, সময় সময় মনে হয় সহরে বসলে পয়সা বেশী হ'ত—

—ছাই হত! সহরে ঢের বড় বড় ডাক্তার আছে,—তুমি সেখানে পাত্তাও পাবে না শশী। এখানে মন্দ কি হচ্ছে তোমার? তাছাড়া, ডাক্তারিতে পয়সা না এলেও তোমার চলবে শশী। জমিজমা দেখবে, সুদ গুণে নেবে। ডাক্তারিতে কিছু হয় ভাল, না হয় নাই হবে! গাঁয়ে আর ডাক্তার নেই, অচিকিচ্ছেয় মরে গাঁয়ের লোক, সেটাও তো দেখতে হবে?—বড় তুই স্বার্থপর শশী!

গোপাল পালায়। কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিবে, আবার হয়ত পনের দিন কথা বন্ধ থাকিবে ছেলের সঙ্গে। খানিক পরে গোপাল আবার শশীর ঘরে যায়। বলে, চাবিটা ফেলে গেলাম নাকি রে?

শশী বলে, চাবি? ওই যে আপনার পকেটে।

চাবির ভারে কুর্ত্তার পকেটটা ঝুলিয়াই আছে বটে। গোপাল অপ্রতিভ হইয়া যায়। পদে পদে জব্দ করে, কি ছেলে! খানিক সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। তার পর করে কি, হঠাৎ অন্তরঙ্গ ভাবে জিজ্ঞাসা করে, হ্যাঁরে শশী, গাঁয়ে তোর মন টিকছে না কেন! গাঁয়ের ছেলে তুই?

—মন টিঁকবে না কেন?

—তবে যে সহরে যাবার কথা বলছিস?

—ঠিক করিনি কিছু। কথাটা মনে হয় এই মাত্র।

শশীর শান্ত ভাব দেখিয়া নিজের উত্তেজনায় আরেক দফা অপ্রতিভ হয় গোপাল। ছেলে বড় হইলে কি কঠিন তার সঙ্গে মেশা। সে বন্ধু নয়, খাতক নয়, উপরওলা নয়—কি যে সম্পর্ক দাঁড়ায় বয়স্ক ছেলের সঙ্গে মানুষের, ভগবান জানেন।

একদিন নন্দর একখানা পত্র আসিল—বিন্দুর নামে। লিখিয়াছে, সাত দিনের মধ্যে ফিরিয়া গেলে এবারের মত ক্ষমা করিবে। শশী আগুন হইয়া বলিল, ক্ষমা! তাকে কে

ক্ষমা ক'রে ঠিক নেই,—কোন সাহসে ক্ষমার কথা লেখে? তুই যেন ভদ্রতা করে চিঠির জবাব দিয়ে বসিস নে বিন্দু।

—জবাব দেব না?

শশী অবাক হইয়া বলিল, জবাব দেবার ইচ্ছা আছে না কি তোর? সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে এলি, চিঠির জবাব দিবি কি রকম?

বিন্দু বলিল, দেব না দাদা।—দেব কি না জিজ্ঞেস করলাম।

—এও জিজ্ঞেস করতে হয়?

বিন্দু ম্লানভাবে হাসিল, মনটা বড় নরম হয়ে গেছে দাদা—একেবারে সাহস নেই। নিজে নিজে কিছু ঠিক করতে পারি না—নইলে ছাখো না, আগে কি আমি পালিয়ে আসতে পারতাম না আমি?

একখানা চিঠি লিখিয়া নন্দ আর সাড়াশব্দ দিল না। শীতের দিনগুলি তাড়াতাড়ি কাটিয়া যাইতে লাগিল। কুসুমের সঙ্গে শশীর কদাচিৎ দেখা হয়। দেখা করিবার জন্য কোন পক্ষেই যেন তাড়া নাই। তাছাড়া শশী বড় ব্যস্ত। শীতকালে গ্রামে অসুখ-বিসুখ কিছু কম থাকে বটে, সে শুধু অন্য সময়ের তুলনায়। কিছু দিন আগে বাজিতপুরের হাসপাতালের ডাক্তারের সঙ্গে শশী আলাপ করিয়া আসিয়াছিল। কলিকাতায় পড়িবার সময় ডাক্তারটির সঙ্গে মুখচেনা ছিল শশীর। তাকে সে বলিয়া আসিয়াছিল, হাসপাতালে কোন অসাধারণ রোগী আসিলে শশীকে তিনি যেন একটা খবর দেন,—শুধু বই পড়িয়া শেখা চলে না। মাঝে মাঝে শশী বাজিতপুরে যায়। বড় রকমের অপারেশন দেখিবার সুযোগ থাকিলে নিজের রোগীদের কথা ভুলিয়া দু' একদিন সেখানে থাকিয়াও আসে।

ফাল্গুনের গোড়ায় হঠাৎ একদিন কুমুদ আসিয়া হাজির।

—কদিন থাকতে দিবি শশী?

—যদ্দিন থাকবি,—শশী খুসী হয়, সত্যি থাকবি?

—থাকব বলেই এলাম—ভাল লাগলে থাকব।

শশী হাসিল, ভাল লাগার মত কিই বা আছে গাঁয়ে? ডোবা জঙ্গল আর মুখ্যু মানুষ। ভাল না লাগলেও থাকিস কুমুদ কিছুদিন। সঙ্গীর অভাবে বড় চিন্তাশীল হয়ে উঠেছি।

কুমুদ বলিল, সঙ্গীর অভাব? বিয়ে কর না?

শশীর হাসি দেখিয়া কুমুদ গম্ভীর হইয়া বলিল, ঠাট্টা করছি না শশী, সত্যি তোর বিয়ে করা দরকার। শান্ত হিসেবী সাধারণ সংসারী মানুষ তুই। সাধারণ মানুষের জীবন যেমন হয় তোরও তেমনি হওয়া দরকার। অন্য রকম করে বাঁচতে গেলে তুই সুখী হতে পারবি না।

শশী বলিল, তুই তো এ-রকম ছিলি না কুমুদ,—এ-সব কি পরামর্শ দিচ্ছিস?—আমার ঘরে থাকবি না একটা ভিন্ন ঘরের ব্যবস্থা করে দেব তোকে?

কুমুদ বলিল, ভিন্ন ঘর হলে মন্দ হয় না শশী—দু'চার ঘণ্টা একা না থাকতে পারলে কি চলে?

—কবিতা লিখিস, এ্যাঁ?

—না। ঠিক মত বাঁচতেই জানি না, কবিতা লিখব! লিখতে লজ্জা করে।

কুমুদ লজ্জায় কবিতা লেখে না এটা আশ্চর্য্য মনে হয়। জীবনে সে কি চায় আজও কি কুমুদ তাহা বুঝিতে পারে নাই? জীবনকে লইয়া আজও সে পরীক্ষা করিয়া চলিয়াছে? কোন্ সাগরে মুক্তা আহরণ করিবে তারই অন্বেষণে সাত সাগরে ভাসিয়া বেড়াইতেছে? এর চেয়ে বিস্ময়কর কিছু নাই যে শান্ত আর বন্য কোন মানুষই জীবনের রহস্য ভেদ করিয়া সেই চিরন্তন স্থিতির খোঁজ পায় না, যা অপরিবর্ত্তনীয় হইলেও চলে, যেখানে অভিনবত্ব কাম্য নয় মানুষের। শশীর মত জীবনকে কুমুদ আজ মন্থর করিতে চায়; আর শশী প্রার্থনা করে কুমুদের অতীত দিনের উত্তপ্ত উচ্ছল জীবনের আবর্ত্ত। সুখ যে তাতে বিশেষ হইবে না তা জানে শশী। তবু মন কেমন করে।

(ক্রমশঃ)

বেলজিয়াম

শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

হেগ' থেকে আণ্টওয়ার্পের ট্রেণে চেপে বোসলাম। প্রায় চার সাড়ে-চার ঘণ্টার পর আণ্টওয়ার্পে ট্রেণ পৌছল। ষ্টেশনটী চমৎকার, যেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, তেমনি প্রকাণ্ড। ষ্টেশনের সামনের গেটটী চারতলা বাড়ীটী জুড়ে উঁচু ও তেমনি চওড়া। এতবড় বিরাট সৌধ মিলানের নূতন

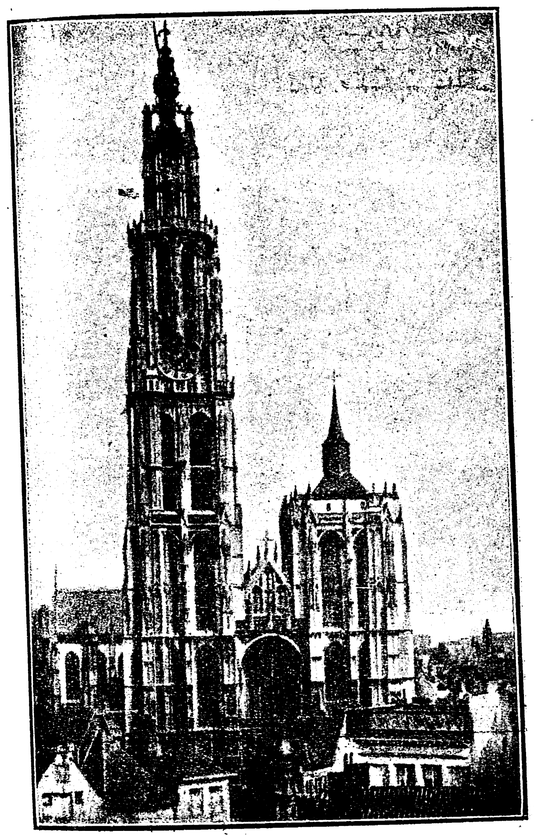

ক্যাথিড্র্যাল—আণ্টওয়ার্প

ষ্টেশনটী ছাড়া আর কোনো রেল ষ্টেশনে দেখেছি বোলে মনে পড়ে না। লম্বা চওড়ায় এর চেয়ে বড় ষ্টেশন হয়ত আমাদের হাওড়াই হবে, লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসও নিশ্চয়ই টেক্কা দেবে, কিন্তু স্থাপত্যশিল্পের ও সৌন্দর্য্যের দিক দিয়ে এরা কেউ আণ্টওয়ার্পের ষ্টেশনের সমকক্ষ হবে কি না সন্দেহ। আণ্টওয়ার্পে বেশী দিন থাকবার ইচ্ছা ছিলনা, কাজেই ষ্টেশনে মালপত্র রেখে শুধু একটী হাত-ব্যাগ নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পোড়লাম হোটেলের খোঁজে।

আণ্টওয়ার্পে তখন বেশ বরফ পোড়ছে; রাস্তাঘাট বরফপাতের জন্য বেশ পিচ্ছিল; তবে আবহাওয়ার উত্তাপ রাশিয়া, ফিনল্যাণ্ড এমন কি উত্তর জার্ম্মাণীর তুলনায় অনেক বেশী, কিন্তু সে শুধু ব্যারোমিটারে। আণ্টওয়ার্পের প্রচণ্ড কনকনে তুষার-শীতল হাওয়া ওভারকোটের হাত ও গলার ফাঁক দিয়ে মাথা গলিয়ে শরীরের ভেতরের যন্ত্রগুলোকে

একটী প্রাচীন রাস্তা—আণ্টওয়ার্প

যেন বিকল কোরবার চেষ্টায় ছিল। উঃ, সে কি শীত—সে হাওয়া রাশিয়ার "০" ডিগ্রীর নীচে ২০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড উত্তাপের শীতলতাকে মনে পড়িয়ে দিচ্ছিল।

আণ্টওয়ার্প যদিও ইয়োরোপের মধ্যে একটী বড় বাণিজ্য-

সেণ্ট পল গির্জ্জার ভেতরের একাংশ—আণ্টওয়ার্প

'রয়্যাল গ্যালারী অব ফাইন আর্টসে'র একটী পোর্ট্রেট—আণ্টওয়ার্প

কেন্দ্র ও বড় বন্দর, তথাপি রাস্তাঘাটে লোকজন বা যান-বাহনের তেমন ভিড় নেই—কোলকাতার মতও নয়। রাস্তাঘাট কিন্তু চমৎকার—বেশ প্রশস্ত ও পরিচ্ছন্ন ; ফুটপাথ-গুলি বেশ চওড়া ও অনেক রাস্তায় প্যারীর মত রাস্তার ধারের বাড়ীগুলি থেকে এক একটী পরচালা ফুটপাথে নেমে এসেছে—গ্রীষ্ম ও বসন্তে বোধ হয় এগুলির নীচে পানশালার ব্যবস্থা হয়। হোটেল লেখা দেখে দু'চার জায়গায় দাম-দর যাচাই কোরে একটী হোটেলে উঠলাম। হোটেলটী ছোট ;

Anspach স্মৃতিস্তম্ভ—ব্রাসেল্‌স

আমষ্টার্ডাম থেকে অনেক সস্তাও ; সকালের খাবার শুদ্ধ ঘরের ভাড়া (Bed & Break-fast) ২৪ বেলজিয়ান ফ্রাঙ্ক (১১০ বেলজিয়ান ফ্রাঙ্ক=এক পাউণ্ড ; বর্ত্তমানে বেলজিয়াম স্বর্ণমান ত্যাগ করায় এই মূল্যের নিশ্চয় তারতম্য ঘোটেছে) অর্থাৎ প্রায় ৪৷৷০ শিলিং ; আর হল্যাণ্ডের হোটেল নিয়েছিল ৩৷৷০ গিলডার যার মূল্য প্রায় ৮ শিলিং। বিদেশীদিগকে প্রায়ই ষ্টেশনে বা কুক

অথবা আমেরিকান এক্সপ্রেসের কাছে পাউণ্ড দিয়ে মুদ্রা বিনিময় কোরতে হয়। এতে সব সময় সঠিক বিনিময়-মূল্য পাওয়া যায় না। আমার হোটেলটীর নীচেই একটী ছোট

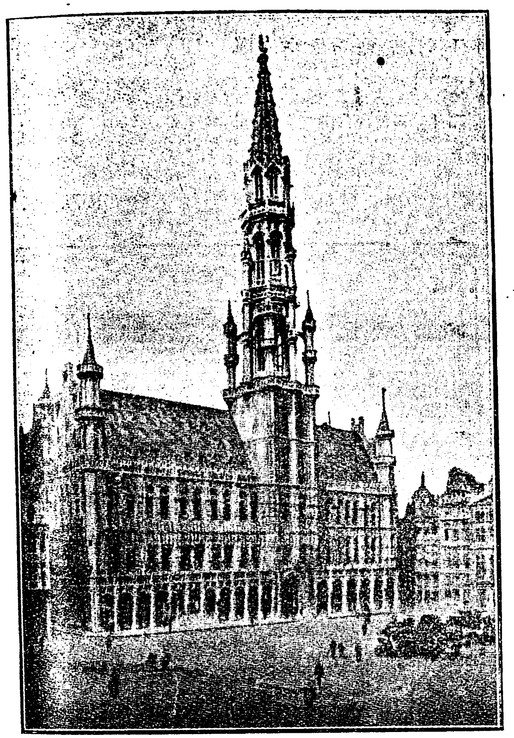

টাউনহল—ব্রাসেল্‌স

রেষ্টুরাণ্ট ছিল ; সেটীতে কিছু খেয়ে নিয়ে সহর দেখতে বেরুলাম।

কিছুদূর চলার পরই একটী পঁচিশতলা উঁচু অট্টালিকা

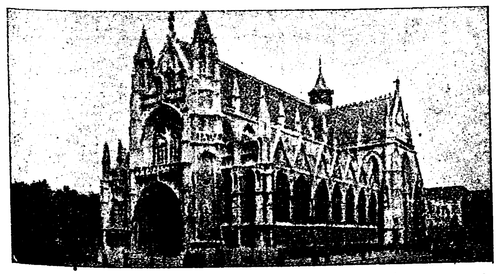

নোত্রে দাঁ গির্জ্জা—ব্রাসেল্‌স

(Sky-scraper) সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ কোরলে। বাড়ীটী যে পরিমাণে উঁচু সে অনুপাতে মোটেই চওড়া নয়। এটীর

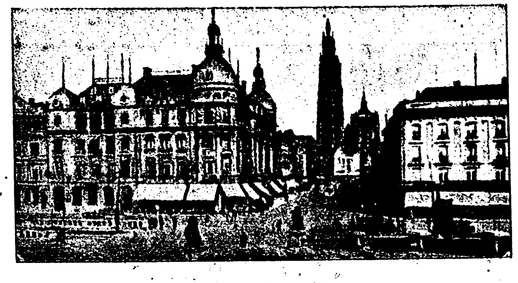

আণ্টওয়ার্পের একটী রাস্তা—পিছনে ক্যাথিড্র্যাল

পাশে একটী ছোট পার্কে বোসে কিছুক্ষণ এদিককার লোকজনের চালচলন, রীতিনীতি দেখবার চেষ্টা কোরলাম,

কিংস হাউস—ব্রাসেল্‌স্

কিন্তু দুর্দ্দান্ত কনকনে হাওয়া শীঘ্রীই আমায় উঠিয়ে দিলে ; আবার এদিকে সেদিকে লক্ষ্যহারা ভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম।

সমস্ত আণ্টওয়ার্প সহরের ওপর মাথা উঁচু কোরে দাঁড়িয়ে আছে এখানকার ক্যাথিড্র্যাল। যতদূর মনে পোড়ছে ২৫তলা বিশাল সৌধটীও এর কাছে মাথা নুইয়ে

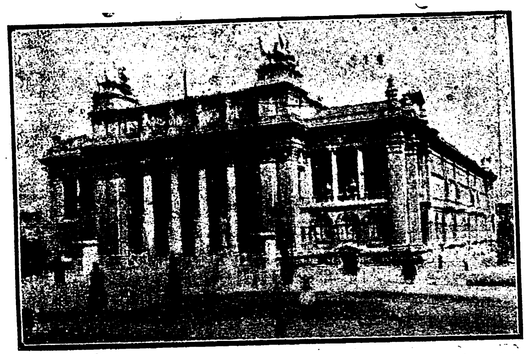

রয়্যাল গ্যালারী অব ফাইন আর্টস—আণ্টওয়ার্প

মধ্যযুগের স্থপতিবিদ্যার কাছে হার মেনেছে। এই গির্জ্জাটী চমৎকার দেখতে; অনাড়ম্বরে নিজের স্বাতন্ত্র্য ও একটী

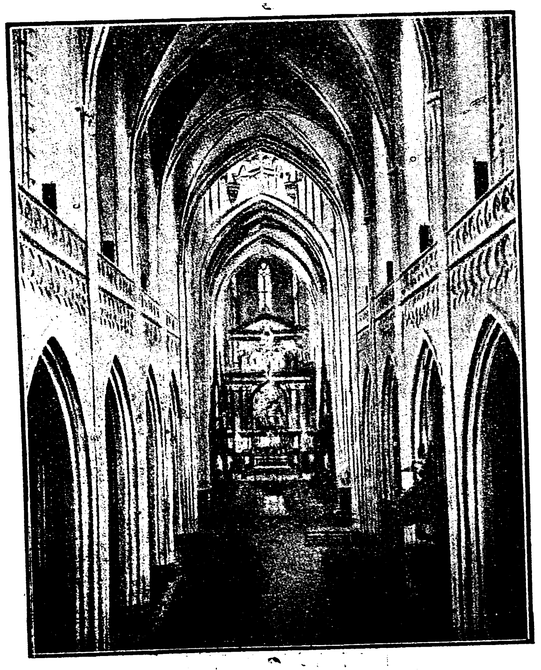

ক্যাথিড্র্যালের অভ্যন্তর—আণ্টওয়ার্প

বিশিষ্ট শ্রী নিয়ে এই ধর্ম্মমন্দিরটী মধ্যযুগের গৌরব ও সুন্দর কলাজ্ঞানের পরিচয়স্তম্ভরূপে দর্শকের মনকে অভিভূত করে।

এর পর নানা রাস্তা দিয়ে লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে ফিরে বেড়ালাম। বেড়ান ও বেড়িয়ে দেখাই ত তখনকার কাজ ছিল; লক্ষ্যহীনভাবে ঘোরাই ছিল লক্ষ্য। এতবড় সহরের বুকে কোথাও কোথাও সেকেলে পাথর-বসান অপ্রশস্ত রাস্তা দেখে বিস্মিত হোলাম; এর ধারের বাড়ীগুলিও সেকেলে। কোলকাতায় এরকম বৈসাদৃশ্য বেশী খুঁজতে হয় না। সব দেশের লোক এবং সব সহরই মূলতঃ প্রায় একই; অন্ততঃ এই আমার ধারণা। সব দেশের লোকই মানুষ,—সাদা, পীত, বা কালো যাই তাদের গায়ের রং হোক

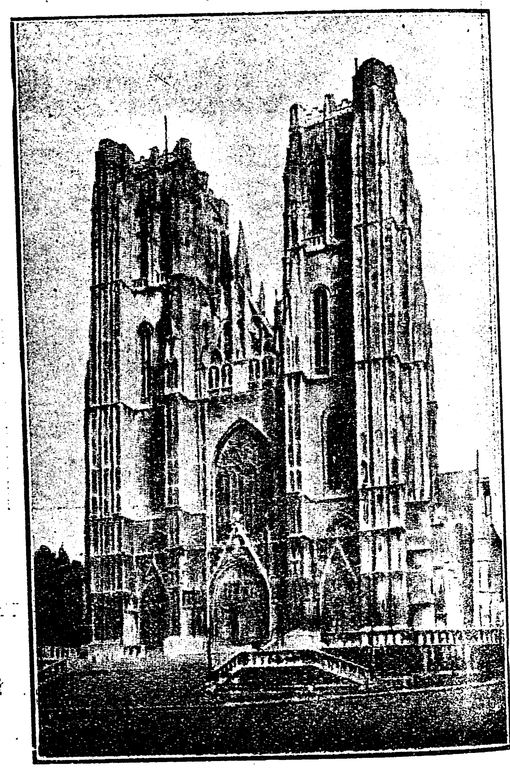

ক্যাথিড্র্যাল—ব্রাসেল্‌স

না কেন।—কাজেই যেখানেই তারা সমাজবদ্ধ হোয়ে বাস করে সেখানেই আমরা দেখতে পাই মানবের স্বভাবজাত প্রেম, ভালবাসা, হিংসা, দ্বেষ, লোভ, ত্যাগ, দয়া ও নিষ্ঠুরতা। অবশ্য এ কথা স্বীকার্য্য যে সংস্কৃতি ও শিক্ষার তারতম্য অনুসারে এর প্রকাশের ভঙ্গীর তারতম্য হয়, কিন্তু তবু মূলতঃ এরা একই। সহর গড়ে মানুষ, কাজেই তাদের

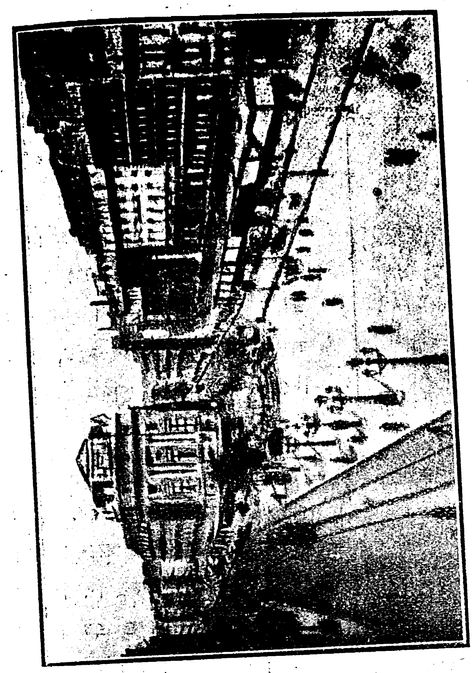

Broukere Place ব্রাসেল্‌স।

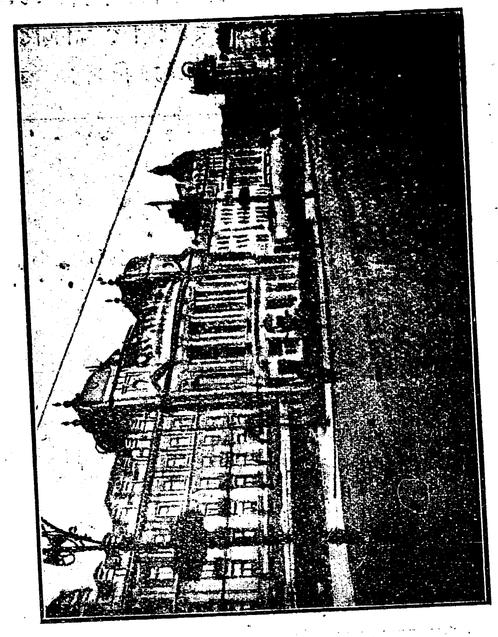

অপেরা—আণ্টওয়ার্প।

আর্টগিল—ব্রাসেল্‌স।

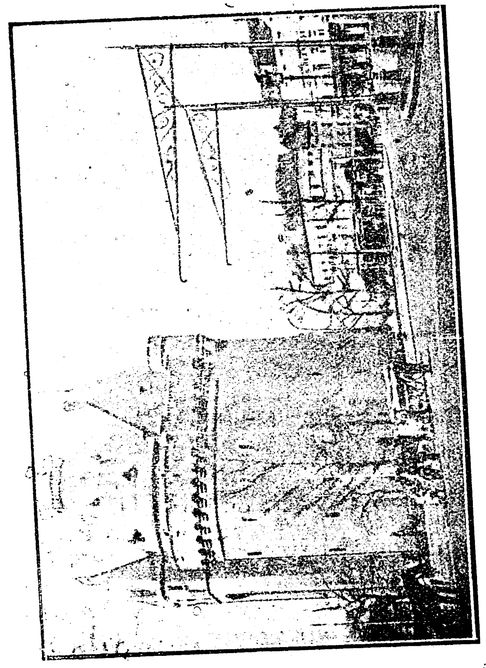

হল গেট—ব্রাসেল্‌স।

মধ্যে যদি মূলগত ঐক্য থাকে তবে বিভিন্ন দেশের সহর-সৃষ্টির ধারাও এক হবে। পার্থক্যের সৃষ্টি কোরবে আবহাওয়া ও সংস্কৃতি। কিন্তু মানবের মূলগত ঐক্যের বিকাশ সর্ব্বত্রই

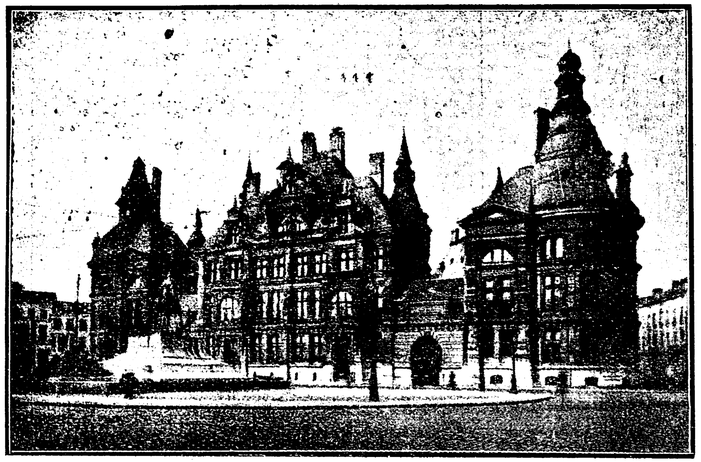

ন্যাসন্যাল ব্যাঙ্ক—আণ্টওয়ার্প।

থাকবে অর্থাৎ ধনী ও দরিদ্রের তফাতে থাকবার যে ইচ্ছা ও ধনী, মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্রদের নিজ নিজ সম্প্রদায়

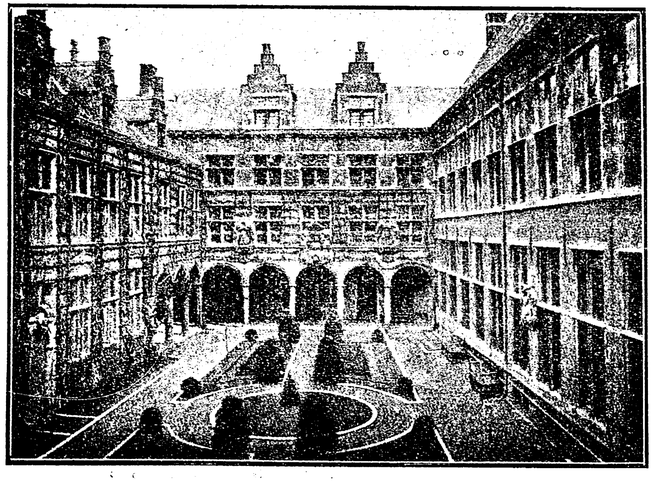

প্ল্যানটিন যাদুঘরের ভেতরের উঠান—আণ্টওয়ার্প।

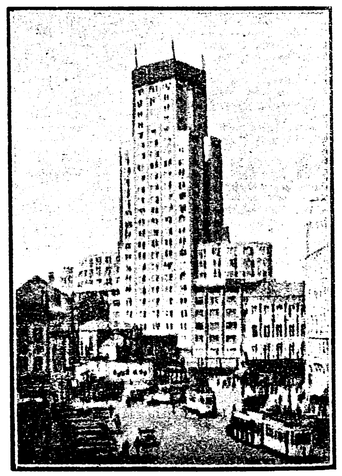

স্কাই স্ক্রেপার—আণ্টওয়ার্প

গোড়ে একত্র বাস কোরবার যে স্বাভাবিক ইচ্ছা, এর বিকাশ পৃথিবীর সমস্ত সহরেই আমরা দেখতে পাই।

একটী বেশ প্রশস্ত জায়গায় এসে পোড়লাম—এর এক দিকে প্রাসাদোপম 'টাউন হল', অন্য দিকে 'গিল্ড হাউস',—দু'টীই সহজে বিদেশীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এখানকার অন্যতম দ্রষ্টব্য 'প্ল্যানটিন যাদুঘর' (Plantin-Museum)। এখানে ছাপাখানার জন্মের সময় থেকে মূল্যবান পুঁথি, ছবি, এনগ্রেভিং, পাণ্ডুলিপি প্রভৃতি সংগৃহীত আছে। দুঃখের বিষয়, এটী আমি দেখি নাই; কারণ কেন জানি না আণ্টওয়ার্প আমাকে আকৃষ্ট কোরতে পারে নাই, এক-দিনের জায়গায় দুদিন থাকতে কিছুতেই মন চাইল না।

ক্যাথিড্র্যাল ছাড়াও এখানকার সেণ্টপল্‌স চার্চ্চ বিদেশীর কাছে স্থপতি-শিল্পের নিদর্শন স্বরূপ দ্রষ্টব্য। এর ভেতরের অলিন্দের খিলানগুলি দর্শকের মনে বিস্ময় ও এর শিল্পীর প্রতি শ্রদ্ধার উদ্রেক করে; এর জানালা দেওয়ালের চিত্রগুলি বিখ্যাত ফ্লেমিস শিল্পীদের (Rubens, Van Dyck প্রভৃতি) সুনিপুণ তুলি-স্পর্শে বিশ্বের শিল্পী সম্প্রদায়ের কাছে এক অমূল্য সম্পদ স্বরূপ।

আণ্টওয়ার্প বন্দরটী খুব বড়, এখানে ২১টী ডক ও

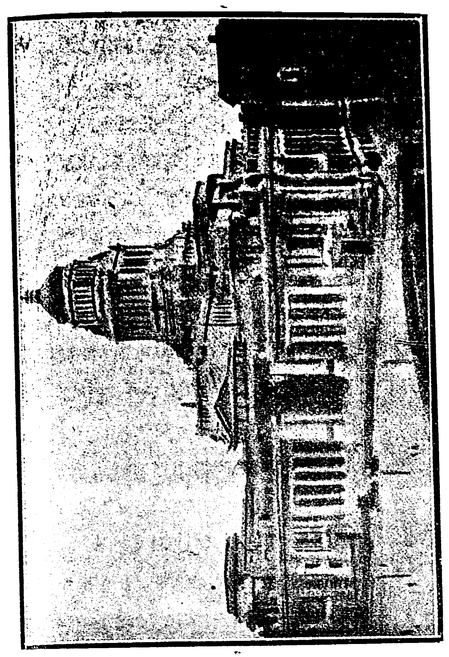

প্রধান বিচারালয়—ব্রাসেল্‌স

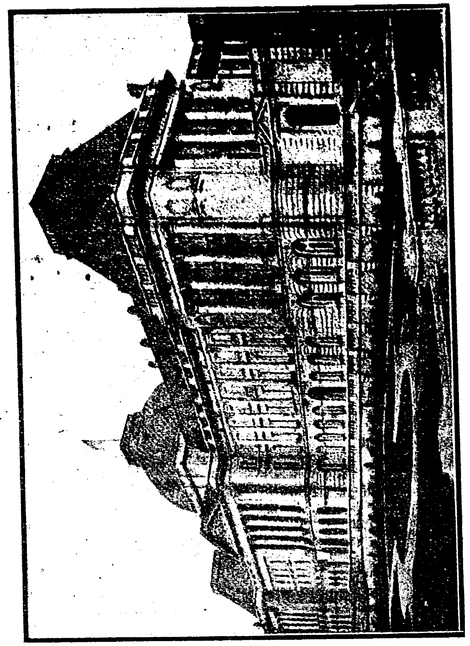

রাজপ্রাসাদ—ব্রাসেল্‌স

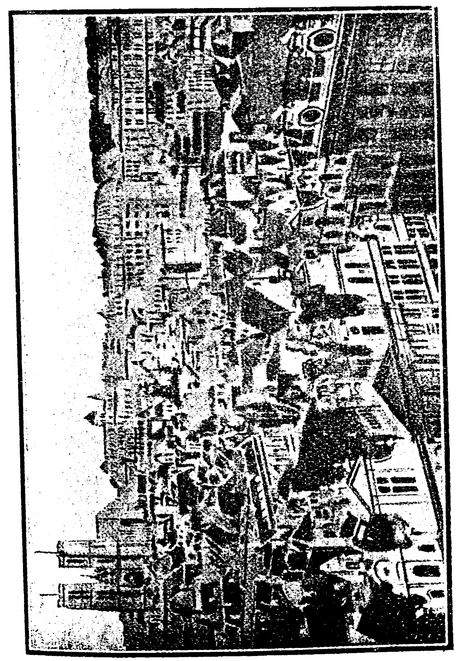

ব্রাসেল্‌স সহরের সাধারণ দৃশ্য

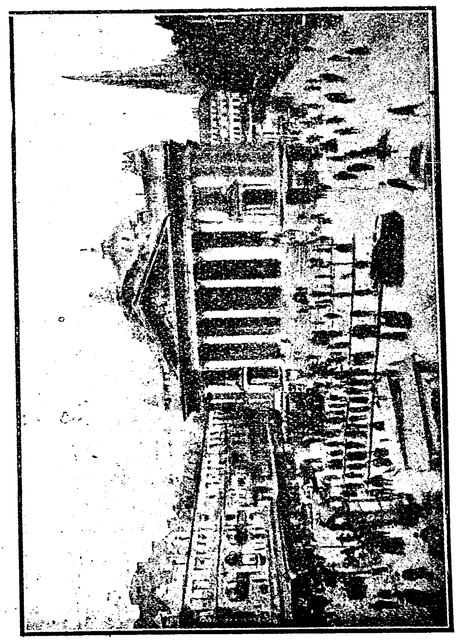

ব্যবসাকেন্দ্র (Exchange)—ব্রাসেল্‌স

১২টী শুকনো করা চলে এমন ডক আছে। বছরে এই বন্দরে গড়ে ২৪ ০০০,০৪৩ টন ওজনের জাহাজ আসে। এখানকার জেটী ২৫ মাইল লম্বা। এটী বেলজিয়ামের দ্বিতীয় সহর, লোকসংখ্যা ৩১০,০০০ জন।

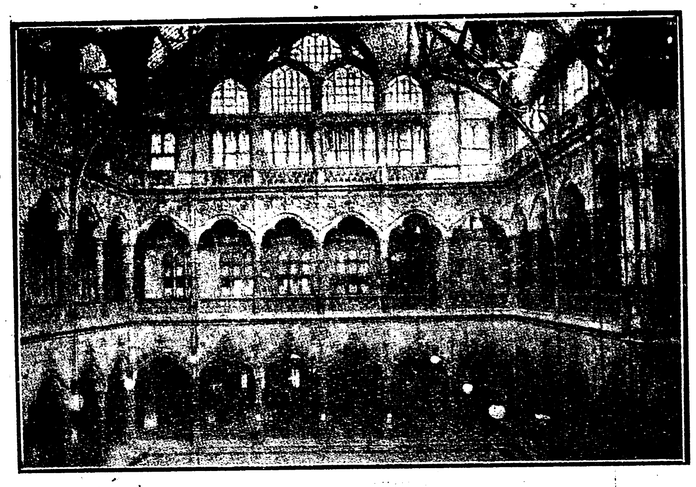

ব্যবসাকেন্দ্রের (Exchange) অভ্যন্তর—আণ্টওয়ার্প

আর একটী সৌধ সহজেই চোখে পড়ে, তার বৈশিষ্ট্যের জন্য। আণ্টওয়ার্পের প্রায় সকল সাধারণ সৌধই রেঁনেসা

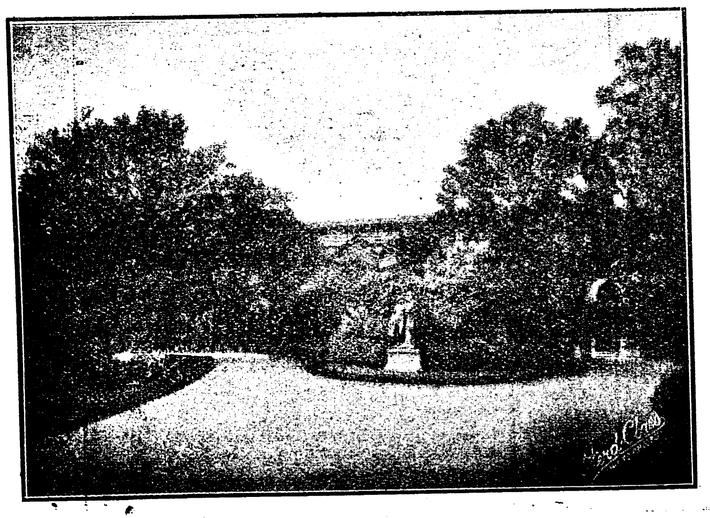

টিয়ার গার্টেন উদ্যানের একাংশ—আণ্টওয়ার্প

বা গথিক পদ্ধতিতে নির্ম্মিত, কিন্তু "রয়্যাল গ্যালারী অব ফাইন আর্টস"এর সৌধটী এগুলি থেকে পৃথক পদ্ধতিতে নির্ম্মিত। এটীতে প্রধানতঃ রুবেন্‌স, ভ্যান ডাইক, জরডিন্‌স, টেনিয়ারস প্রভৃতি ফ্লেমিস চিত্রশিল্পী ও বিদেশী শিল্পীদের হাতের কাজ স্থান পেয়েছে। এই সব সাধারণ সৌধ ছাড়া ন্যাশান্যাল ব্যাঙ্ক, অপেরা প্রভৃতির সৌধগুলি দ্রষ্টব্য হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

বেলা দেড়টায় বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেল্‌স অভিমুখে যাত্রা কোরলাম। আণ্টওয়ার্প আমার কাছে কেন জানি না ভাল লাগে নাই, কেমন যেন গম্ভীর ও একঘেয়ে মনে হোয়েছিল। এর থেকে মাত্র ২৭ মাইল তফাতে ব্রা সে ল্‌ স ঠিক উল্টো। এটী প্যারীর দ্বিতীয় সংস্করণ।

ষ্টেশনে নামতেই একটী হোটেলের লোক এসে ধোরলে; তার হোটেলের নানা সুবিধা দেখালে। তার পোষাক ও তক্‌মার বাহার দেখে মনে হোলো খুব বড় হোটেলের লোকই হবে সে। জিনিষপত্র পূর্ব্বমত ষ্টেশনে রেখে, ষ্টেশনেই কয়েকটা পাউণ্ড ভাঙ্গিয়ে নিলাম। ছোট হাতব্যাগটী নিয়ে তার সঙ্গে যেখানে গিয়ে হাজির হোলাম সেটীকে হোটেলের পরিবর্ত্তে বাসা-বাড়ী বোলেই মনে হোলো। তার সঙ্গে ওপরে গিয়ে দেখি দুটী ঘর; একটী একজনের উপযোগী, অন্যটী দুজনের বা স্বামী স্ত্রীর উপযোগী। অন্য কোনো বা সিন্দা হোটেলটীর কোনো অংশে আছে বোলে মনে হোলো না। বড় অস্বস্তি বোধ কোরলাম, এ কোথায় এনে তুল্ল? যাই হোক ছোটো ঘরটী নিজের জন্য নিলাম।

হোটেলের মালিক এলেন; এক শীর্ণ প্রৌঢ়, কথায় কেমন একরকম জড়তা, মনে হয় কখনও বোধ হয় জিভ বা মুখ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হোয়েছিল। চলে কেমন একরকম শির টেনে। তখনি আমি ঐ বাড়ীটী ছেড়ে চলে যেতাম যদি না ঘরে দেখতাম হোটেলসংক্রান্ত

আইনকানুনের একটী সরকারী ইস্তাহার দেওয়ালে ঝুলছে। বিকালবেলা সহরটী ঘুরতে বেরুলাম।

নগরের আলোক সজ্জা, রেষ্টুরাণ্ট, নাগরিকদের বেশভূষা, অঙ্গভঙ্গী, ফুলের দোকান সবই অনবরত প্যারীর ছবি মনে পড়িয়ে দিতে লাগলো। প্যারীর সে বিরাটত্ব এর মধ্যে নাই, তবু এ যেন তার ক্ষুদ্র সংস্করণ। মেয়েদের অঙ্গরাগে তেমনি উৎকট প্রচেষ্টা, লোকগুলি কথা বলে তেমনি অঙ্গভঙ্গী সহকারে, হাসে তেমনি প্রাণ খুলে, সাধারণের নৈতিক চরিত্রও অপেক্ষাকৃত নীচু। সহরের বুকে ফুলের হাট বোসেছে—বিলাসীর দল সেখান থেকে ফুল কিনছে; অনেক মেয়ে ও পুরুষ রাস্তার ধারে ফুল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, এমন ভাবে 'মসিঁয়ে' বলে যে হঠাৎ 'মশাই' বোলে ভ্রম হয়। অনেক দিন পর প্যারীর মত রাস্তায়ও দোকানপাট ও আলোকসজ্জা দেখলাম। এখানে লোকে ফ্রেঞ্চ ভাষা বলে, আণ্টওয়ার্পের দিকের লোকেরা 'ফ্লেমিস' অর্থাৎ 'ডাচ' ভাষা বলে। দুটী ভাষাই সরকারী ভাষা। বেলজিয়াম অতি ক্ষুদ্র দেশ, তার মধ্যে ফ্লেমিস ও ফ্রেঞ্চ দুটী ভাষা, দুটী সংস্কৃতি ও শিল্প গোড়ে উঠেছে, অথচ তাতে শাসনকার্য্যে কোনো বিঘ্ন ঘটে না। এই সব বাধা আমাদের দেশেই শাসন-সংস্কার ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুতর রূপে দেখা দেয়। ব্রাসেলসের রাস্তা-ঘাট ও পার্কের নামকরণের ধারাও প্যারীর মত—বুলেভার্দ, রুদু ইত্যাদি। ব্রাসেল্‌সের লোকসংখ্যা ৭,৮৫,০০০জন।

বেলজিয়ামের আয়তন মাত্র ১১৭৫২ বর্গমাইল—পশ্চিম ইয়োরোপের মধ্যে এটী সর্ব্বাপেক্ষা ছোট স্বাধীন রাজ্য (লাক্সেমবুর্গকে একটী রাজ্য বলে না—এর রাণীর উপাধি 'ডাচী' (Dutchy)—'কুইন' নয়। বেলজিয়ামের লোকসংখ্যা ৭৫,৮০,০০০ জন। আয়তনের তুলনায় লোকসংখ্যা খুব বেশী বোলতে হবে; প্রতি বর্গ-মাইলে প্রায় ৬৪৫ জন লোকের বসতি—খুব ঘন বসতি নিশ্চয়ই। বেলজিয়ামের বিশেষত্ব এই যে, তার লোকসংখ্যা

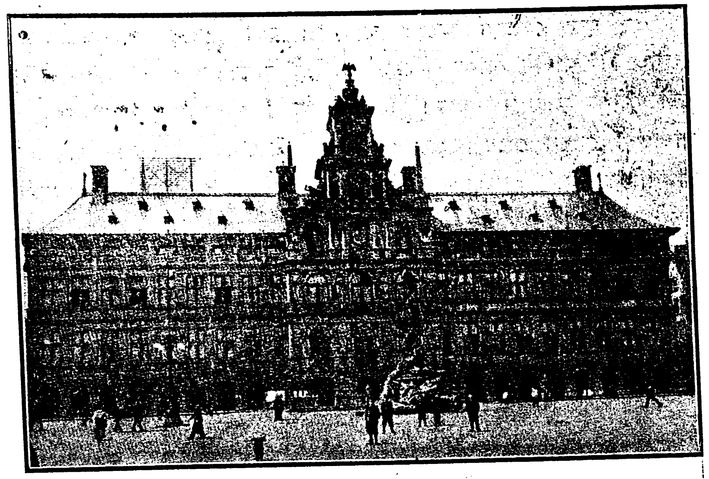

টাউনহল—আণ্টওয়ার্প

শুধু সহরের মধ্যেই বেশী নয়, পল্লীগ্রামেও বসতি খুব ঘন। অন্তর্বাণিজ্যের জন্যে এখানে জলপথ অনেক কাজে লাগে—

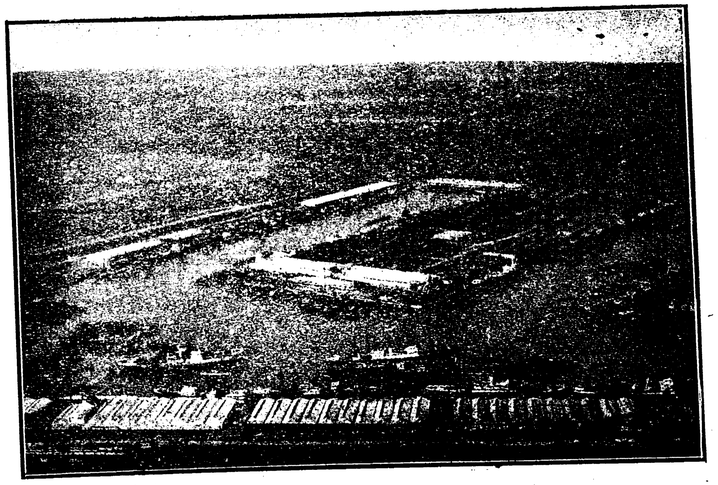

আণ্টওয়ার্প বন্দরের একাংশ

এগুলির মোট দৈর্ঘ্য ১২৫০ মাইল। রেল লাইনের মোট দৈর্ঘ্য ৩০০০ মাইল। অনেক দিন পর বেলজিয়ামে বাঁশী

বাজিয়ে ট্রেণ ছাড়তে দেখলাম। এর পূর্ব্বে যে সব দেশ বেড়িয়েছি সেগুলির কোথাও ট্রেণ ছেড়ে এঞ্জিনে বাঁশী ছায়, কোথাও একদম বাঁশী ছায়ই না, কিন্তু এখানে ট্রেণ ছাড়বার আগে ষ্টেশনে ঘণ্টা ও এঞ্জিনের বাঁশী দেওয়া দেখে ভারতবর্ষকে মনে পোড়ল।

এত ক্ষুদ্র হোয়েও নিজের স্বাধীনতা বজায় রেখে বেলজিয়াম স্বাধীন রাজ্য হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে তার ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য। ইয়োরোপ-ত্রাস জার্ম্মাণীর রাজধানী বের্লিন থেকে লণ্ডন ও প্যারী দুটী শক্তিশালী রাজশক্তির রাজধানীর মধ্য-পথে পড়ে বেলজিয়াম। কাজেই নিজেদের নিরাপত্তার জন্য জার্ম্মাণী, ইংলণ্ড, ফ্রান্স সকলেই

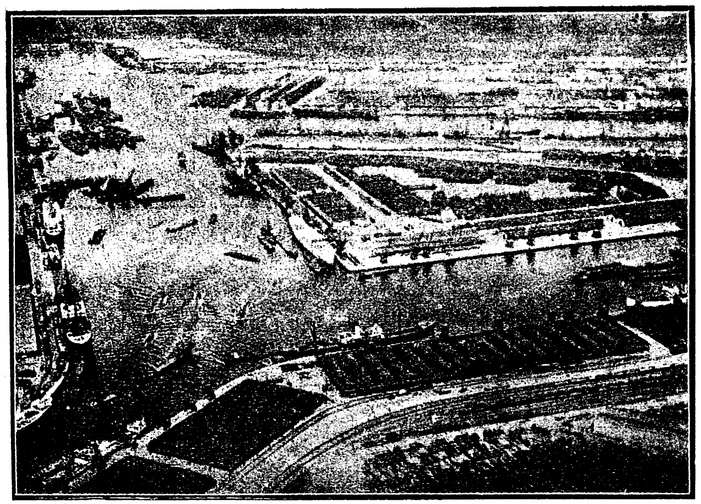

আণ্টওয়ার্প বন্দরের অন্যাংশ

চায় বেলজিয়ামকে স্বাধীন রাজ্য কোরে রাখতে।—এই মর্ম্মে চুক্তিও ছিল, কিন্তু গত মহাযুদ্ধে জার্ম্মাণী সে চুক্তি ভঙ্গ করে এবং তার ফলেই ইংলণ্ডকে নিজের ঘর সামলাতে যোগ দিতে হয়।

বেলজিয়াম পূর্ব্বে স্পেনের অধীন ছিল, পরে অষ্ট্রীয়ার রাজশক্তির অধীন হয়। কিন্তু ১৮১৫ সালে ইয়োরোপের রাজশক্তিদের এক সন্ধি অনুসারে অষ্ট্রীয়া থেকে ভিন্ন হোয়ে হল্যাণ্ডের রাজার অধীন হয়, কিন্তু হল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম দুটী দেশই খুব ক্ষুদ্র ও পাশাপাশি হোলেও ধর্ম্মমত-বিরোধিতার জন্যে বেলজিয়াম ১৮৩০ সালে হল্যাণ্ডের রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ও নিজে স্বতন্ত্র রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। বেলজিয়ামের অধিকাংশ অধিবাসীই রোম্যান ক্যাথলিক। ধর্ম্মোন্মত্ততা ভারতের একচেটে অপরাধ নয়, উনিশ শতাব্দীতেও সুসভ্য ইয়োরোপ ধর্ম্মের নামে যথেষ্ট রক্তপাত কোরেছে। তবু তা তাদিগকে নিজেদের দেশ শাসনের অযোগ্য কোরে তোলে নাই।

এখানে অনেকগুলি ভাল ভাল হোটেল আছে। অধিকাংশই ষ্টেশনের কাছে। পূর্ব্বে এগুলির খবর না জানা থাকায় আমাকে খারাপ হোটেলে উঠতে হোয়েছিল। ষ্টেশন থেকে দু'পাঁচ মিনিটের পথ প্যালেস হোটেল, —splendid হোটেল, সেসিল হোটেল, হোটেল আলবার্ট প্রভৃতি।

সন্ধ্যার একটু পরেই হোটেলে ফিরে এলাম। ভেতরে ঢুকেই শুনলাম হোটেলের মালিকের বিকৃত কণ্ঠস্বরের উত্তেজিত চীৎকার ও সেই সঙ্গে মাঝে মাঝে একটী নারীকণ্ঠের ক্ষীণ প্রতিবাদ। ধীরে নিঃশব্দ-চরণে ওপরে উঠে গেলাম। এখানকার হাওয়া কেমন ভারী বোধ হোতে লাগলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই চীৎকারের সঙ্গে যেন কিছু গুরুভার পতনের আওয়াজ আসতে লাগলো—মেয়েটীর চীৎকার আরো করুণ আরো দ্রুত শোনা যেতে লাগলো। এ দেশে কি এখনো পুরুষ নারীকে প্রহার করে? কে ঐ স্ত্রীলোক? মালিকের সঙ্গে ওর সম্পর্ক কি? কতই বা বয়স? ইত্যাদি নানা প্রশ্নে মন ভরে উঠল। এমন সময় দরজায় টোকা পোড়ল, বোল্লাম "ভিতরে এসো"। দেখি হোটেলের সেই গাইডটী একমুখ হাসি নিয়ে ঘরে ঢুকলো। দিব্যি নাদুসনুদুস বেঁটেখাটো গোবর-গণেশের মত চেহারা। মাথায় মস্ত একটা টাক। কথা বলে একেবারে চোখে-মুখে। কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করার পর সে একমুখ হেসে বোল্লে "এরি মধ্যে ফিরে এলে? সহর দেখা হোয়ে গ্যালো?"

বোল্লাম "হ্যাঁ, আর ভালো লাগলো না। নূতনত্ব কিছু নেই; এ যেন ছোটখাট প্যারী।"

সে আকর্ণ হেসে বোল্লে "হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক ধোরেছ; এ ত প্যারীরই মত। এখানে প্যারীর মত অনেক ভাল ভাল ক্যাবারে, নাচঘর, নাইটক্লাব, অপেরা আছে; যাবে না তুমি সে সব দেখতে?"

মনটা প্রসন্ন ছিল না, তাই তার এ-সব প্রস্তাব ভাল লাগলো না। উত্তর দিলাম "না; ওসব অনেক দেখেছি; আর ভালো লাগে না।"

সে আরো কিছু বোলতে যাচ্ছিল, অকস্মাৎ নীচে থেকে তার মনিবের কর্কশকণ্ঠে ডাক আসতেই সে নেমে গ্যালো। মনে হোলো এ বাড়ীর প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কটা বোধ হয় কিছু উগ্র।

গত মহাযুদ্ধ জার্ম্মাণ আক্রমণে বেলজিয়াম বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হোয়েছিল, জার্ম্মাণ বাহিনীর নিষ্ঠুর অগ্রগতির ফলে বেলজিয়ামের বহু শিল্প-কেন্দ্র ও সৌধ শ্রীহীন বা ধ্বংস হয়। এই অতি অল্প সময়ের মধ্যে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বেলজিয়াম সে ক্ষতি প্রায় পূরণ কোরে এনেছে। তার ব্যবসাকেন্দ্রগুলি আবার সজীব ও সচল হোয়ে উঠেছে। বেলজিয়াম প্রধানতঃ শিল্পবাণিজ্যপ্রধান দেশ,—এর প্রধান শিল্প লেস, কাপড়ের জিনিষপত্র, উলের বস্ত্রাদি, কাচের জিনিষ, কার্পেট ইত্যাদি। বেলজিয়ামের প্রধান খনিজ সম্পদ কয়লা। লোহাও বেলজিয়ামের অনেকাংশে পাওয়া যায়, কিন্তু তাতে সমস্ত প্রয়োজন মেটে না। তাই এখানকার লোহা আসে পাশের লাক্সেমবুর্গ থেকে। লোহা এবং কয়লা পাশাপাশি পাওয়ায় যন্ত্রপাতি তৈরী ও ব্যবসার দিক দিয়ে বেলজিয়ামের খুব সুবিধা হোয়েছে। মধ্যবেলজিয়ামে যথেষ্ট ফসল উৎপন্ন হয়—এখানকার অধিকাংশ চাষাই বৎসরে দুটী কোরে ফসল উৎপাদন করে।—প্রধান কৃষিজ সম্পদ, গম, রাই, জই, ফ্ল্যাক্স (flax), বিট ইত্যাদি।

আমার হোটেলটী ষ্টেসনের কাছেই। এর কাছেই বড় রাস্তা এ্যাডোলফি ম্যাক্স (Adolphe max)। এই রাস্তাটী ব্রাসেল্‌সের দুটী রেলষ্টেশনকে যুক্ত কোরেছে। প্রায় এর ওপরেই প্রধান পোষ্ট আফিস ও 'বোর্স' বা

সেণ্ট পল্‌স গির্জ্জার অভ্যন্তর—আণ্টওয়ার্প

ব্যবসাকেন্দ্র (Exchange)। এইটী কিছু দূর গিয়ে Anspach নাম নিয়েছে। এই রাস্তাটীর এখানকার পূর্ব্বতন মেয়র Jules Anspachএর নামে নামকরণ

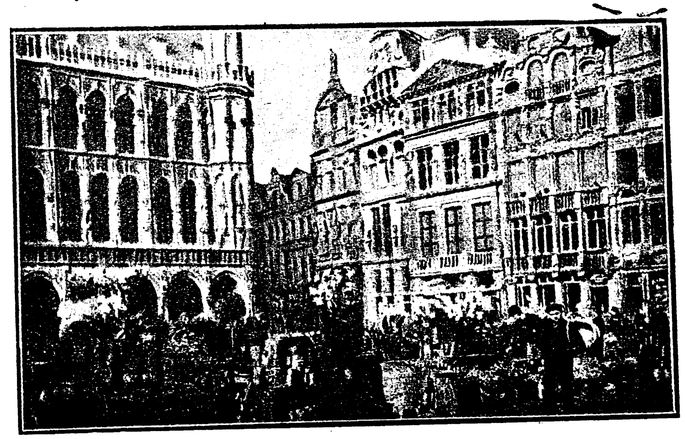

ব্রাসেল্‌সের বুকে ফুলের মেলা

হোয়েছে। এর ওপরে Anspachএর স্মৃতির উদ্দেশে একটী স্মৃতিস্তম্ভ আছে। এটী আরো কিছুদূর এসে প্যারী যাবার রেল-ষ্টেশনের সামনে আর একটী প্রশস্ত রাস্তায় পোড়েছে।

এই রাস্তাটী ধোরে বাঁ দিকে অনেকখানি গেলে হল গেট (Hall gate ; Porte de Hal) পাওয়া যায়। এটী পূর্ব্বে সহর-রক্ষার জন্য একটী দুর্গবিশেষ ছিল, পরে কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে দুর্গ হিসাবে এর প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়ায় এখন এটী একটী যাদুঘরে রূপান্তরিত হোয়েছে। এখানে বিভিন্ন দেশের মধ্যযুগের সামরিক অস্ত্রশস্ত্র, বর্ম্ম ও রাজচিহ্ন প্রভৃতি রক্ষিত আছে। আধুনিক সহরের বুকে প্রাচীন দুর্গটী সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এর পর 'বুলেভার্দ ওয়াটারলু' নামে প্রশস্ত রাস্তা ধোরে কিছুদূর গিয়ে বাঁয়ে বেঁকলেই ব্রাসেল্‌সের কেন্দ্রে এসে পড়া যায়। এদিকে সবচেয়ে মাথা উঁচু করে তার বিরাট বপু নিয়ে

রেল ষ্টেশন—আণ্টওয়ার্প

দাঁড়িয়ে আছে "প্যালেস অব জাষ্টিস" বা প্রধান বিচারালয়। এর পাশেই "রয়্যাল কনজারভেটয়র অব মিউজিক (Royal conservatoire of music)। তার একটু পরেই 'নোত্রে দাঁ' গির্জ্জা (Notre-Dame de sablon)। এই গির্জ্জাটী চমৎকার দেখতে। এর কাছেই 'আর্টস হিল' (Arts hill ; mont des Arts) নামে একটী সুন্দর পার্ক। একটী উঁচু টিলার গায়ে ধাপে ধাপে সিঁড়ি উঠে গ্যাছে, দুধারে চমৎকার ফুলের বাগান। এটী ১৯১০ সালের প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রথম নির্ম্মিত হয়। ব্রাসেল্‌সে মাঝে মাঝে প্রায়ই বিশ্বপ্রদর্শনী বসে ; এর জন্যে বেলজিয়াম সরকার যথেষ্ট খরচ করে, কারণ এতে বিশ্বের বণিক সম্প্রদায়ের কাছে তারা নিজেদের জিনিষও উপস্থিত কোরতে পারে।

'আর্টস হিলের' কাছেই, রাস্তার প্রায় অপর দিকে রাজার প্রাসাদ। প্রাসাদটী শুধু বিশাল নয়—সুন্দর। এর সামনের সুবিন্যস্ত বাগানটী শীতে বিগত-শ্রী হোলেও বসন্তে বা গ্রীষ্মে এর রূপ কল্পনা কোরতে কষ্ট হয় না। রাজ-প্রাসাদের সামনেই প্রকাণ্ড একটী উদ্যান—এটীকে পার্ক বা স্কোয়ার বলা চলে না, সুবিন্যস্ত ও সুরক্ষিত প্রকাণ্ড বাগান ; এর অপর পারে রাজপ্রাসাদের ঠিক বিপরীত দিকে পার্লায়ামেণ্ট ও সিনেট-হাউস। এইখানকার নির্ম্মাণপদ্ধতি দেখে মনে হয় ব্রাসেল্‌স-বাসীরা প্যারীর সব কিছু অন্ধভাবে অনুকরণ কোরেছে। প্যারীর লুভ্রে রাজপ্রাসাদ, তার পর বাগান ও তার পরেই প্লা দি কোকোর্দ্দের ধারে ধারে 'চেম্বার অব ডেপুটী' ও অন্যান্য সরকারী কার্য্যালয়। এখানেও প্রায় সেই পদ্ধতিই অনুসৃত হোয়েছে। রু রয়েল রাস্তার ধারেই অজ্ঞাত সৈনিকদের স্মৃতিস্তম্ভ। গত মহাযুদ্ধে বেলজিয়াম নিরপেক্ষ থাকতে গিয়েও জার্ম্মাণীর আক্রমণে নিরপেক্ষ থাকতে পারে নাই। কাজেই বহু যুবক যুদ্ধানলে প্রাণ দিয়েছে। এদের অনেকেরই শেষ পর্য্যন্ত কোনো পরিচয় বা খোঁজ পাওয়া যায় নাই। এই সব অজ্ঞাত দেশপ্রেমিকদের স্মৃতির উদ্দেশে ইয়োরোপের প্রায় সব যুদ্ধমান জাতিই স্মৃতিস্তম্ভ বা অনির্ব্বাণ দীপশিখার ব্যবস্থা কোরেছে। এর কাছাকাছি এখানকার বিখ্যাত ক্যাথিড্র্যাল। এই সুউচ্চ গির্জ্জাটীর নির্ম্মাণ-কৌশল আণ্টওয়ার্পের ক্যাথি-ড্র্যাল থেকে ভিন্ন। আণ্টওয়ার্পের ক্যাথিড্র্যালের গগনভেদী তীক্ষ্ণাগ্র একটী চূড়ার বদলে, এর দু'পাশ থেকে দুটী চূড়া পাশাপাশি থামের মত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। সাধারণ গির্জ্জা থেকে এর গঠনভঙ্গীতে বেশ একটু বিশেষত্ব চোখে পড়ে। এটী ১০৪৭ থেকে ১২২৬ সালের মধ্যে তৈরী ; চূড়াগুলি ও সামনেটী দ্বাদশ শতাব্দীতেই নির্ম্মিত।

এর পর বেশ খানিকটা লম্বা দৌড় দিয়ে আসা যায় টাউনহলে, যার বেলজিয়াম প্রতিশব্দ 'হোটেল ডি-ভিলে' (Hotel De-ville)। বেশ প্রশস্ত খোলা জায়গার বুকে প্রাচীন টাউন হলটী নিজের গাম্ভীর্য্য বজায় রেখে দাঁড়িয়ে আছে। এই বাড়ীটী ১৪০২ সালে তৈরী। তার প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে এর দীর্ঘ আকাশচুম্বী চূড়াটী সংযোজিত হোয়েছিল। এর সামনে অনেকখানি খোলা জায়গা। টাউন হলেরই কাছাকাছি অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্য আছে। সবগুলিই অরশ্য অট্টালিকা। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কিংস হাউস (Maison du-Roi)। এই সুন্দর সৌধটী গথিক স্থাপত্যশিল্পের একটী শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এখানে একটী যাদুঘর আছে ও অন্য অংশ কয়েকটী সরকারী বিভাগের দপ্তর-খানা আছে। এইগুলি থেকে অনতিদূরে জেনারেল পোষ্ট আফিসের কাছেই স্থানীয় অপেরা-হাউস। ভাষা না জানা থাকায় এখানকার কোনো অভিনয় আমি দেখি নাই।

সেদিন সারা দিনের পর খেতে বোসলাম প্রায় তিনটের সময়। খাবার ঘরটী বেশ ছোট—একটা ছোট টেবিলের চার পাশে চারখানি চেয়ার, কিন্তু দুজনের ভালভাবে খাওয়া চলে। আর কোনো খাবার টেবিল সে ঘরে ছিলনা। ঘরের এক পাশে একটী খাবারের আলমারী, এক দিকে অগ্নিকুণ্ড, তার ওপর একটী ঘড়ি। ঘরটীর মাত্র দুটী দরজা, কোনো জানলা নেই। একটী দরজা ড্রয়িংরুমের দিকে, অন্যটী রান্নাঘরের দিকে। এই দিকের দরজায় একটী পর্দ্দা ঝুলছিল। আমি খেতে বোসতেই মালিক বিকৃতকণ্ঠে পরি-চারিকাকে ডাক দিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই একটী তন্বী তরুণী খাবার নিয়ে এল। তার মুখের দিকে চাইলাম। এই কি সেই অত্যাচারিতা নারী ? মনে হোল তার মুখটী অত্যন্ত করুণ ও কোমল, চোখ দু'টী ব্যথাতুর। আমার সামনে মালিক কি তাকে বোল্লে, সে মৃদু হেসে ঘাড় নেড়ে তার জবাব দিলে। বিস্মিত হোলাম ; তবে কি আমার ভুল! ঐ ত ও বেশ সস্মিত মুখে ওর সঙ্গে কথা কইছে। অত্যাচারীর তীব্র কশা যদি ওর পিঠে সত্যই পোড়ত, ও কি অমনভাবে তার সঙ্গে কথা কইতে পারত ? সন্দিগ্ধ-চিত্তে নীরবে আহার শেষ কোরলাম। মালিকটী এদিকে বেশ ব্যবসায়ী ; সাদা জলের বদলে মদ বা অন্ততঃ মিনারেল ওয়াটার গছাবার দারুণ চেষ্টা। উঠে আসছি, আবার পাশের রান্নাঘর থেকে নারীকণ্ঠের করুণ আর্ত্তনাদ এল, সঙ্গে সঙ্গে সেই লোকটীর হুঙ্কার। গতি আপনিই বাধা পেল। সহসা সে পরদা ঠেলে বেড়িয়ে এল ; আমায় জিজ্ঞাসা কোরলে রাত্রে কি খাব। তার স্বরে বিন্দুমাত্র উত্তেজনার চিহ্ন পেলাম না। আসল ব্যাপারটা যে কি তা আজও আমার কাছে রহস্যাবৃত।

বিকেলবেলা ষ্টেশনের দিকে গেলাম,—কিছু বেলজিয়ান

টাউন হল, গিল্ড হাউস ও ব্রাবো ঝর্ণা—আণ্টওয়ার্প

মুদ্রার প্রয়োজন ছিল। সেখান থেকে বেরিয়ে দেখি ঠিক সামনেই একটী প্রকাণ্ড সাততলা বাড়ী। প্রথম দিন অন্ধকার হওয়ায় এটী চোখে পড়ে নাই, কিন্তু দিনের আলোয় কেউ এটী না দেখে পারে না। বড় কৌতূহল হোলো। এর সামনে গিয়ে দেখি এটী একটী দোকান, নীচে প্রকাণ্ড দ্রষ্টব্যাধার। ভেতরে ঢুকে পোড়লাম। হঠাৎ মনে হোলো এটী পৃথিবীর বুঝি অষ্টমাশ্চর্য্য। বিরাট সৌধটী জিনিষে জিনিষে ভর্ত্তি। এর সাতটী তলায় বাসন-পত্র, মনিহারী জিনিষ, খেলনা, গহনা, পোষাক, কাচের ও ইলেকট্রিকের নানা জিনিষ, আসবাব পত্র, তরিতরকারী—রান্না ও কাঁচা,

রেষ্টুরাণ্ট প্রভৃতি যা কিছু লোকে দোকান থেকে কিনবার কল্পনা কোরতে পারে সব কিছু পাওয়া যায়। এমন কি এরই একটা তলার এক দিকে কুক কোম্পানীর অফিস। এ-তলা থেকে ও-তলায় যাবার বৈদ্যুতিক সিঁড়ি অথবা লিফ্ট আছে। এতবড় বিরাট একটা দোকান আমরা সত্যিই কল্পনা কোরতে পারি না। আমাদের হোয়াইট-

আণ্টওয়ার্পের একটা বড় রাস্তা

এ্যাওয়ে অথবা ইংলণ্ডের উলওয়ার্থও এর অনেক নীচে। এর ভেতরে ঢুকে কিছুই না কিনে এলেও কেউ কিছু বোলবে না, এমন কি কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাবেও না। কিন্তু ছোট থেকে বড় নানা জিনিষ এমনভাবে চোখের সামনে ধরা আছে যে কিছু না কিনে বেরিয়ে আসতে গেলে সন্ন্যাসীর মন হওয়া দরকার। এটার নাম An Bon Marche। এর খুব কাছেই আমেরিকান এক্সপ্রেসের অফিস। ষ্টেশনের অনতিদূরে প্যালেস ও এ্যালবার্ট হোটেলের পাশেই এখানকার বোট্যানিক্যাল গার্ডেন।

Bon Marche থেকে বেরিয়ে একটু লম্বা দৌড় দিয়ে এলাম Bronckere place নামে একটা ছোট পার্কের মত জায়গায়। এটা ঠিক পার্ক নয়, তবে রাস্তাটা এত প্রশস্ত যে প্রায় পার্কের মত দেখায়—দুদিকে রাস্তা, মাঝে অনেকখানি চওড়া জায়গা। এরই ওপরে পূর্ব্ব-বর্ণিত Anspach স্মৃতিস্তম্ভ। সন্ধ্যায় এই রাস্তাটা বড় চমৎকার দেখতে লাগে।

একটু রাত্রে হোটেলে ফিরলাম। কিছুক্ষণ পরে গাইডটা বিল নিয়ে হাজির কোরলে; এরই মধ্যে, হোটেল ছাড়বার আগেই বিল আনতে একটু অসন্তুষ্ট হোলাম, কিন্তু মুখে কিছু না বোলে বিল মিটিয়ে দিলাম। এখানে চাকরের বকশিস (serrice) বিলের শতকরা দশ ফ্রাঙ্ক ছাড়া আবার একটা সহরকর (city Tax) দিতে হয় শতকরা পাঁচ ফ্রাঙ্ক হিসেবে। আমার অপূর্ব্ব হোটেলটার নাম Hotel De La Haye, ঠিকানা Rue des charbouniers, 19, Bruxelles Nord; এটা ঠিক হোটেল নয়, বেশ ছোট 'পেন্সন' (Pension) বলা যেতে পারে।

বাংলা ভাষার এক দিক

শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

—বেতারের 'শরৎ-শর্বরী'তে মনীষী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একদিন বল্লেন—"সেদিন হয়ত আমি থাক্‌বো না; কিন্তু আস্‌ছে সেদিন যেদিন তোমরা দেখ্‌বে স্কুল-কলেজ, অফিস আদালত, রেল ডাকঘর সব জায়গায় এই বাংলাতেই কাজ চল্‌ছে।"—কথাটা শুনে কার প্রাণে না সেদিন পুলকের শিহরণ জেগেছিল? বাংলা দেশের কাজ বাংলায় চল্‌বে—এত ন্যায্য কথা—স্বাভাবিক অধিকারের কথা। কিন্তু কার্য্যতঃ তার বিপরীতই ঘটে। এম্‌নি বিপর্য্যয়!

আঁতুড়ঘরের মা-কোল থেকে সুরু করে অন্তিমের 'হরিবোল' পর্য্যন্ত যাদের কণ্ঠে মাতৃভাষা ফুকারি উঠ্‌বে, তাদের জন্য শিক্ষার বাহন হবে বিদেশী ভাষা—এত বড় মর্ম্মান্তিক বিদ্রূপ শুধু এই অভাগা দেশেই শোভা পাচ্ছে!

ফরাসী সাহিত্যিক রোঁমা রোঁলাকে জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী হবার জন্য কোনো বিদেশী ভাষার আশ্রয় নিতে হয়নি; ইয়োরোপের সর্বাগ্রণী ইংরেজি ভাষার কোনো ধারই তিনি ধারেন না। আর এ দেশের শিক্ষার ছাঁচ তৈরি হয়েছে বিদেশীর কাজে লাগার ফরমাস হিসাব করে। কাজেই শিক্ষার আসল রূপ যা—এ অভাগাদের চোখে তা বড় পড়ে না।

স্বাধীন দেশের ভাষা তার ঘর সাম্‌লে সম্পদ সঞ্চয় কর্‌ছে বিশ্বের দরবারে সমান্ ভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার জন্যে; আর বাইরের হাতের চাপে অধীন দেশের ভাষার প্রাণ ত স্বতঃই স্ফূর্ত্তিহীন। তার উপর আবার পরদেশী ভাষার শিক্ষার আবর্তে পড়ে সন্তানদের মনেও যে বিরাগের ছায়া পড়ে—তার ফলে মাতৃভাষা হয়ে থাকে ক্ষীণাঙ্গী—ম্লান পাণ্ডুর!

ইদানীং তবু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সু-হাওয়ার বিশেষ লক্ষণও দেখা দিয়েছে যে স্কুলের ছেলেরাও অন্ততঃ বৈদেশিক ভাষার দুর্ভার বহনের বাধ্যতা থেকে রেহাই পাবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষাতেও বাংলার যে স্থান হয়েছে—সেখান থেকেও আশার আলোই দেখ্‌তে পাওয়া যায়। ক্রম-গতিতে যেদিন সকল শিক্ষারই ব্যবস্থা হবে মাতৃভাষায়—সেদিন থেকেই ভাষা পার্‌বে তার মেরুদণ্ড খাড়া করে দাঁড়াতে। সে দিন এসেছে; বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষা ও পঠন ইংরাজী সাহিত্য ব্যতীত অন্য সমস্ত বিষয়েই দেশীয় ভাষার সাহায্যে হইবে।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়, সাহিত্য-পরিষৎ-সমিতি, শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রশেখর বসু, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু প্রমুখ কতিপয় মনীষীর চেষ্টায় বাংলায় বহু পারিভাষিক শব্দের উদ্ভাবন হয়েছে বা হচ্ছে। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রণয়ণের জন্য শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসুকে সভাপতি করিয়া যে সমিতি গঠিত করিয়াছেন, তাহার কার্য্য প্রায় শেষ হইয়াছে শুনিয়া আনন্দিত হইলাম। সুতরাং পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, খনিবিদ্যা, ভূতত্ত্ব, উদ্ভিদবিদ্যা, জীববিদ্যা, রাজনীতি, প্রাণিবিদ্যা, অর্থবিদ্যা ইত্যাদির দিক দিয়ে বাংলা ভাষার যে দৈন্য ছিল যাহা অচিরেই দূর হইবে। তার পর ভাষার ক্রমোন্নতি নির্ভর করছে সেই ভাষার প্রসার বৃদ্ধির উপর। যে যে উপায়ে দিকে দিকে ভাষার প্রসার ছড়িয়ে যেতে পারে—সেগুলির দিকে দৃষ্টি আমাদের যতই বাড়বে ততই মঙ্গল। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূল-সাহিত্যের রস সন্ধানে অনেক বৈদেশিকই বাংলা-শিক্ষায় মনোযোগী হয়েছেন। সেইভাবে বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক, রাসায়নিকগণের গবেষণা বাংলায় প্রকাশিত হলে, বাংলার সম্পদ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন ভাষাভাষীদের মধ্যেও এ ভাষার প্রসার বৃদ্ধি হয়ে উঠ্‌বে। ভাষার প্রসার-বৃদ্ধির আর একটি যে বড় উপায়—ব্যবসায় ক্ষেত্র—সেটি থেকে আমরা নিজেদের একান্তই বঞ্চিত করে রেখেছি। হিন্দী ভারতের অনেক ব্যবসাদার জাতির ভাষা বলে ইয়োরোপে হিন্দী শিক্ষার রীতিমত চর্চা বাধ্য হয়ে প্রয়োজন হয়ে উঠেছে। এই এক ব্যবসায়ের জোরেই ইংরেজি ভাষার আজ কত না প্রসার।

তার পরের কথা হচ্ছে ব্যাপারিক ভাষা হিসাবে বাংলার শক্তি। ভবিষ্যৎ-ভারতের রাষ্ট্র-ভাষা কি হবে তাই নিয়ে আজ পর্য্যন্ত বহু তোলা-পাড়ার পর এক রকম ঠিক হয়েই গিয়েছে—যেহেতু ভারতে হিন্দী ভাষীর সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী—সে কারণ হিন্দীই হবে ভারতের রাষ্ট্র-ভাষা; যদিও সম্পদের দিক দিয়ে—বাংলাই ভারতের শ্রেষ্ঠ ভাষা। যাই হোক্ নিজ নিজ প্রদেশকেও চালাতে হলে ব্যবসায়ী জগতের জন্য ভাষার শক্তি কতদূর বাড়াতে হবে তা সহজেই অনুমেয়। বর্ত্তমান জগতে বুক ঠুকে দাঁড়াতে হলে ব্যাপারিক ভাষার পক্ষে অন্ততঃ দুটি জিনিসের অনিবার্য্য প্রয়োজন। একটি সংকেত-লিপি (সর্টহ্যাণ্ড) আর একটি লিখনযন্ত্র বা ছাপা কল (টাইপরাইটার)।

আজ প্রদেশে প্রদেশে সভা-সমিতি, কংগ্রেস কন্‌ফারেন্সের বক্তৃতাদি যখন সুরু হয়েছে স্ব-স্ব প্রাদেশিক ভাষায়,—তদুপরি ব্যবস্থা-পরিষদেও প্রাদেশিক ভাষার ব্যবহার হবে বলে যখন শোনা গিয়েছে, তখন ভাষার

জন্য উন্নত প্রণালীর সংকেত-লিপি যে একটি অনিবার্য্য প্রয়োজন তা বলাই বাহুল্য।

বাংলা ভাষায় সংকেত-লিপির একাধিক নীতির উদ্ভাবন অবশ্য হয়েছে।

"১৩১৯ সালে ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর "রেখাক্ষর—বর্ণমালা" লিথোর সাহায্যে সাধারণ্যে প্রকাশিত করেন। কল্‌কাতার শ্রীইন্দ্রকুমার চৌধুরী এই দ্বিজেন্দ্র-নীতিকে প্রয়োজন মতে পরিবর্তিত করে নিয়ে একটি নূতন প্রথার রূপ দিয়েছেন। ায় ১২।১৩ বৎসর পরে ১৩৩২ সালে ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ Pitmanএর অনুসরণে বাংলা সর্ট-হ্যাণ্ডের আর একটি প্রথার সৃষ্টি করেন। কলিকাতার শ্রীশশিভূষণ দাস এ বিষয়ে গবেষণার ফলে আর একটি নীতি উদ্ভাবন করেছেন। Greggএর অনুসরণে শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি একটি নূতন প্রথার প্রবর্ত্তন করেছেন।" (নবশক্তি, ৪র্থ বর্ষ, ২৩শ সংখ্যা)

বাংলা সংকেত-লিপির এই হলো জন্মকথা। কিন্তু অদ্যাবধি উপযুক্ত যথেষ্ট লেখনিকের সৃষ্টি সম্ভব হয়নি বা হবেও না এই কারণে যে ছাপানো বই এবং সাধারণ শিক্ষালয়ের অভাব। সমস্ত ভারতবর্ষে এমন কোনো ছাপাখানা নেই যেখানে সংকেত-লিপির হরফ-তৈরির ব্যবস্থা হয়। ওদেশে Pitman Systemএর পর Sloan, Script, Oxford, Gregg, Dutton প্রভৃতির আবিষ্কার সগর্বে সমস্ত পৃথিবীময় ছড়িয়ে গেল, আর আমাদের দেশে ! গৃহকোণই সার ! দেশের বিশ্ববিদ্যালয়, সাহিত্য-পরিষৎ-সমিতি বা ঐরূপ কোনো বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা হিতকামী ধনী দানশীল দলের দৃষ্টি এ বিষয়টির প্রতি আমরা একান্তভাবে আকর্ষণ কর্‌ছি।

তার পর লিখনযন্ত্র বা ছাপাকলের কথা। তার একান্ত প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নই উঠ্‌তে পারে না। লিখন-জগতে এর প্রতিযোদ্ধা আর কিছু নেই। অতি অল্প সময়ের মধ্যে সুদৃশ্য—পরিচ্ছন্ন—একাধিক নকলপত্র সহ মুদ্রণ-ব্যবস্থা একমাত্র ছাপাকলেই সম্ভব। আর ব্যবসায়ী জগতের জন্য লিখনের সম্পূর্ণ স্পষ্টতার প্রয়োজনে ছাপাকলের প্রবর্তন অপরিহার্য্য।

১৩২৫ সালে ময়মনসিং ধানকুড়ার শ্রীসত্যরঞ্জন মজুমদার বহু বৎসর চেষ্টার পর প্রথম বাংলা টাইপরাইটার আবিষ্কার করেন।—তাঁর আবিষ্কৃত যন্ত্রের ছাপা আমরা দেখেছি; তাতে ক্রমোৎকর্ষ-সাধনের যতটা অবকাশই থাক্ না কেন, তাঁর প্রথম প্রচেষ্টার এ সাফল্যকে জয়মাল্যের গৌরব আমাদের দিতেই হবে। সত্যরঞ্জন-যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার কয়েক বছর পরে—'রেমিংটন, আণ্ডারউড কোং'র কল বাজারে বেরোয়। এ যন্ত্রতেও উৎকর্ষ-সাধনের অবকাশ যথেষ্ট রয়েছে, বিশেষ করে র ফলা, ব-ফলা ইত্যাদির চেহারাগুলি দৃষ্টির পীড়া-উৎপাদন করার জন্য দায়ী। তা ছাড়া যে প্রণালীর আশ্রয়ে এই যন্ত্রে লিপি-গঠনের ব্যবস্থা হয়েছে—তার উপর নির্ভর করে দ্রুতগতির আশা করা অসম্ভব। আর তার জন্য দায়ী যেমন তাঁদের প্রণালী—তার চেয়ে বেশী দায়ী বাংলা অক্ষর-গঠনের জটিলতা। ইয়োরোপী-ভাষার অক্ষরগুলি ও-দেশীয় মানুষ-গুলির মতনই বেপরোয়া ভাবে সোজাসুজি গতিতে ছুটে চলেছে। আর ভারতী-ভাষার অক্ষরগুলি জড়িতচরণা সলাজ বধূর মত পদে পদে যেন করতে চায় বিঘ্নের সৃষ্টি! মুনিঋষিদের স্নিগ্ধ তপোবনছায়ার আদি ভাষাজননীর ভিন্ন ভিন্ন ভাষারূপা আদরিণী কন্যাগুলি কাব্য-নিকুঞ্জে ছন্দের কূজন তোল্‌বার জন্যেই যেন লালিতা পালিতা। কর্ম-চঞ্চল জগতের দরবারে ছুটাছুটি কর্‌তে তাই তাদের এত বাধা—এত বিঘ্ন!

ভাষার বহু যুগের মুখাবরণ সরিয়ে ফেলার পথে অন্তরের সঙ্কোচই হয়েছে বড় অন্তরায়। তাই নিত্য উন্নতির গতিতে জগৎ যখন এগিয়ে চলেছে—তখন আমরা আমাদের পরিবর্তন-বিরোধী মনগুলি নিয়ে নিশ্চিন্ত স্থবিরতায় বসে আছি। কিন্তু সত্যই কি আজো দিন আসেনি আমাদের চোখ তুলে দেখ্‌বার? পৃথিবীর ভাষা আজ কাজের ভিড়ে সদা-ব্যস্ত, আর আমাদের ভাষা তার প্রাচীন সংস্কারের অবরোধেই কি দিন কাটিয়ে যাবে? কর্ম-ব্যস্ত পৃথিবীতে দাঁড়াতে পারে এমন ভাষাই আজ দরকার। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রগমনের সাহসই আজ সর্বাগ্রে প্রয়োজন, কেন না তাঁদের কার্য্যকারিতার ফলেই ব্যাপক ফললাভের সম্ভাবনা।

অল্পে অল্পে এখন ভাষার এক একটি স্তরে আসা যাক্। আমাদের স্বর-ব্যঞ্জন, আ-কার, উ-কার আর নানা যোগাযোগের অভিযান সত্যই কি বিরাট নয়? ইংরেজির মোট ২৬টি বর্ণাক্ষরমালা ত্রিভুবন জয় কর্‌ছে; তার সঙ্গে দাঁড়ি কমি চিহ্নাদি নিয়ে সর্বসাকুল্যে ৮৪টি হরফে ইংরেজি ছাপাইকার পায় রেহাই; অন্য পক্ষে বাংলা শুধু বর্ণমালাতেই ইংরেজির দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে বসে আছে। আর স্বর-ব্যঞ্জনের পারস্পরিক যোগাযোগ প্রসূত সৃষ্টিগুলির সমাবেশে চারিশতাধিক হরফের প্রয়োজন বাংলা ছাপাইকারের অদৃষ্টে!

সিলেটী নাগরী'তে ৩২টি অসংযুক্ত আর ১৬টি সংযুক্ত অক্ষর নিয়েও বেশ কাজ চলে শুনেছি (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৫শ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা)। বাংলা অক্ষরমালার বংশও কথঞ্চিৎ হ্রাস করা চলে কি না আমাদের দেখা দরকার।

বাংলার জমিদারি চাল। ষড়ত্রিংশ ব্যঞ্জন সেবনেও ঔদরিক দ্বাদশ স্বরের ভোজন-বিলাস শেষ হয় না; তাঁদের পাছু পাছু এক-একটি রেখা-দক্ষিণারও ব্যবস্থা রাখ্‌তে হয়েছে। যেমন আ'-র দক্ষিণা া, ই-র ি, ঈ-র ী, উ-র ু, ঊ-র ূ, ঋ-র ৃ, এ-র ে, ঐ-র ৈ, ও-র ো, ঔ-র ৌ। আচার্য্য যোগেশচন্দ্র রায় আ, ই, উ ইত্যাদি তুলে দিয়ে কেবল া ি ু ইত্যাদি চালাবার যুক্তি দিয়েছেন। যেমন আমার া মার, দেখাও দেখা ো ইত্যাদি (প্রবাসী, কার্ত্তিক, ১৩১৬)। তাতে কিন্তু লিপি-সৌকর্য্য ও সৌন্দর্য্যের দোষ ঘটে না কি? তা ছাড়াও আর একটি কথা আছে আচার্য্য মহাশয়ের এ যুক্তির মধ্যে যেটির সমাধান হয় না। যথাস্থানের পূর্বে বাংলায় স্বর-যোজনার যে বিধি আছে সে বিধিটির উচ্ছেদ-সাধনের প্রয়োজনীয়তা আছে বলে কি মনে হয় না?

ইংরেজিতে হলে হতো—'Kala pakhita Ken Kare'—কাল পাখীটা কৃএন করৃএ জ্বালাতন। এর মধ্যে আরো একটি উদ্দেশ্য আছে।

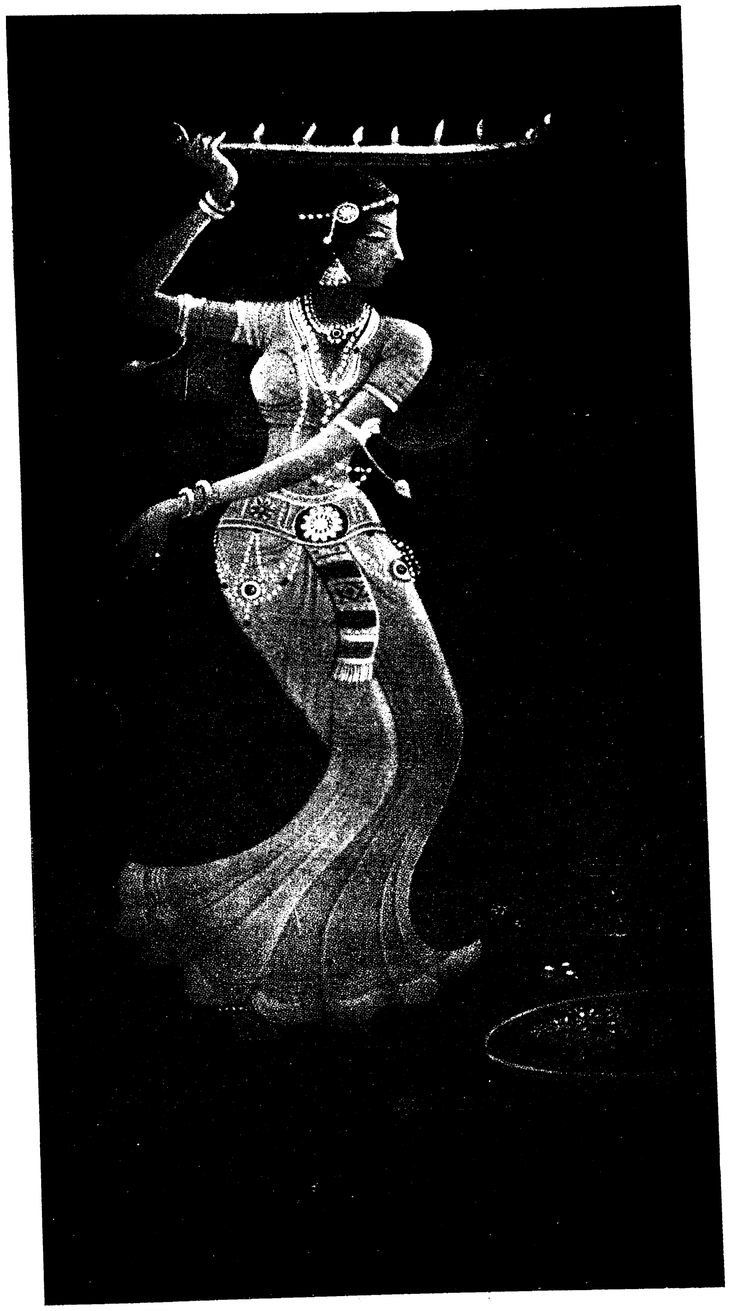

আরতি

শিল্পী—শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র দে

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

আমরা মুখে বলি দ-এ-ই দি, লিখি কিন্তু ই-দ-দি ; যা থেকে পূর্ববঙ্গে করিয়া, গাঁথিয়া ইত্যাদির স্থলে কইরা, গাঁইথার সমস্যা উদ্ভূত হয়েছে। বাংলায় স্বর-লিখনের এই যে বিধি এর ফলে হয় এই যে ছাপার কাজে বানানের প্রতি স্মৃতির কাজ এবং লেখা ও শাব্দিক বানানের প্রভেদের সমস্যায় অঙ্গুলির দ্রুতগতিকে অনেক পরিমাণে দেয় বাধা ; যেমন গেহিনী ছাপ্‌তে গিয়ে শাব্দিক বানানটাই (গ্‌এহ্‌ইনী-Gahini) সর্বাগ্রে স্মৃতিকে গিয়ে অধিকার কর্‌বে ; ছাপাইকারকে কিন্তু তার কবল থেকে মুক্তি নিয়ে চেহারাগত (এগইহনী) বানানটির প্রতি মনোযোগ দিতে হবে। যার ফলে দ্রুতগতির সংহার হবে—অনিবার্য্য। এইটি হয়েছে অন্যতম প্রধান কারণ যার জন্য বাংলার ছাপাকলকে ইংরেজি ছাপাকলের পশ্চাতে পড়ে থাক্‌তেই হবে। মনীষিগণের চিন্তাফলে এ সমস্যা যদি কোনো দিন দূর হয়—বাংলা ছাপাকলের দ্রুতগতি সেই দিনই শুধু সম্ভব হবে—তার আগে নয়। এটি যে শুধু বাংলা ভাষাতেই প্রযুজ্য—তা নয় ; কেন না হিন্দী, গুজরাটী, মারাঠী, তামিল, তেলেগু, ওড়িয়া প্রভৃতি সকল ভারতী ভাষার অদৃষ্ট একই সূত্রে গাঁথা।

তার পরের কথা। ব্যঞ্জনে স্বর-যোগ বিধি—তাতেও এক বৈষম্য। একে ত স্বরবর্ণের ছুটি ছুটি মূর্তি—তার উপর আবার ভিন্ন ভিন্ন ব্যঞ্জনের মিলন-কুঞ্জে গিয়ে কেউ কেউ বহুরূপীর বেশে দেখা দেন।

যেমন—কু　কিন্তু　গু, শু, হু, রু (পরন্তু)
কূ　„　রূ
কৃ　„　হৃ
ক-অ্—ক্ ;　ত-অ্-ৎ

শুধু র'য়ে শেষ নয়—তার আরো ছুটি রূপ—রেফ ও র-ফলা। তাও আবার ভিন্ন ভিন্ন নাগরের সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন রূপ।

যেমন—গ'র সঙ্গে গ্র
কিন্তু—ক'র „ ক্র (ক্‌ নয়)
ত'র „ ত্র (ত্‌ নয়)
ভ'র „ ভ্র (ভ্‌ নয়)

ইংরেজির 'R'এর কিন্তু ঘন ঘন রূপে না বদল হয়ে গুণটাতেই বদল হয় ; যেমন রামী Rami, কর্মী Karmi, আশ্রম Asram এবং এই নীতির ফলে বাংলার উর্দ্ধ প্রভৃতি শব্দের মত তলে ও উপরে কলেবর বৃদ্ধির পরিবর্তে পাশাপাশি লিখার সুবিধাটি পাওয়া যায়।

লিখ্‌বো ক ষ—মিলিত রূপ হবে ক্ষ—উচ্চারণ হবে 'খ'। হিন্দী, গুজরাটী প্রভৃতিতে রক্‌ষা, শিক্‌ষা উচ্চারণ চল্‌লেও বাংলায় অচল ! যা-চ-ঞা রূপান্তরিত হবে যাচ্ঞা-তে ; ঞ' উচ্চারণে কোনো বিকার ঘট্‌ছে না, কিন্তু য-জ-ঞ লিখে রূপ হবে যজ্ঞ, উচ্চারণ হবে যগ্‌গঁ ! আমাদের যুক্তাক্ষরের অধ্যায়টি যেন মধ্যসমুদ্রে কালবোশেখীর বিভীষিকা ! যার ভয়াবহ বৈষম্যঘোরে শিশু-শিক্ষার্থী থেকে আরম্ভ করে নিরীহ ছাপাইকারের পর্য্যন্ত হয় প্রাণান্ত ! ছোট একটি তালিকা দিই—

ক্‌ত—ক্ত ; ক্‌র—ক্র ; ক্‌ষ—ক্ষ
ঙ্‌ক—ঙ্ক ; ঙ্‌গ—ঙ্গ
জ্‌ঞ—জ্ঞ ; ঞ্‌চ—ঞ্চ
ট্‌ট—ট্ট ; ণ্‌ড—ণ্ড
ত্‌ত—ত্ত ; ত্‌থ—ত্থ ; ত্‌র—ত্র ; ত্‌ত্‌র—ত্ত্র
গ্‌ধ—গ্ধ ; দ্ধ ; ন্ধ ; ব্ধ
ন্‌থ—ন্থ ; স্থ
ক্‌ম—ক্ম ; হ্‌ম—হ্ম
ক্‌য—ক্য ;
ষ্‌ণ—ষ্ণ ; স্‌ব—স্ব ; স্ত
হ্‌ণ—হ্ণ।

তার পর আস্‌ছে দ্বিত্ব-নীতির সম্প্রয়োগ। অর্জ্জুনের দুর্জ্জয় প্রতাপ, —কাজেই প্রাচীন পন্থীদের কাছে দুর্জয় অর্জুনের ক্ষীণাঙ্গী মূর্তি মানায় না ! পণ্ডিতরা উর্ধস্বরে তর্জন গর্জন করবেন বটে, কিন্তু বর্তমানের এ পরিবর্তন কার্তবীর্যের তীক্ষ্ণ শরের মতই আস্‌বে। তাতে শর্মারা যদি ক্রোধান্ধ হয়ে ওঠেন, তাহলে নিরুপায় !

কামালপাশার কামান আছে, হৃদয় তাই তাঁর একান্ত পাষাণ ! তুর্কীস্থানের অক্ষরমালাকে তোপের মুখে উড়িয়ে দিয়ে তাই তিনি পাষাণের মত সম্পূর্ণ নূতন করে ভিত্তি গড়ছেন। অতটা বাড়াবাড়ি আমাদের সহ্য না হলেও, কর্ম-ব্যস্ত জগতে ভাষার উপযুক্ত স্থান করে নিতে হলে উপস্থিত পন্থা থেকে অল্প বিস্তর পরিবর্তন একান্তই অপরিহার্য। মনীষিগণের ঐকান্তিক মনোযোগ এদিকে আমরা আকর্ষণ করি।

প্রাথমিক পরিবর্তনের যে রূপ-কল্পনা আমাদের আছে তারই কিছু কিছু উদাহরণ দিয়ে আমাদের প্রবন্ধের উপসংহার করছি।

ি ু ূ ৃ ে ৈ ো ৌ স্বর-চিহ্ণগুলিকে পরিবর্তন করে। া এর মত ব্যঞ্জনের দক্ষিণভাগে ব্যবহারের উপযোগী চিহ্ণের উদ্ভাবন ও প্রবর্তন করা।

যুক্তাক্ষর নীতির পরিবর্তন করে ইউরোপী ভাষার মত পাশাপাশি লিখার সুবিধা সৃষ্টি করা।

ণত্ব ষত্বের বহুদিনের দ্বন্দ্ব উপেক্ষার জিনিস-শ—ষ নয় ! কেন না খাঁটি স্বর্ণ বাংলার সোণা বা সোনার বাজারে একই দর পাচ্ছে ! যে সংস্কৃতে পাণটি থেকে চূণটি খস্‌বার যো নেই সেই চূর্ণ পূর্ণ বাংলার চুনে পানে যখন একসাৎ হয়ে গেছে তখন প্রয়োজনে বাংলার রূপ-পরিবর্তনে অত আতঙ্ক কেন ? তাই ণত্বের ন্যাকামি আর ষত্বের স্বত্ব কতটা পর্যন্ত ছাড় দেওয়া চলে, সেটির হিসাব নির্দেশ করা।

দ্বিত্ব-নীতির অবসান করা।

বর্গীয় 'ব' ও অন্তস্থ 'ব'এর মধ্যে আকৃতিগত কোনো পার্থক্য নির্ধারণ করা।

মিশ্র সংযোগে মূল অক্ষরের আমূল পরিবর্তন-নীতি ত্যাগ করা ; যথা ক্‌ষ—ক্ষ ; জ্‌ঞ—জ্ঞ ; হ্‌ম্‌—হ্ম ইত্যাদি।

বারান্তরে এই পরিবর্তনগুলি ও বাংলা ছাপাকলের উন্নত প্রণালীর বিষয়ে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা কর্‌বার ইচ্ছা রইলো।

সেলায়ের কল

শ্রীআশালতা সিংহ

এক

সুরবালার স্বামী ডেপুটি। সম্প্রতি বরিশাল হইতে বাঁকুড়ায় বদলী হইয়া আসিবার জন্য উপর হইতে হুকুম আসিয়াছে। আর সময় নাই, মাঝে আর তিনটা দিন মাত্র। তাহার পরেই যাত্রার দিন পড়িয়াছে। যদিচ আর্দালি আছে, তথাপি সুরবালা নিজের হাতে প্রত্যেকটি দামী এবং ভঙ্গুর জিনিষ প্যাক্ করিতেছেন। এবং আর্দালি যাহা প্যাক্ করিতেছে তাহাও তদারক করিতেছেন। অবশ্য একটা বড় আয়না এবং একটা কাচের পাল্লা দেওয়া মার্ব্বল্ পাথরের ড্রেসিং টেবিল আসিবার সময় সস্তা দামে নীলামে বিক্রয় করিয়া আসিতে হইল,—সঙ্গে আনা দুঃসাধ্য। বদলীর চাকরির এই একটা দুর্ভোগ, আর বিশেষ করিয়া সুরবালা তাহা হাড়ে হাড়ে বোঝেন, কারণ তিনি সুগৃহিণী। সুগৃহিণী বলিতে আমরা যে একটা বাঁধাধরা সংজ্ঞা দিয়া থাকি, কথাটার আসল ভাব তাহারও চেয়ে অনেকখানি ব্যাপক। কবির আপন সৃষ্টি কাব্যের প্রতি কবির যেমন একটি অপূর্ব্ব অনুকম্পা এবং সহানুভূতি থাকে, গৃহের প্রতি গৃহিণীর থাকে তাহাই। কত টুকিটাকি, কত পরিপাটি। আপন হাতে রচা সংসার। চায়ের বাসন রাখিবার ছোট শেল্‌ফ্‌টির উপর অবধি কত মমতা।

কিন্তু উপায় নাই। বদলীর চাকরি। সংসারে কোন এক জায়গায় শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া বসিবার জো নাই। ঘর বাঁধিতে বাঁধিতে বাঁধা যখন প্রায় সাঙ্গ হইয়া আসে, ফুলে ফলে লতায় পাতায় সংসার-তরু কোমল এবং সুশোভিত হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয়, তখনই হয়তো হুকুম আসে সরকারের কাছ হইতে, 'হেথা নয় হেথা নয় অন্য কোন খানে।' সুরবালা যদি আজকাল কলেজে পড়া দার্শনিক মেয়ে হইতেন, তবে হয়তো নিঃশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে আবৃত্তি করিতেন, "হায়রে হৃদয় তোমার সঞ্চয় দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথ প্রান্তে ফেলে যেতে হয়।" কিন্তু তিনি তাহা নহেন। তাঁহার স্বভাব সেকেলে ধরণের, সরল, মিষ্ট এবং নির্ভরশীল।

বরিশালে একাদিক্রমে চারি বৎসর ছিলেন, পাঁচজন প্রতিবেশীর সহিত হৃদ্যতা হইয়াছিল। সেখান হইতে বদলী হইয়া একেবারে বাঁকুড়ায় সার্কিট হাউসের কাছে একখানা বাসায় আসিয়া পড়িলেন। চারিদিকে ধূ ধূ মাঠ। অনেকখানি মাঠের পরে সরকারী রাস্তা আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে। এবং আরও খানিকটা গেলে নদীতীরের প্রান্তর। বালুকারাশির মাঝে শীর্ণ-সলিলা নদী ক্ষীণ ধারায় বহিয়া যাইতেছে। এ দিকটায় লোকজনের তেমন বসতি নাই। এখানে আসিয়া তাঁহার কিঞ্চিৎ বিমনা বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু সুরবালা সুগৃহিণী। তিনি মনের এ ভাবকে প্রশ্রয় দিলেন না। লোকজন নাই,—বাহিরের সঙ্গী সাথীর অভাবে শূন্য মনকে তিনি দ্বিগুণ বলে আপনার গৃহের প্রতি নিয়োজিত করিলেন। সমস্ত দিন ধরিয়া চলিতে লাগিল নূতন গৃহস্থালীর শৃঙ্খলা বিধান,—তাহার ঝাড়া-মোছার কাজ।

স্বামী হরকুমার মাঝে মাঝে আসিয়া পরিহাস করিয়া বলেন, "সুরো, কাজের ফাঁকে ফাঁকে যখনই তোমার সঙ্গে দেখা হয়—একেবারে রণরঙ্গিনীর বেশে। মাথায় চুড়ো করে খোঁপা বাঁধা, কোমরে কাপড়ের আঁচল শক্ত করে জড়ান। ঝাঁটা আর জল, চলেছে এই দুই অস্ত্রের ঘন ঘন উৎক্ষেপন। ব্যাপারটা কী!" হরকুমার বাহিরে ঠাট্টা তামাসা করেন, কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করেন; কিন্তু মনে মনে ভারি শ্রদ্ধা অনুভব করেন। সাধ্বী গৃহিণীদের কাছে আপন গৃহের মহিমা অত্যন্ত প্রত্যক্ষ এবং অবিসংবাদিত। হরকুমার মনে মনে বলেন, বাহিরের সমস্ত কোলাহল হইতে নিজেকে প্রত্যাহরণ করিয়া লইয়া দুইখানি কল্যাণপূর্ণ হস্তের সকল সেবা, স্নেহ এবং মাধুর্য্য একীভূত করিয়া এই যে আপন গৃহের প্রত্যেক তুচ্ছতম বস্তুটিকে অবধি হৃদয়ের স্নিগ্ধরসে

অভিষিক্ত করা,—ইহার ভিতর যে একটি অবিচলিত নিষ্ঠার সৌন্দর্য্য আছে, কোন্ মূঢ় তাহা অস্বীকার করিবে?

গৃহ সাজাইবার, তাহা ধৌত করিয়া মুছিয়া পরিষ্কৃত করিবার মোটামুটি কাজ হইয়া গেছে। সুরবালা এইবারে আরও সূক্ষ্মতর সজ্জায় মন দিলেন। আরাম কেদারার জন্য তৈল-নিবারণ করিতে একটা কাজ-করা আবরণ চাই। চেয়ার-গুলায় ভালো শিল্প কাজের কুশন দিতে পারিলে ভদ্র-গোছের দেখায়। কিন্তু বাঁকুড়ার দোকান বাজার নিতান্তই মফঃস্বলের ছোট সহরের মত। ঠিক পছন্দ মত জিনিষটি পাওয়া দুর্ঘট। তখন সুরবালার ইচ্ছা হইল, যাহা কিনিতে পাওয়া যায়না তাহার জন্য বৃথা আক্ষেপ না করিয়া যদি নিজের হাতে সেলাই করিয়া ফুল তুলিয়া এই সব জিনিষ প্রস্তুত করিতে পারেন, তবে কাজও হয়, আর এই সঙ্গী-সাথী-হীন প্রবাসে তাঁহার দিনগুলাও একেবারে দুর্ভর হইয়া উঠে না।

বস্তুতঃ তাঁহার স্বামী যখন অফিসে চলিয়া যান, সমস্ত বাড়ীটা নিঝুম হইয়া পড়ে। কেবল অদূরবর্ত্তী প্রান্তরের এক দিকে যেখানে তরিতরকারীর ক্ষেত হইতেছে সেখান হইতে বলদকে দিয়া কূপ হইতে জল উত্তোলনের একটানা ক্লান্ত স্বর ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না, তখন সারা দুপুর বেলাটা একটা ভারের মত মনে হয়। সুরবালা যখন যে কায করেন তাহার মধ্যে মগ্ন হইয়া যান। ইহার পরে হরকুমারের যে কোন সূত্রেই স্ত্রীর সহিত দেখা হয়, দেখেন, সুরবালা ঝুঁকিয়া পড়িয়া নিবিষ্ট মনে সেলাই করিতেছেন। একদিন স্বামীর আহারের কাছে বসিয়া তত্ত্বাবধান করিতেছেন, হাতে রহিয়াছে এমনই ধরণের কি একটা সেলাই। হরকুমার হাসিয়া কহিলেন, "সুরো, একটা সেলায়ের কল কিনলেই তো পার। আজকালকার বৈজ্ঞানিক যুগে যে কাজ সহজে, অল্প সময়ে এবং অল্প পরিশ্রমে হয় সে কাজে অনর্থক অতিরিক্ত পরিশ্রমের দরকারটা কোনখানে?"

কথাটা সুরবালার ঠিকই মনে হইল। কিন্তু মুখে তিনি কহিলেন, "সব জিনিষেই এত হিসেব এবং সময়ের নিক্তি ওজন,—কেন, জীবনযাত্রাটাকে একটা কল বানাতে চাও না কি?"

হরকুমার হাসিলেন। মনে পড়িল বিয়ের আগে স্ত্রী চরকায় সুতা কাটিতেন কিন্তু ডিপ্‌টি স্বামীর সংসারের কর্ণধার হওয়া অবধি সে অভ্যাস ত্যাগ করিয়াছেন। বলিলেন, "কিন্তু দেখ সেলায়ের কলটা এত ভালো জিনিষ যে মহাত্মা গান্ধী সর্ব্বরকম কলের বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও নিজে সেলায়ের কল ব্যবহার করেন। তাঁর মতে এটা কল হলেও কুটীর শিল্পের অন্তর্গত।"

সুরবালা কিছু বলিলেন না। সেলায়ের কলের কথাটা ভালো লাগিয়াছিল, কিন্তু মহাত্মার নামের সঙ্গে জড়িত হইয়া তাহার মাঝে যে খোঁচাটুকু আসিয়া পড়িল তাহাতে আহত হইলেন। হরকুমার অফিস যাইবার জন্য পোষাক পরিতেছেন, রেকাবে করিয়া পান এবং সুপারি মশল্লা আনিয়া গৃহিণী পার্শ্বস্থ টিপয়ে রাখিলেন। হরকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহলে তোমার মত কি সুরো? সেলায়ের কলের একটা অর্ডার দিয়ে আসবো?"

সুরবালার নিকট হইতে উত্তর আসিল, "তুমি বাড়ীর কর্ত্তা, তোমার ইচ্ছা।"

"এ উত্তর তোমার ঠিক হ'লো না সুরো। কিন্তু তোমার মনে মনে যা চিন্তার উদয় হচ্চে তা আমি বুঝতে পেরেচি। মনে কোরচ, এর সঙ্গে বিয়ে হয়ে জীবনের যা কিছু সত্য এবং আদর্শ তা বিসর্জ্জন দিতে হ'লো। কিন্তু তুমি মনে করে দেখ, একসঙ্গে সংসারের পথে চলতে গেলে অনেক কিছু বিসর্জ্জন দিতে হয়, অনেকখানি মাথা নোয়াতে হয়; নইলে পদে পদে ঘা খেতে হয়।"

সুরবালা দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "না, আমি কিছুই মনে করি নি। স্বামীর চেয়ে বড় আর কে আছে। তোমার ইচ্ছার সঙ্গে মিলিত হতে যেয়ে যদি কিছু ছাড়তে হয়, জেনো, সে আমার কর্ত্তব্য। আর সে কর্ত্তব্যে আনন্দ ছাড়া আর কিছুই নেই।"

অফিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া পোষাক ছাড়িবার পূর্ব্বেই পকেট হইতে সিঙ্গার কোম্পানীর একটা ক্যাটালগ বাহির করিয়া হরকুমার কহিলেন, "এই দেখো, এই যে ছবিটা দেখচ, এই রকমের কল তোমার নামে অর্ডার দিয়ে এসেচি। কাল সকালেই হয় তো এসে পড়বে। ঠিক করলুম টাকাটা ইন্‌ষ্টল্‌মেণ্টে দেব। তাহলে টাকাটা আস্তে আস্তে লাগবে সেটাও একটা সুবিধে, আর সিঙ্গার কোম্পানী থেকে ফি সপ্তাহে নিয়মিত কয়েক দিন করে একজন

লোক পাঠিয়ে দেয়, কাট ছাঁট আর কলের আনুষঙ্গিক কলকব্জার ব্যবহার শিখিয়ে দিতে। তা একেবারেই সমস্ত টাকাটা দিয়ে ফেল্লে, ওদের আর তেমন গরজ থাকে না।"

গ্রীষ্মকাল বলিয়া সুরবালা বরফ দিয়া স্বামীর জন্য সরবত প্রস্তুত করিতেছিলেন, মুখ না তুলিয়াই কহিলেন, "এই বয়সে বাপু আমি মাষ্টারের কাছে সেলাই শিখতে পারব না, বলে দিলুম। নিজে যা শিখতে পারি তাই যথেষ্ট হবে।"

হরকুমার প্রথমে পরিহাস করিয়া কথাটা উড়াইয়া দিলেন। সুরু করিলেন নানা দৃষ্টান্ত। ঐ তো গভর্ণমেণ্ট প্লীডার উমেশবাবুর স্ত্রী সপ্তাহে তিন দিন করিয়া মাষ্টারের কাছে এস্রাজ শেখেন। আর রাধাকুমুদবাবুর স্ত্রী সেলাই এবং পিয়ানো শেখেন। কেবল সুরোরই এমন কিই বা বয়স হইয়াছে যে……তাহার পরে যখন দেখিলেন, সুরবালা যথেষ্ট উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছেন, তখন হাসিয়া কহিলেন, "মাষ্টার নয়। দেশীয় খ্রীশ্চান বাঙালী একটি মেয়ে। নাম বল্লে মিসেস মিত্র। তিনি যদি মাঝে মাঝে এসে সেলায়ের কাজ একটু আধটু দেখিয়ে দিয়ে যান, তাতে নিশ্চয় তোমার আপত্তি হবে না।"

দুই

মঙ্গলবার দিন বেলা আন্দাজ দুইটা আড়াইটার সময় সিঙ্গার কোম্পানীর প্রেরিত খ্রীশ্চান মহিলাটি আসিলেন। মিসেস্ অণিমা গুপ্ত। বয়স খুব কম, বোধ করি বাইশ তেইশ হইবে। পরণে একখানা ছাই রঙের মান্দ্রাজি শাড়ী, হাই হিল জুতা। হাতে সেলায়ের নানা অত্যাবশ্যক সরঞ্জামে পূর্ণ একটি ছোট লেডিজ্ ব্যাগ। অতিশয় সুন্দরী না হইলেও দেখিতে সুশ্রী। মুখে কোমল লাবণ্যের আভাস পাওয়া যায়। বেশভূষার পারিপাট্য একটুখানি লক্ষ্য করিলেই বোঝা যায়।

প্রথম দর্শনে অণিমার প্রতি সুরবালা তেমন সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। কাঁচা বয়েস, খ্রীশ্চান। মেয়ে হইয়াও চাকরি করিয়া যাহাকে জীবিকার সংস্থান করিতে হয়, সুরবালা আশা করিয়াছিলেন, তাহার মুখে দেখিবেন ধীর গম্ভীর ধৈর্য্য, সকরুণ বিষাদের ছবি। কিন্তু তাহার বদলে মেয়েটির মুখে আনন্দের চাঞ্চল্য এবং প্রগলভতার আভাস। যাই হোক…তিনি মনে মনে কহিলেন, স্বামীর সখ সেলাই শেখা, শিখি। মেয়েটি যখন চলিয়া যাইবে গঙ্গাজল একটু স্পর্শ করিয়া লইব। অণিমাকে কহিলেন, "বসুন।" সামনে সতরঞ্চির উপর একটি পরিষ্কার চাদর বিঁছান। চৌকির উপর সদ্য কেনা সেলাইয়ের কলটি রহিয়াছে। এই ছোট জলচৌকিটি সেলায়ের কলের জন্যই বিশেষ করিয়া সুরবালা প্রস্তুত করাইয়াছেন।

অণিমাও বাড়ীর গৃহিণীর দিকে চাহিয়া দেখিল। দেখিল, বয়সে ইনি তাহার চেয়েও দুই এক বৎসরের ছোট। বোধ করি তাঁর বয়স উনিশ কুড়ি। ভোমরা পাড়ের একখানি দামী শান্তিপুরের শাড়ী আর হাতকাটা ফিরোজা রঙের একটি ব্লাউজ গায়ে। মুখের ভাবে, অধরৌষ্ঠের কম্পনে, হাসিতে বোঝা যায় অত্যন্ত সুখী। সংসারের সুখে তাঁহার হৃদয় অভিষিক্ত। সেই সুখের জ্যোতিঃ মুখমণ্ডলে আসিয়া পড়িয়া তাহাকে উদ্ভাসিত করিয়াছে, মৃদু হাসির আকারে অধরৌষ্ঠে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে। অণিমা একটুখানি হাসিয়া কহিল, "ওঃ, আপনাকে শেখাতে হবে! বাঁচলুম। যতক্ষণ আপনাকে দেখি নি ততক্ষণ আর এক নূতন বাড়ীতে শেখাতে হবে শুনে অবধি এমন ভাবনা হয়েছিল।"

"ভাবনা কেন?"—সুরবালা বসিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। অণিমা পূর্ব্বেই বসিয়াছিল। সেলায়ের কলের ঢাকনাটি খুলিতে খুলিতে অণিমা কহিল, "ভাবনা যে কেন তা আপনার বুঝবার কথা নয়। কিন্তু মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী বাড়ীর মেয়েদের সেলাই শেখানো যে কী দুঃসাধ্য ব্যাপার তা বোধ হয় কল্পনাও করতে পারবেন না। আজকাল বাড়ীতে বাড়ীতে কর্ত্তাদের সখ সস্তায় মাসিক কিস্তিতে টাকা দিয়ে সেলায়ের কল কিনে গিন্নীদের আপ টু ডেট্ করি। কিন্তু শেখাবার ভার পড়ে আমাদের উপর। ও পাড়ার বাঁড়ুয্যে গিন্নীকে গত পাঁচ মাস ধরে সপ্তাহে দু'দিন করে শেখাচ্ছি, এখনও কিছুই হোল না। সেলায়ের কলটা নিয়ে ব'সলেই তাঁর মাস সাত-আটের ছোট ছেলেটি হামাগুড়ি দিয়ে আসে আর এটা ওটা নিয়ে নাড়ে, কলের হাতলটা মুখে পুরে দেবার চেষ্টা করে, থাবা মেরে সূঁচটা ধরতে যায়। শেষে বিরক্ত হয়ে বলি, দিদি, ছেলেটাকে সামলান। তা নইলে যে সেলাই শেখানো দায়। বাঁড়ুয্যে গিন্নী তখন মুখে মুখে দুঃখের ইতিহাস বর্ণনা করতে থাকেন। কি আর করিবেন। দুটি বেলা সংসারের যজ্ঞির রান্না, তার ওপরে কোলে এই দামাল ছেলে। টেঁপিকে বলি দু দণ্ড ছেলেটাকে একবার ধর। তা কর্ত্তা আবার সাধের মেয়েকে দেছেন ইস্কুলে ভর্ত্তি করে।— অণিমার বর্ণনার সুরে সুরবালা হাসিয়া ফেলিলেন। কহিলেন, "মিছে বলো নি ভাই। চাকুরে-বাকুরে ছাপোষা মধ্যবিত্ত পরিবারের গিন্নীদের উদয়াস্ত এমনই পরিশ্রম করতে হয় যে দুটো মাইনে করা ঝিয়ে তা পেরে উঠবে না। এরও উপর কর্ত্তাদের যখন সাধ যায় গৃহিণীকে মেজে ঘষে একটুখানি আপ্ টু ডেট্ করি, তখন সে পরিশ্রমটা হয়ে পড়ে বোঝার উপর শাকের আঁটি।"

অণিমাকে মোটের উপর সুরবালার বেশ ভালোই লাগিল। প্রথমে মনে করিয়াছিলেন, খ্রীশ্চান মেয়ে আসিবে। কাঠখোট্টা চেহারা, পায়ে খুর-তোলা জুতায় খট্‌মট্ আওয়াজ, মেজাজটিও হয় তো ততোধিক। তাহার পরিবর্ত্তে সঙ্গিহীন প্রবাসে সুবেশা হাস্যমুখী তরুণী মেয়েটিকে দেখিয়াই তাঁহার ভালো লাগিল। এ সেলাই শেখায়, সঙ্গে সঙ্গে ঘর-সংসারের সুখ-দুঃখের পাঁচটা আলোচনা করে। একটু একটু করিয়া তাহার কাছে জানিয়া লইলেন, অণিমার স্বামী আছেন। ইস্কুলডাঙ্গা নামে বাঁকুড়ার একটা পাড়া আছে, তাহারই এক প্রান্তে বাড়ী ভাড়া করিয়া স্বামী স্ত্রী থাকেন। কিছুদিন হইতে অণিমা সিঙ্গার কোম্পানীর অধীনে চাকরী পাইয়াছে। আপাততঃ তাহাতেই সংসার চলে। অণিমার স্বামী বি-এ অবধি পড়িয়াছেন। কাজ-কর্ম্ম উপস্থিত কিছু পান নাই বলিয়া করেন না। জোগাড়ে আছেন। সুরবালা কহিলেন, "তোমাকে ভাই আমার ভারি ভালো লাগে। একা থাকি। তোমার সঙ্গে গল্প-গুজবে দুপুরটা কোন দিক দিয়ে কেটে যায়। কোম্পানী থেকে বলেচে সপ্তাহে দু'দিন করে আসতে, ওতে আমার চলবে না। তুমি রোজ এসো। আমি তোমার এই সময়টায় ভাগ বসালুম। তাই আলাদা করে মাসে পনেরো টাকা করে দেব। না বলতে পারবে না বলে দিচ্ছি।"

অণিমা কহিল, "আচ্ছা ভাই যতদিন না আমার স্বামীর চাকরি হয় ততদিন তোমার কাছেও আমি টাকা নেব। তার পরে কোন দিন যদি ভগবান মুখ তুলে চা'ন তখন তোমার দয়ার ঋণ যতদূর সাধ্য শোধ করব।"

তিন

সময়টা বৈশাখ মাস। তিনটা চারিটা হইতে আজকাল গুমট্ গরম করিতে থাকে, গাছের পাতাটি নড়ে না। তার পরে অপরাহ্নের দিকে প্রায়ই ঝড় জল ঝরিয়া কাল বৈশাখী উঠে। অণিমা বিকালে আসিয়া গালিচায় বসিয়া একখানা হাতপাখা নাড়িয়া মৃদু মৃদু হাওয়া দিতে দিতে কহিল, "কদিন থেকে কী গরম পড়েচে। এই পথটুকু হেঁটে আসতে গরমে দম বন্ধ হয়ে যায়। এক গ্লাস জল আনাও না ভাই।"

সুরবালা ঝিকে ডাকিয়া ঠাণ্ডা জল আনিতে বলিলেন। সোণার মত ঝকঝকে কাঁসার গ্লাসে কর্পূর সুবাসিত শীতল জল আসিল। জল খাইয়া রূপার ডিবায় ক্যেওড়া জলের ছিটা দেওয়া পাণ মুখে দিয়া অণিমা ঘরের চারিদিকে চাহিয়া কহিল, "তোমার সব কাজে এত ব্যবস্থা, এত পরিপাটি। চেয়ে চেয়ে দেখতে হয়।" সুরবালা সগর্ব্বে মুখ নামাইলেন। ইহাই তাঁহার কাছে সকলের চেয়ে বড় সুখ্যাতি। অণিমা যদি অবাক হইয়া কহিত, 'তুমি কি চটপটে ভাই! এরই মধ্যে ব্লাউজের ছাঁট শিখে নিয়েচ।' তাহা হইলে তিনি মোটেই এত খুসী হইতেন না। ঘরকন্নার সুশৃঙ্খলার গর্ব্ব তাঁহার কাছে মস্ত জিনিষ। ঝি দোর-গোড়া হইতে জিজ্ঞাসা করিল, "মা, বামুন হাট করে এনেচে।" সুরবালা বলিলেন, "জিনিষপত্র এখন ছোট ভাঁড়ারে গুছিয়ে রাখ গে সদু। আর দেখ, পটলগুলো জলে ভিজিয়ে রাখতে ভুলিসনে যেন।"

অণিমা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, "পটল জলে ভিজিয়ে রাখে বুঝি?"

সুরবালা হাসিয়া কহিলেন, "রাখে না? চোত বোশেখের দিন, নইলে শুকিয়ে যাবে যে!"

অণিমা মুগ্ধ গাঢ়স্বরে কহিল, "এত ইচ্ছে করে ভাই তোমার কাছে ঘর-গেরস্থালির এই সব টুকিটাকি জিনিষ শিখে নিই।"

তাহার পরে কিছুক্ষণ অন্যমনা ভাবে স্থির হইয়া বসিয়া থাকিয়া সহসা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া আবার কহিল, "কিন্তু শিখেই বা কি হবে, সারাদিন খাটুনির পর যখন বাড়ী ফিরি তখন এত ক্লান্ত লাগে আর সমস্ত জিনিষই এমন লণ্ড ভণ্ড হয়ে থাকে যে হাত পা ওঠে না। কিছু করতেও ইচ্ছা যায় না।"

আকাশে মেঘ জমিতে সুরু হইয়াছিল। দেখিতে দেখিতে কালবৈশাখীর মসীকৃষ্ণ অন্ধকারের ছায়া ঘরের মধ্যেও আসিয়া পড়িল। অল্পক্ষণ সেলাই শিখিয়াই অণিমা যেন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। একবার উঠিয়া জানালার নিকট গিয়া কি দেখিয়া আসিল।

সুরবালা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ ভাবখানা ব্যস্ত-গোচের দেখাচ্চে, বাড়ীতে কোন কাজ আছে না কি?"

অণিমা চমকাইয়া উঠিয়া সলজ্জ সুরে কহিল, "না কাজ তেমন কিছু নেই। আসবার সময়ে মেঘ দেখে উনি বলছিলেন সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন। তাই দেখছিলুম এসেচেন কি না।"

সুরবালা পরিহাসের স্বরে বলিলেন, "আবার উনিটিকে কেনই বা কষ্ট দেওয়া। আমাদেরও তো বাড়ীর মোটর রয়েচে। বাবু কাছারি থেকে ফিরলেই না হয় তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসত।"

অণিমা কহিল, "কি করবো ভাই, ওঁর ওই রকমই ধরণ। এতটুকুতে এমন ব্যস্ত হয়ে পড়েন, বলবার নয়। আকাশের কোন কোণায় এতটুকু মেঘ জমেচে, আর অমনি তাঁর মাথায় বাজ ভেঙ্গে পড়লো যেন আমার বাড়ী ফিরবার পথ সব দিকেই বন্ধ হয়ে গেল তাতে।"

অণিমাকে এতদিন সুরবালা শিক্ষয়িত্রী শ্রেণীর জীব বলিয়াই গণ্য করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু আজ স্বামীর প্রসঙ্গমাত্রে তাহার মুখে এই যে আরক্ত অপরূপ সলজ্জ আভা খেলিয়া গেল, কণ্ঠস্বরে আবেগ এবং স্নেহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, এ সমস্তই তাঁহার কাছে নূতন লাগিল। সেলায়ের খ্রীশ্চান শিক্ষয়িত্রীর আচরণ উঠিয়া চোখে পড়িল, রহস্যে প্রেমে মধুরতায় মণ্ডিত ঘরোয়া একটি মেয়েকে। মিষ্ট হাসিয়া তাহার কাঁধে একটা হাত রাখিয়া কহিলেন, "আমাদের ভাগ্যে ভাই বরাবর উল্টো হয়ে এসেচে। কর্ত্তারা কাজে গেলে মেঘজলের উপক্রম দেখলে আমরাই ভয়ে ভাবনায় থাকি। আমাদের জন্যে কখনো কাউকে ভাবতে হয়নি।"

স্নিগ্ধ ঘন কালো মেঘের স্তূপে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিগন্ত একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া গেছে। মাঝে মাঝে কালো মেঘের কোল চিরিয়া বিদ্যুতের রেখা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে। সুরবালাও উঠিয়া জানালায় অণিমার পাশে দাঁড়াইয়া মুগ্ধ দৃষ্টিতে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সহসা অণিমা বলিয়া উঠিল, "ওই যে উনি এসেচেন দেখচি।"

সুরবালা দেখিলেন, সুমুখের পতিত জমিটার পুব্ দিকে গুটিকতক আম এবং তেঁতুলের গাছ আছে, তাহারই নীচে একজনের ছাতির একাংশ দেখা যাইতেছে। তখন মেঘ ভাসাইয়া বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা পড়িতে সুরু হইয়াছে। সুরবালা অণিমার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে উনি অমন করে ভিজবেন কেন? বাইরের ঘরে এসে বসুন। আমি চাকর পাঠিয়ে ওঁকে আনাচ্ছি। একটু ব'সবেন, চা-টা খাবেন। ততক্ষণে যদি বৃষ্টি না থামে ভাড়ার গাড়ী ডাকিয়ে দোব।"

চার

বাহিরের ঘরে অণিমার স্বামী নিতাইচরণ চায়ের সঙ্গে গরম গরম হালুয়া মুখে দিতে দিতে কহিল, "বাঃ খাসা জায়গায় চাকরি পেয়েচ। এই রকমই তো চাই।"

অণিমা সামনেই বসিয়া তাহার ব্যগ্র ব্যাকুল দৃষ্টিতে অপলক চক্ষে নিতাইয়ের দিকে চাহিয়া ছিল। এই লইয়া তৃতীয়বার প্রশ্ন করিল, "বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে ছিলে, মাথা-টাথা ভেজাওনি তো? দেখো শেষকালে আমাকে ভাঁড়িওনা যেন। অসুখ বিসুখ হলে সেই আমাকেই তো ভুগে মরতে হবে।"

নিতাই তাহার কথায় লেশমাত্র কর্ণপাত না করিয়া কহিল, "বেশ বেশ, খাসা চাকরি!"

পাশের ঘরে পর্দ্দার আড়াল হইতে সুরবালা দেখিতে ছিলেন, নিতাইয়ের বয়স চল্লিশ হইবে বোধ করি, অন্ততঃ তাহার এদিকে নয়। মাথায় একটা বিপুলায়তন টাক। মুখে নীরেট নির্ব্বুদ্ধিতার ছাপ। অণিমা বিশেষ সুন্দরী না হইলেও, নিতাইয়ের পাশে তাহাকে মানায় না। তথাপি এই বিসদৃশ মিলনই যেন বেশি করিয়া সুরবালাকে আঘাত

করিল। মনে মনে তিনি বলিলেন, হিন্দুই হোক আর খ্রীশ্চানই হোক মেয়ে মানুষের হৃদয় বস্তুটি সর্ব্বত্রই এক। স্বামীকে কায়মনোবাক্যে ভালোবাসিতে সেখানে রূপ গুণ তৌল করিয়া দেখার প্রয়োজন হয় না।

অণিমার জন্য আর এক পেয়ালা চা লইয়া ভৃত্য ঘরে ঢুকিল। অণিমা তাহার হাত হইতে পেয়ালাটা গ্রহণ করিয়া নিজে না খাইয়া নিতাইকে প্রশ্ন করিল, "খাবে আর এক পেয়ালা চা? যতই হেসে উড়িয়ে দাও, আমি বলচি তোমার ঠাণ্ডা লেগেচে। গরম চায়ে উপকার পাবে।"

নিতাই নির্ব্বিকার ভাবে কহিল, "দাও।"

কিছুক্ষণ পরে ঝি আসিয়া অণিমাকে কহিল, "মা আপনাকে একবার ভিতরে ডাকচেন।"

পর্দ্দা সরাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিতেই সুরবালা হাসিয়া লুটাইয়া পড়িয়া কহিলেন, "কি গো, নিজের সবই বুঝি এমনই করে বিলিয়ে দিতে হয়। কেবল চা নয়, নিজেকে শুদ্ধ এমনি করে।" অণিমা অত্যন্ত লজ্জা পাইয়া চুপ করিয়া রহিল। সুরবালা সস্নেহে তাহার চিবুকে অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া কহিলেন, "মনে কিছু কোর না বোন, তামাসা করলুম বই তো নয়। কিন্তু এই তো চাই, মেয়েমানুষে স্বামীকে এমনি করে সকল দিয়ে ভালোবাসবে তবেই তো মেয়েমানুষে শান্তি পাব। কি বলো ভাই? কিন্তু তা জিজ্ঞাসা করবার আর প্রয়োজন কি, তোমার চেয়ে ভালো করে আর তা কে জানে?"

ভোলা চাকর আসিয়া খবর দিল ভাড়ার গাড়ী আসিয়াছে।

কিছু দূর আসিবার পর নিতাই স্যাকরাগাড়ীতে আরাম করিয়া হেলান দিয়া বসিয়া কহিল, "অনু, তোমার ছাত্রী খাসা দেখতে! বাঃ, রূপের জৌলুষ এমন যে, দু'দশ মিনিট তাকিয়ে দেখতে হয়।"

অণিমা চকিত হইয়া প্রশ্ন করিল, "তিনি তো বরাবর পর্দ্দার আড়ালে ছিলেন, তুমি আবার তাঁকে দেখলে কখন?"

নিতাই ঘাড়টা এদিকে ওদিকে দোলাইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে কহিল, "চোখ থাকলে আর দেখতে জানলেই দেখা যায়। তোমরা যখন দু'জনে জানালার কাছে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে তেঁতুলতলার দিকে চেয়ে ছিলে তখনই দেখেচি। দূর থেকে যদিচ খুব ভালো করে দেখা গেল না……"

অণিমা বাধা দিয়া কহিল, "থাক, আর ব্যাখ্যা করতে হবে না। শুধু লেখা পড়াই শিখেচ, এখনও কথা বলতে শিখলে না।"

"আহা কী দোষ করলুম! দোষের মধ্যে দোষ হয়েচে এই যে, সুন্দরীকে সুন্দরী বলেচি। তা বোলব না?"—তাহার পরে আকর্ণ বিস্তৃত হাস্য করিয়া নিতাই পুনশ্চ কহিল, "তবু তো সুন্দরীর সাক্ষাতে বলি নি। অসাক্ষাতে বলেচি।"

অণিমা আর কিছু বলিল না। নিরুত্তরে গাড়ীর জানালা দিয়া বাহিরের পানে চাহিয়া রহিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই স্যাকরাগাড়ী তাহাদের বাসার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। একটা একতালা ক্ষুদ্র জীর্ণপ্রায় বাড়ী। দুয়ারের কুলুপ খুলিয়া তাহারা ভিতরে প্রবেশ করিল। ঠিকা ঝিটা বোধ করি ঝড়জলের অজুহাতে আসে নাই। কলতলায় এঁঠো বাসন পড়িয়া আছে। বৃষ্টির জলের ছাঁট আসিয়া শয়ন গৃহের লেপ বালিশ মশারি কিছু কিছু ভিজাইয়া দিয়া গিয়াছে। জানালা কয়েকটা খোলা হাঁ হাঁ করিতেছে। বৃষ্টির সময় কেহই বন্ধ করে নাই। যতদূর পারা যায় ঘর দুয়ারের সংস্কার সাধন করিতে করিতে অপ্রসন্ন মুখে অণিমা কহিল, "সারাদিন এই ঘুরে বেড়ান, তার পরে বাড়ীতে ফিরে এসেও যদি এমনই করে আগাগোড়া সব করতে হয়, তাহলে আর তো পারি নে।"

নিতাই একটা বিড়ি টানিতে টানিতে কহিল, "না পারলে করবে কে? তোমার ঘরকন্নার কাজ আমাকে করে দিতে হবে না কি? দু'পয়সা উপার্জ্জন করতে শিখলেই মেয়েদের এমনই বাড় হয় বটে। দাও দেখি এখন একখানা শুক্‌নো তোয়ালে বার করে?"

অণিমা নূতন করিয়া বালিশে শুষ্ক ওয়াড় পরাইতেছিল, তোয়ালের কথায় হাতের কাজ ফেলিয়া নিতায়ের একান্ত সন্নিকটে সরিয়া গিয়া উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "কেন তোয়ালে নিয়ে কি হবে? দেখি, বৃষ্টিতে মাথাটি বেশ দিব্যি করে ভিজিয়েচ তো?…আচ্ছা এখন চুপ করে বসে

থাক, বেশি রাহাদুরিতে কাজ নাই। আমি ভালো করে মুছিয়ে দিই।"

পাঁচ

বৈশাখের শেষের দিকে ঝড়জল তো অপরাহ্নের দিকে প্রায় লাগিয়াই আছে। এই কয়েক দিন উপর্য্যুপরি তাহাই হইয়া চলিয়াছে। আর নিতাইও ছাতা হাতে এই দুর্য্যোগের মাঝে প্রতিদিন স্ত্রীকে আনিতে যাইবার জন্য বিপুল অধ্যবসায় দেখাইতেছে। সুরবালা আমোদ পাইয়া বলেন, "ঐ দেখ ভাই আজও তোমার কর্ত্তাটি ছাতি হাতে জলে ভিজতে ভিজতে এসে উপস্থিত। ঠিক সময়টি হ'লেই মনে টান ধরে, নিরস্ত থাকতে পারেন না। কিন্তু এত কষ্টের তো কোন দরকার ছিল না। আমি ত বলে রেখেচি, যেদিনই জলঝড় হবে আমাদের বাড়ীর মোটর তোমাকে রেখে আসবে।"

অণিমা এ সকল কথার কোন উত্তর দেয় না। সুরবালার মিষ্ট পরিহাসের কোন প্রত্যুত্তর করে না। মুখ নীচু করিয়া আড়ষ্ট ভাবে বসিয়া থাকে। সুরবালা মনে করেন, সকলের সমক্ষে স্বামীর এই প্রকাশ্য ব্যাকুলতায় বেচারী মনে মনে লজ্জা পাইতেছে।

নিতাইকে আজকাল গাছের তলা হইতে ডাকিয়া পাঠাইবারও প্রয়োজন হয় না, কিংবা সে নিজেও ডাকের জন্য অপেক্ষা করে না। আপনা হইতেই ভিজা ছাতিটা মুড়িয়া ক্যাম্বিশের অর্দ্ধচ্ছিন্ন জুতার তলায় প্রচুর কর্দ্দম চিহ্ন অঙ্কিত করিতে করিতে সোজা বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া সদরের ঘরে বসে। হাঁক দিয়া বলে, "কই হে ভোলা একটা গামছা কি তোয়ালে কিছু দাও দেখি। ইঃ, মাথাটা একেবারে ভিজে গেছে। ছাতিতে কি এ বৃষ্টি আটকায় হে। আর অমনি বৌঠানকে ব'লো এই বাদলের দিনে গরম গরম চায়ের সঙ্গে কিছু....."

সুরবালা হাসিয়া প্রতিদিন সস্নেহে সযত্নে চা, খাবার বাহিরের ঘরে পাঠাইয়া দেন। সেদিন বিকালে মেঘের লেশমাত্র ছিল না। কিন্তু অণিমা অত্যন্ত চঞ্চল হইয়াছিল। আজ কয়েক দিন হইতেই তাহার ভাবান্তর দেখা যাইতেছে। পূর্ব্বের মত বাজে গল্প এবং হাসি তামাসা লইয়া ক্ষণে ক্ষণে উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে না। আচরণ আড়ষ্ট। অত্যন্ত কর্ত্তব্যপরায়ণা শিক্ষয়িত্রীর মত শুধু কাজের মধ্যেই নিমগ্ন হইয়া থাকে। ফ্রীল লাগাইবার যন্ত্রটা সে সুরবালাকে আয়ত্ত করিতে শিখাইতেছিল এবং কাজের ফাঁকে ফাঁকে প্রায়ই জানালার কাছে আসিয়া কি যেন একটা দেখিবার চেষ্টা করিতেছিল। হঠাৎ যাহা শিখাইতেছিল তাহা অসমাপ্ত রাখিয়াই উঠিয়া পড়িয়া কহিল, "আজ থাক ভাই। আজ শরীরটা তেমন ভালো নাই, বাকীটুকু কাল এসে দেখিয়ে দেব।" অণিমা চলিয়া গেল। আজকাল তাহার সর্ব্বদাই কেমন ব্যস্ত সমস্ত ভাব। আগের মত আর প্রত্যেকটি জিনিষ ধৈর্য্যের সহিত অনেকক্ষণ ধরিয়া শিখায় না। জানালার নিকট দাঁড়াইয়া এই কথাটাই সুরবালা ভাবিতেছিলেন, দেখিলেন, অণিমা দ্রুতপদে আম্রতলায় একটি বিশেষ ছাতির উদ্দেশে চলিয়াছে। তাঁহার সমস্ত মুখ মিষ্ট হাসিতে ভরিয়া উঠিল। আজও তাহা হইলে নিতাই-বাবুর ত্বরা সহে নাই। যদিচ আকাশে মেঘ নাই তথাপি তাড়াতাড়ি স্ত্রীকে আগাইয়া লইতে আসিয়াছেন। যদিও নিতাই বয়সে তরুণ নয়, দেখিতে প্রিয়দর্শন নয়, তবু স্ত্রীর জন্য তাহার এই ব্যগ্র অধীরতা, প্রেমের এই অদর্শন-অসহনীয়তা তাঁহার ভারি মিষ্ট লাগিল।

পথে চলিতে চলিতে অণিমা তীব্রস্বরে কহিল, "আজ আবার তুমি কেন এসেছিলে? আজ তো আকাশ পরিষ্কার। জল-ঝড়ের চিহ্নও নাই।"

নিতাই সরস ভাবে হাসিয়া কহিল, "আহা, আজ আমার কপালে নেই,—নইলে দুচার ফোঁটা বৃষ্টি পড়লেই এক পেয়ালা গরম চা আরও হয়তো তার সঙ্গে কিছু জুটে যেত। তুমিই বা অত হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এস কেন? জলে তো আর পড়ে নেই। সেটাও ভদ্রলোকের বাড়ী। যেতুম, বসতুম। চা-টা খেতুম, তার পরে তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতাম।"

অণিমা কোন কথা না বলিয়া একবার জ্বলন্ত দৃষ্টিতে নিতায়ের দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে পথ চলিতে লাগিল। তাহার পরের দিন সময় বদলাইয়া সকাল বেলায় সে সুরবালার বাড়ীতে সেলাই শিখাইতে আসিল। সুরবালা তখন গৃহকাজে ব্যস্ত ছিলেন। আসিয়া কহিলেন, "আজ সকাল

বেলায় কেন?" অণিমা সংক্ষেপে কহিল, "বিকেলের দিকে আজকাল রোজই ঝড়-জল হয়।" সুরবালা হাসিয়া ফেলিয়া কহিলেন, "আর বারণ সত্ত্বেও কর্ত্তাটি রোজ জলে ভেজেন। সেটা কোন মতেই প্রাণে সয় না।" এই ধরণের হাসিতামাসা অণিমা কিছুতেই সহিতে পারে না। তাহার সমস্ত মনে জ্বালা ধরে। তথাপি কোন উত্তর না দিয়া যথাসাধ্য আপনাকে সংবরণ করিয়া রহিল।

সুরবালা তখন বলিতেছেন, "কিন্তু ভাই এ সময়ে সকালবেলায় আমার নিঃশ্বাস ফেলবার অবসর নাই। দু' একখানা নিজে না রাঁধলে উনি খেতে পারেন না, ভাতের কাছে নামমাত্র বসেন শুধু। তাছাড়া আরও কতো কাজ রয়েচে। এখন তো আমাকে দিয়ে সেলাই শেখানো হবে না। তুমি আগের মত বিকেলেই এসো। বরঞ্চ তোমার কর্ত্তাটিকে কিঞ্চিৎ শাসন করে দিও, অনর্থক জলে যেন না ভেজেন।" অণিমা তিক্ত স্বরে কহিল, "আমারও আর সুবিধে হবে না। ওসব নাটুকে ধরণের কথাবার্ত্তায় আর আমার কাজ নেই ভাই। আমি চললুম আর আসবো না।" সুরবালা অবাক হইয়া তাহার দিকে চাহিলেন। কিন্তু তিনি অণিমাকে যতই স্নেহ করুন, এক নিমেষের জন্যও আপনার পদমর্য্যাদা ভোলেন নাই। তাই এত আন্তরিক যত্ন ভালোবাসার পরিবর্ত্তে এই অকিঞ্চিৎকর খ্রীশ্চান মেয়েটার মুখে এমন উদ্ধত কথা শুনিয়া তাঁহার আত্মসম্ভ্রম-শালিনী গৃহিণীগর্ব্বে ঘা লাগিল। কহিলেন, "বেশ তো তোমার যদি সুবিধে না হয় আমি একটা দিনও তোমাকে জোর করে ধরে রাখতে চাইনে।" ইহার পর অণিমা আর দ্বিতীয় কথার জন্য অপেক্ষা না করিয়া দ্রুতপদে সেখান হইতে চলিয়া আসিল। ইহাতে আরও আহত হইয়া সুরবালা তখনই আর্দ্দালিকে ডাকিয়া একখানা দশ টাকার ও একখানা পাঁচ টাকার নোট খামে পুরিয়া অণিমার নাম ও ঠিকানা লিখিয়া তাহার এই মাসের মাহিনা চুকাইয়া পাঠাইয়া দিলেন।

একটা হাতল-ভাঙ্গা চেয়ারে বসিয়া নিতাই সাপ্তাহিক বঙ্গবাসী পড়িতেছিল। অণিমাকে ঢুকিতে দেখিয়া প্রশ্ন করিল, "আজ সকালে যে? হালদার গিন্নীর হাত থেকে আজ এত সহজে ছাড়া পেলে? অন্য দিন ফিরতে দশটা বেজে যায়।"

"না, আজ সকালে সুরবালার ওখানে গিয়েছিলুম।"

"তাঁর বাড়ীতে সকালে গিয়েছিলে!" নিতাই সোজা হইয়া বসিল। তাহার কাছে মেঘমুক্ত এই প্রসন্ন সকাল-বেলার আলো নিতান্ত বিস্বাদ, ঝাপসা ঠেকিল। এতক্ষণ কার্য্যাভাবে বসিয়া বসিয়া সে বঙ্গবাসীর বিজ্ঞাপন উলটাইয়া পালটাইয়া দেখিতেছিল, আর ভাবিতেছিল, আর ঘণ্টা দুই পরে স্নানাহার সারিয়া একবার গড়াইয়া লইতে পারিলেই বিকাল হইয়া আসিবে। তখন ভালো কাপড় জামা যাহা আছে পরিয়া অণিমাকে তাঁহার বাড়ী হইতে আনিতে যাইতে পারিবে। তাহারও পরে নিতাই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যান করে, পর্দ্দার আড়ালে সেই লক্ষ্মীর মত শুভ্র পা দুইখানির একটুখানি অলক্তকরাগও কি চোখে পড়িবে না? আর তাঁহারই আপন হাতের তৈয়ারী সোণার রঙের চায়ের আস্বাদ, তাহাতে জড়াইয়া আছে তাঁহারই অমৃতগন্ধ। এত আশা এত কল্পনা অণিমার একটা কথায় ভাঙ্গিয়া গেল। আজ সেখানের কাজ শেষ হইয়া গেছে—কোন ক্রমেও আর সেখানে যাইবার উপায় নাই। অণিমা উদ্ধতভাবে কহিল, "তোমার মুখ অমন শুকিয়ে উঠ্‌লো কেন? আমি সেখানকার কাজ ছেড়ে দিয়েচি।" নিতাই এমন করিয়া তাহার দিকে চাহিল যে তাহার দৃষ্টিতে অণিমাকে যেন ভস্ম করিয়া ফেলিবে।

ছয়

রাত্রিতে বিছানায় শুইয়া নিতাই দাঁতে দাঁত ঘষিয়া কহিল, "বলি অমন কাজটা ছেড়ে দেওয়া হোল কেন? মাসে পনেরটা করে টাকা আসে কোথা থেকে শুনি?"

অণিমা অন্ধকারে পাশ বালিশটা সজোরে আঁকড়াইয়া কহিল, "টাকার কথা আমাকে প্রশ্ন কোরো না। স্ত্রীলোকের উপার্জ্জনে দিব্য দিনের পর দিন কেমন করে আরামে আছ, আমি যখন ভাবি, তখন অবাক হয়ে যাই। কিন্তু টাকার কথা বাদে, ওখান থেকে বিদায় নিতে আমার নিজেরই কি কম কষ্ট হয়েচে। কিন্তু অমন কাজটাও শেষে তোমার জন্যে ছেড়ে দিতে হোল।"

নিষ্ফল আক্রোশে ফুলিতে ফুলিতে নিতাই কহিল, "ওঃ, তেজের বহর দেখ! কেন তুমি কি আমার বিয়ে করা পরিবার যে তোমাকে সম্মান করে পায়ের উপর পা দিয়ে বসে খাওয়াতে হবে? আমার জন্যে ওঁকে ছেড়ে

দিতে হোল কাজ, ওরে আমার সতীলক্ষ্মীরে, ওনাদের আবার ঈর্ষা!"

অপমানে বেদনায় অণিমার মুখ পাংশু হইয়া গেছে। নিষ্প্রভ দুটি চোখের কোল বাহিয়া অন্ধকারে অজস্র অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে।

সেদিন রবিবার, অফিস যাইবার তাড়া ছিল না। হরকুমার গয়নার একটা ক্যাটালগ হাতে অন্তঃপুরে আসিয়া কহিলেন, "সুরো, একটা নূতন ধরণের গয়না পছন্দ করে রাখ। দিদি যেমন করে ধরেচেন, তাতে তাঁর মেয়ের বিয়েতে যেতে হবেই।"

ক্যাটালগ দেখিতে দেখিতে সুরবালা কহিলেন, "দেখ কোথাও বেরিয়ে যেও না যেন। তোমার কাছারি যাবার শার্ট কম পড়েচে। আমি দর্জ্জিকে ডাকতে পাঠিয়েচি। আজ রবিবার, ধীরে সুস্থে মাপ নিয়ে যাক।"

"কিন্তু সুরো, তুমি বলেছিলে নিজের হাতে আমার কাছারির শার্ট তৈরী করে দেবে।"

"সে আর হয়ে উঠ্‌লো কই। যে মেয়েটির কাছে সেলাই শিখতুম সে কাজে জবাব দিয়েচে।"

"কে? সেই অণিমা গুপ্ত না কি, সেই তো?"

"হ্যাঁ, সেই।"

"তা বেশ করেচে যে নিজের থেকে কাজ ছেড়ে দিয়েচে।"

"কেন গো?"

"অমন স্বভাব চরিত্রের মেয়েদের ভদ্র ঘরে ঢুকতে না দেওয়াই ভালো।"

"কেন তার স্বভাব তো বরাবর ভালোই লক্ষ্য করেচি।"

—নিতাই আর অণিমার পরস্পরের জন্য অধীরতার কথা স্মরণ করিয়া সুরবালার হাসি পাইল।

"ছাই ভালো। কাল বার লাইব্রেরীতে শুনলুম, সিঙ্গার কোম্পানীতে চাকরী করে অণিমা গুপ্ত বলে একটা খ্রীশ্চান মেয়েকে নিতাইচরণ নামে একটা লোক বার করে নিয়ে এসে স্বামী-স্ত্রী পরিচয়ে এই সহরেই বাস করচে। দেশের বাড়ীতে নিতায়ের চিররুগ্ন স্ত্রী আজও মরে নাই, তাই কোন আইনের মতেই আর মেয়েটাকে বিয়ে করা ঘটে ওঠে নি।"

সুরবালার মুখ কালো হইয়া উঠিল। এ কী লজ্জা! ছি ছি, সেই নিতাইটা তাঁহার স্বামীর বৈঠকখানা ঘরে তাঁহারই আরাম কেদারায় দিব্য করিয়া বসিয়াছে,—তিনি যে পেয়ালায় চা খান, হয়তো বা সেই পেয়ালাতেই চা খাইয়াছে। সুরবালা নিজে অবশ্য পাথরের পাত্রে চা খান, কিন্তু স্বামীর বিচারজ্ঞান আদৌ নাই বলিয়া খ্রীশ্চান অতিথির জন্য তাঁহার ব্যবহৃত টিসেট বাহির করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। আর অণিমা! সে তো পাণের ডিবা হইতে সুরু করিয়া কি না স্পর্শ করিয়াছে, একসঙ্গে গা ঘেঁষিয়া বসিয়া কত গল্প-গাছা করিয়াছে। অপরিসীম গ্লানিতে তাঁহার নিরন্তর মনে হইতে লাগিল, তাঁর ঘর দ্বার তাঁর জিনিষপত্র তাঁর ঘরকন্না গৃহস্থালী সমস্তই যেন একটা অদৃশ্য নোঙরা হস্তের স্পর্শে অশুচি হইয়া গেছে। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে কহিলেন, "কিন্তু হ্যাঁগো, শুধু আমারই তো নয়, এমন করে ঠকিয়ে সে আরও কত ভদ্রলোকের বাড়ী ঢুকেচে।"

হরকুমার কহিলেন, "তা ঢুকেচে, কারণ, এতদিন জানতে পারা যায় নাই। কিন্তু দিন কতক আগে নিতাইচরণ লোকটা খুব ঝগড়া-ঝাঁটি করে সমস্ত কথা প্রকাশ করে দিয়ে কোথা চলে গেছে।"

সুরবালার দৃষ্টি যাইয়া পড়িল, অদূরে রক্ষিত সেই সেলায়ের কলটার উপরে। নিবিড় ঘৃণায় তাঁহার সমস্ত মন আর একবার মথিত হইয়া উঠিল। ওই সেলায়ের কলটায় কাজ করিতে করিতে সেই ভ্রষ্টা স্ত্রীলোকটা তাঁহার সঙ্গে কতই না গল্প-গুজব, কত হাসি-ঠাট্টা করিয়াছে। নিতাইয়ের কথা লইয়া তাহাকে তিনি কত সুমধুর পরিহাসে এবং কটাক্ষবাণে বিদ্ধ করিয়াছেন। কোল হইতে ক্যাটালগটা নামাইয়া রাখিয়া কহিলেন, "গয়না থাক। আমি বলি পুঁটুর বিয়েতে গয়নার বদলে ঐ সেলায়ের কলটাই দিই। আজকালকার কনে ওতেই খুসী হবে বেশি।"

হরকুমার ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "সে কি, সেদিন ওটা অত সখ করে কিনলে, এত উৎসাহ করে সেলাই শেখা চলছিল। এরই মধ্যে মিটে গেল সখ?"

সুরবালা বলিলেন, "সখ না মিটে থাকলেও আমার আর দরকার নাই। আমার ঘরকন্নার মাঝে ওটাকে আমি কোন মতেই রাখতে পারব না। না না, কিছুতেই নয়।"

হরকুমার মুখে বলিলেন, "যাও—এ আবার তোমার বাড়াবাড়ি।" কিন্তু মনে মনে খুসী হইলেন। সাধ্বী স্ত্রীদের অবিচলিত নিষ্ঠা এবং পবিত্রতা জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধায় অভিভূত হইয়া মস্তক নত করিলেন।

অধ্যাপক এডিংটনের "অধ্যাত্মভাণ্ড"

অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যকুমার নাগ এম-এ

যে দিন হইতে অধ্যাপক এডিংটন, জেম্‌স জিন্‌স্ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ জড়বিজ্ঞানের নাট্যশালায় আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন, সেই দিন হইতেই জড়বৈজ্ঞানিক জগতে এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। সবাই মিলিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আমরা জড় সম্বন্ধে এমন কিছু জানিয়া ফেলিয়াছি যে আমাদিগকে আর জড়বাদী বলা চলে না।" আধুনিক জড়বৈজ্ঞানিকদের এই সাফাই পাইয়া প্রাচীন বৈজ্ঞানিকগণ একেবারেই মাথায় হাত দিয়া ফেলিলেন। তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন, "জড়ের স্বরূপ আবার কি? জড় ত চিরদিনই জড়। তাহার আবার চেতন কোথায়? জড়বাদ কি করিয়া মিথ্যা হইল?"

জড়বিজ্ঞানের যে গোড়ার কথা তাহাতেই এডিংটন আপত্তি তুলিলেন। জড়বিজ্ঞানের মতে মন ও প্রকৃতি, জড় ও চেতন এ দুইটি আলাদা বস্তু। এডিংটন এই কথাটাতেই আপত্তি তুলিয়া বলিলেন, "আমরা সর্ব্বপ্রথমে একমাত্র আমাদের মনকেই জানি।" তিনি আরও বলিলেন যে এই মনের ভিতরেই আমরা বাহ্য জগৎ প্রতিবিম্বিত দেখিতে পাই। বাইরে যদি কোন দুনিয়া আদৌ থাকে তবে তাহা আমাদের মনের রূপে রূপান্তরিত হওয়ার পর আমরা জানিতে পারি। বাহিরের জগৎ মনের মধ্যে এক একটা দ্বীপ তৈরী করে। পরে এই দ্বীপপুঞ্জ আমাদের জ্ঞানে পরিণত হয়। আমরা মন ছাড়া কিছুই জানি না। বাইরের জগৎ বলিয়া যাহা কিছু বলিয়া থাকি তাহাও মনের মধ্যেই জানিয়া থাকি। অতএব এই দুনিয়াটা মনোময়। মনের গুণ চৈতন্য। অতএব দুনিয়াটা চৈতন্যময়। জড় ও অচেতন বলিয়া কোথাও কিছু নাই।

উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত জড়বিজ্ঞানের যাহা গোড়ার কথা তাহাকে অধ্যাপক এডিংটন এই ভাবেই আঘাত করিলেন। উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত জড়ে ও চেতনে বেশ একটা তফাৎ দেখা যাইতেছিল। বিংশ শতাব্দীর তীব্র জ্ঞানালোকে জড়ের মধ্যেও চৈতন্য সঞ্চারিত হইয়াছে। জড় ও চেতন আর দুই নাই। তাহাদের বিবাদ বিসম্বাদ মিটিয়া গিয়াছে। এডিংটন তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন, "আমরা দেখিতে পাইয়াছি যে বিজ্ঞান যতই অগ্রসর হইয়াছে ততই মন প্রকৃতির মধ্যে যাহা কিছু ন্যস্ত রাখিয়াছিল তাহাই ফিরিয়া পাইতেছে।" অতএব দুনিয়াটা যে মনেরই তৈরী সে বিষয়ে তাঁহার অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত জড়বিজ্ঞানের যে সিদ্ধান্ত সেই সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। এক কলেজে এক পরিদর্শক গিয়া ছাত্রদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "জড় কি?" (What is matter)? একটি ছাত্র তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল "মন নাই" (Never mind)। পরিদর্শক ছাত্রের মনোভাব বুঝিতে না পারিয়া একটু বিরক্ত হইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "মন কি?" (What is mind?) ছাত্রটি বলিল, "জড় নহে" (No matter)। পরিদর্শক চটিয়া গেলেন। তিনি মনে করিলেন তাঁহার কথা ছাত্রটি গ্রাহ্য না করিয়াই Never mind ও No matter বলিয়াছে। পরিদর্শকের বিরক্তি দেখিয়া ছাত্রটি বলিলেন, "দেখুন জড় (matter) ও মন (mind) কখনও এক জিনিষ হইতে পারে না। সুতরাং মন কখনও "জড় নহে" এবং জড়েও কখনও "মন নাই।" দুইয়ের স্বরূপ কখনও এক হয় না।" পরিদর্শক ছাত্রটির কৌশলপূর্ণ উত্তরের প্রশংসা করিলেন।

বাস্তবিক উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান এমন করিয়াই জড় ও চেতনকে দুইটা অন্ধকূপের মধ্যে আটকাইয়া রাখিয়াছিল, ঠিক যেমন দেবকী ও বসুদেবকে মিলিতে না দিয়া কংস দুইজনকেই শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছিল। কৃষ্ণ গোকুলেই বাড়িতেছিলেন। এগার বছর পূর্ণ না হইতেই কংসকে হাতীর দাঁত দিয়া ধ্বংস করিয়া তাঁহাদের মিলন সাধন করিলেন। এডিংটন ও জেম্‌স জিন্‌স্ কালের কোলেই বাড়িতেছিলেন। বিংশ শতাব্দী আসিতে আসিতেই তাঁহারা জড় ও চেতনের মধ্যে মিলন ঘটাইলেন। জড়বিজ্ঞানকে অধ্যাত্মবিজ্ঞানে পরিণত করিলেন। বিংশ শতাব্দীর চরম প্রতিভার পরিচয় দিলেন। এডিংটন বলিলেন, "এই দৃশ্যমান জড়জগতের অন্তরালে একটা অজানা সত্তা আছে। উহাই আমাদের মনের সত্তা।" জেম্‌স্ জিন্‌স্ বলিলেন, "ঈশ্বর এই দুনিয়াটাকে গণিতের নিয়মে সৃষ্টি করিয়াছেন।" জড়বিজ্ঞানের অণু, পরমাণু ও বিদ্যুতণু সব আসিয়া মনের সংস্কারে পরিণত হইল। মনই অণু, মনই পরমাণু, মনই বিদ্যুতণু। সব মনেরই বিভিন্ন অবস্থা। মন যতই অনুভব করে, অনুভূতি ততই সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া থাকে।

বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া অধ্যাপক এডিংটন দেখাইতে লাগিলেন যে আমরা বাহির হইতে যাহা কিছু জানি তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কতকগুলি সম্পর্কমাত্র বিদ্যমান। বস্তুতঃ কোন একটা কিছু জানা মানে তাহার সহিত অন্যান্য বস্তুসমূহের সম্পর্ক সম্বন্ধে অবগত হওয়া। একটি টেবিল কি তাহা জানিতে হইলে তাহার সহিত চেয়ার, টুল, কাগজ, কলম ও অন্যান্য সমুদয় বস্তুর সম্বন্ধ কি তাহা জানিতে হয়। এই সম্পর্কগুলি বাহির হইতে কেহ আমাদিগকে জানাইয়া দেয় না। জিনিষের প্রয়োজন বোধটা আমাদেরই। কাজেই একটা জিনিষের সহিত আর একটা জিনিষের যে সম্পর্ক তাহা আমরাই জানি।

তাহা ছাড়া আরও অনেক কথা আছে। প্রত্যেক জিনিষের তিনটি পরিমাণ আছে; যথা, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা। অধ্যাপক আয়েনষ্টিন আর একটি পরিমাণের কথা বলিয়াছেন। সেইটি হইতেছে "কাল।" প্রতি দ্রব্যের ভিতরই কাল অবস্থান করিতেছে। যাহা হউক, বর্ত্তমানে

আমরা যে চারিটি পরিমাণের কথা পাইলাম, প্রত্যেকটি দ্রব্য জানিতে হইলে এই চারিটির জ্ঞান আমাদের থাকাই চাই। কাজেই কোন একটা দ্রব্য জানিতে হইলেই তাহার পরিমাণসমূহ, সেই দ্রব্যের সেই পরিমাণের সহিত সম্পর্ক, সেই দ্রব্যের সহিত অন্যান্য দ্রব্যের সম্পর্ক এবং তদুপরি জ্ঞাতার সহিত সেই দ্রব্যের মূল্য কি এই সমস্তই জানিতে হয়। এই সব না জানিয়া কোন একটা জানাকে জানাই বলা যাইতে পারে না। অতএব সম্পর্ক নির্ণয় করিতে গিয়া বৈজ্ঞানিক দেখিতে পান যে প্রত্যেকটি দ্রব্য গণিতের নিয়মে গড়া। ইহার মধ্যে কোন গোঁজামিল বা অসামঞ্জস্য নাই। দুনিয়ার প্রত্যেকটি জিনিষের সাথেই অপর জিনিষগুলির সম্বন্ধ আছে। এই দুনিয়া সম্বন্ধে যতই আমরা গবেষণা করি, ততই এই সম্পর্কগুলি আমাদের নিকট ধরা দেয়। তখন আমরা বুঝিতে পারি আমাদের মনের মধ্যে যে সম্পর্কের ধারণা রহিয়াছে এই বিশ্বজগৎ তাহারই প্রকাশ। এই বিশ্বজগৎ যেন আমাদের মনেরই ছায়া।

সালিভ্যান (Sullivan) একবার ম্যাক্স্ প্ল্যাঙ্কের (Max Planck) সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনি কি মনে করেন যে চেতনকে জড় বা জড়ীয় নিয়মে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে?" প্ল্যাঙ্ক উত্তর করিলেন, "না। আমি চেতনকেই প্রধান মনে করি। আমার আরও মনে হয় যে জড় চেতন হইতেই অনুস্যূত হইয়া থাকে। চেতনের বাহিরে আমরা কখনও যাইতে পারি না। যাহা কিছু সম্বন্ধে আমরা কথা বলিয়া থাকি, যাহা কিছু আছে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি সকলেরই মূলে আছে সেই চেতন।" প্ল্যাঙ্কের উপরিউক্ত কয়টি কথাই এডিংটনের মতবাদের সারাংশ ধরা যাইতে পারে। চেতনই সব। চেতন ছাড়া কোথাও কিছুই নাই। যাহাকে জড় বলা যায় তাহাও চেতনের মধ্য দিয়াই আমাদের নিকট ধরা দেয়। জড় চেতনের নিয়ম দিয়াই গড়া। জড়ের ভিতর যে গণিত বা সম্পর্ক আছে তাহা মনেরই দেওয়া। সম্পর্কের কেন্দ্র হইতেছে মন। সম্পর্ক নির্ণয়ই গণিতের কার্য্য।

যখনই আমরা কিছু জানিতে চাই তখনই আমাদের মন যেন সেই জিনিষটার একটা ছবি বা ফটো তুলিয়া লয়। মনের এই ছবিগুলিই আমাদের জ্ঞানের উপাদান। তবে এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে বাস্তবিকই মনের ছবিগুলি ব্যতীত আর কিছুই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আছে কি না। যদি কিছুই না থাকে তবে মন কাহার ছবি তুলিয়া থাকে। বাহিরের জগতের কোন একটা কিছু সত্তা না থাকিলে মন কেমন করিয়া তাহার ছবি তুলে? এডিংটন বলিয়াছেন যে বাহ্যিক জগতের একটা সত্তা আছে বটে; কিন্তু তাহার প্রকৃতি নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তবে এই বাহ্যিক জগৎ আমাদের মনে প্রতিবিম্বিত না হইলে আমরা তাহাকে জানিতে পারি না। একটি বিষয় জানিবার সময় মনের ভিতর তাহার যে রূপটুকু আমরা পাই আমরা তাহাই শুধু জানি। কাজেই সর্ব্বদাই আমরা আমাদের মনের মধ্যে কতকগুলি ছবি পাইয়া থাকি। এই ছবিগুলি সর্ব্বদাই আমাদিগকে আংশিক জ্ঞান দেয়। মনের এই আংশিক জ্ঞানগুলির মধ্যে পরস্পরের যে সম্পর্ক তাহাই বৈজ্ঞানিকগণ নির্ণয় করিয়া থাকেন। এই সম্পর্ক নির্ণয়ের কাজটাকে এডিংটন গণিত-মূল বৈজ্ঞানিকের (Mathematical Physicist) কাজ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এডিংটন যতই যুক্তি দিতে লাগিলেন, ততই দেখাইতে লাগিলেন যে "নীরেট জড়" (Inert matter) বলিয়া বিশ্বে কিছুই নাই। তিনি বলিয়াছেন, "বিজ্ঞান অণুর মূল প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারে না। পৃথিবীর অন্যান্য বস্তুও মনেই প্রতিফলিত হয়, অণুও তেমনি মনের মধ্যেই প্রতিফলিত হয়।" বস্তুতঃ, এডিংটনের মতে অণু, পরমাণু, বিদ্যুতাণু বা জ্যোতিরণু সবই মনের উপাদানে গড়া। অতএব, অণুই যে জড়জগতের মূল উপাদান তাহার কোনই অর্থ হয় না। সেই জন্যই তিনি বলিয়াছেন, "বৈজ্ঞানিক প্রবহমান তরল পদার্থ হইতে শক্ত পদার্থে আসিয়া উপনীত হইলেন, তার পর শক্ত পদার্থ হইতে অণুতে আসিয়া পৌঁছিলেন, অণু হইতে বিদ্যুতাণুতে আসিলেন। সেখানে আসিয়া তাঁহারা সবই হারাইয়া ফেলিলেন।" এডিংটন জড়বৈজ্ঞানিকদিগকে একটু টিট্‌কারী করিয়াই বলিয়াছেন, যে জড়বৈজ্ঞানিকগণ কোন একটা কিছু পাওয়া মাত্রই চীৎকার করিয়া উঠেন, "এই ত শেষ সীমা। সমস্ত দ্রব্য ইহাতেই পরিণত হইবে। ইহাই ত চরম সত্য।" বাস্তবিক যখনই বৈজ্ঞানিকগণ কোন একটা কিছু ধরিতে পারিয়াছেন তখনই তাঁহারা তাহাকে একেবারে শেষ-সীমা মনে করিয়া ফেলিয়াছেন। এইরূপে প্রত্যেক দ্রব্য ভাঙিয়া ভাঙিয়া যখন তাঁহারা অণুতত্ত্বে (Atomism) উপস্থিত হইলেন তখন তাহাকেই জড়ের উপাদান মনে করিলেন। আবার যখন অণুর ভিতরেই যথাক্রমে পরমাণু, বিদ্যুতাণু, জ্যোতিরণু প্রভৃতি দেখিতে লাগিলেন তখন তাহাদিগকে জড়ের উপাদান বলিয়া ধরিয়া লইলেন। এই সব দেখিয়া অধ্যাপক একটু বিদ্রূপ করিয়াই বলিয়াছিলেন, "জড়বৈজ্ঞানিকগণ তরল পদার্থ হইতে শক্ত পদার্থে, শক্ত পদার্থ হইতে অণুতে, ও অণু হইতে যেকালে বিদ্যুতাণুতে পৌঁছিয়া একেবারে সবই হারাইয়া ফেলিলেন।"

এডিংটন ক্রমাগতই দেখাইয়া যাইতে লাগিলেন যে তাঁহাদের কোন যুক্তিই জড়তত্ত্বের পরিপোষক নহে, অথচ তাঁহারা জোর করিয়াই জড়ের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। মন ছাড়া, মনের প্রভাবের বাহিরেও জড়ের অস্তিত্ব আছে ইহাই তাঁহারা প্রমাণ করিয়া দেখাইতে চাহেন। কিন্তু বিদ্যুতাণুতে আসিয়া তাঁহারা সব হারাইয়া ফেলিয়াছেন। বিদ্যুতাণু যে কি তাহা কেহই ঠিক্ বুঝাইয়া উঠিতে পারিতেছেন না। বিদ্যুতাণু মন হইতে কি করিয়া তফাৎ হইতে পারে তাহা জড়বৈজ্ঞানিকগণ প্রমাণ করিতে পারিতেছেন না। কাজেই তাঁহারা যে কোন কথাই বলিতেছেন তাহা সবই যেন কথার ঝক্‌মারীতে পরিণত হইয়া পড়িতেছে। এক কথার ব্যাখ্যা অন্য কথা দ্বারা করিতেছেন, কিন্তু কোন কথারই একান্ত ও নিঃসঙ্গ ব্যাখ্যা পাওয়া যাইতেছে না। এডিংটন পরিষ্কার বলিলেন, "বৈদ্যুতিক শক্তি কি তাহা বুঝাইতে গিয়া তাঁহারা বলেন যে যাহা বৈদ্যুতিক বিস্ফোরণ ঘটায় তাহাই বৈদ্যুতিক শক্তি এবং বৈদ্যুতিক বিস্ফোরণ কি তাহা বুঝাইতে গিয়া তাঁহারা বলেন যে যাহা বৈদ্যুতিক

শক্তি প্রকাশ করে তাহাই বৈদ্যুতিক বিস্ফোরণ।" এইরূপে এডিংটন দেখাইতে লাগিলেন যে জড় বৈজ্ঞানিকগণ কেবল কথারই মারপ্যাঁচ্ খেলিতেছেন। জড়ের কোন অস্তিত্বই আজ পর্য্যন্ত তাঁহারা দেখাইয়া উঠিতে পারেন নাই।

এডিংটন বলিতে লাগিলেন যে বাস্তবিকই জড়বৈজ্ঞানিকগণও বাহিরের জিনিষ হইতে কতকগুলি গণিতের সংস্কার জানিয়া লন। এই সংস্কারের মধ্যে জিনিষের জড়ীয় অস্তিত্ব একেবারে ডুবিয়া যায়। শেষ কালে তাঁহারা কেবলমাত্র গণিতের জ্ঞানই লাভ করিয়া থাকেন। জিনিষের মধ্যে জড়-নির্ম্মিত কোন পদার্থই নাই। এই কথা বুঝাইতে গিয়া তিনি একটি হাতীর কথা তুলিয়াছেন। ধরা যাউক্, পাহাড়ের উপর হইতে একটা হাতী গড়াইয়া নীচে পড়িতেছে। পাহাড়ের গাত্রটা বেশ ঢালু। তাহার গায়ে নব দূর্ব্বাদল গজাইয়াছে। এইরূপ পাহাড় হইতে একটা হাতী পড়িয়া যাইতেছে। কতক্ষণে হাতীটা আসিয়া একেবারে মাটিতে পড়িবে ইহাই দ্রষ্টার সমস্যা। বৈজ্ঞানিক দ্রষ্টা প্রথমেই দেখেন যে পাহাড়ের ঢালু গাত্র হয়ত পাহাড়ের সাথে ৬০ ডিগ্রীর একটি কোণ উৎপন্ন করিয়াছে। তাহার পর দেখেন যে পাহাড়-গাত্রে উৎপন্ন সেই নব দূর্ব্বাদল হাতীর পড়িয়া যাইবার সময় কতটা বাধা (friction) জন্মাইতে পারে। তার পর তিনি হাতীর শারীরিক ওজনটা হয়ত স্থির করিবেন দুই টন। এই সব দেখিয়া লইয়া বৈজ্ঞানিক আসল জিনিষ কয়টা একেবারেই ভুলিয়া গিয়া মনে রাখিবেন তাঁহার গণিতের সংস্কারগুলি। অর্থাৎ, বৈজ্ঞানিক সেই হাতী, পাহাড় ও পাহাড়ের গাত্র সব ভুলিয়া গিয়া শুধু মনে রাখিবেন ২ টন, ৬০° ও সেই দূর্ব্বাদলের বাধাটুকু। এই শেষোক্ত গণিতের সংস্কারগুলির সাহায্যেই বৈজ্ঞানিক তাঁহার ঘড়ির কাঁটার সাহায্যে স্থির করিবেন কতক্ষণে হাতীটি আসিয়া সমতল ভূমিতে উপনীত হইবে। শেষ কালে সব আসিয়া পরিণত হইল গণিতজ্ঞ বৈজ্ঞানিকের ঘড়ির কাঁটার চল্‌তিতে। এই সমস্ত গবেষণার মধ্যে বাস্তব হাতীটি যে কোথায় চলিয়া গেল কেহই তাহা ধরিতে পারিল না। হাতীটি কি, হাতীর স্বরূপ, হাতীর গড়ন, হাতীর চলন কিরূপ তাহা সকলেই ভুলিয়া গেল। সব আসিয়া কতকগুলি গণিতের সংস্কারে পরিণত হইল। অতএব মন ছাড়া, মনের সংস্কার বা গণিত ছাড়া জড়ের অস্তিত্ব কোথায়?"

এডিংটন যতই তাঁহার মত সুস্পষ্ট করিয়া যাইতে লাগিলেন ততই আর একটা প্রশ্ন তাঁহার মধ্যে ঘনাইয়া উঠিতে লাগিল। যতই তিনি বুঝাইতে লাগিলেন যে আমরা আমাদের মনের সংস্কার ছাড়া আর কিছুই জানি না, ততই তাঁহার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইতে লাগিল যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটা কিসের মধ্যে অবস্থান করিতেছে। যদি জড় বলিয়া কিছুই না থাকে, তবে এই বাহ্যিক দুনিয়ার অবস্থান কোথায়? এই বাহ্যিক দুনিয়ার সংস্পর্শেই আমাদের জ্ঞান হইয়া থাকে। এডিংটন এ কথা স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে আমাদের শরীর দ্রুত চলমান বিদ্যুতাণু দ্বারা ক্রমশঃই তাড়্যমান হইতেছে। ইহার ফলেই বাহ্যবিশ্ব বিষয়ে আমাদের যাহা কিছু জ্ঞান উৎপন্ন হইতেছে। যদি তাহাই সত্য হয়, তবে স্বতঃই মনে হয় যে বাহ্যিক দুনিয়া মন হইতে পৃথক্ কোন বস্তু যাহা মনের উপর ক্রমাগত আঘাত করিয়া মনের চৈতন্য সম্পাদন করিতেছে। কিন্তু এডিংটন এই কথা মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন। তাহা হইলে তাঁহার অধ্যাত্মবিজ্ঞান পণ্ড হইয়া যায়। এইখানেই এডিংটন তাঁহার "অধ্যাত্মভাণ্ডে"র (Spiritual Substratum) কথা আনিলেন।

এডিংটন বলিলেন, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কোন প্রকার জড়বস্তু দ্বারাই প্রস্তুত হয় নাই। এই বিশ্বের উপাদান জড়ীয় নহে। কোন জড়ীয় ভাণ্ডেই বিশ্ব অবস্থিত নহে। এই বিশ্ব "অধ্যাত্মভাণ্ডে"ই অবস্থিত।

কথাটাকে আরো ভাঙিয়া এডিংটন বুঝাইতে লাগিলেন যে "এই দুনিয়া যে অবস্থানে অবস্থিত তাহাও মন। জড় বলিয়া কোন পদার্থই নাই। চেতনের মধ্যেই এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড উঠিতেছে, ভাসিতেছে ও ডুবিতেছে। এডিংটন বলিয়াছেন, "সমস্ত বিশ্বের মধ্য দিয়াই একটা অজানা সত্তা বহিয়া চলিয়াছে। এই সত্তাটাই চেতন।" বস্তুতঃ পক্ষে জ্ঞাতাও মন, জ্ঞেয়ও মন। বিশ্ব ভরিয়া এক মনেরই লীলা চলিতেছে। মনই মনকে জানিতেছে। মনই মনকে আঘাত করিয়া চৈতন্য দিতেছে। বাস্তবিক জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মধ্যে প্রকারগত কোন পার্থক্য নাই। পার্থক্য যাহা কিছু সবই পরিমাণগত। এক বিরাট মনোময় পাত্রের মধ্যে এই বিশ্ব অবস্থিত। আর যাহা কিছু সবই সেই মনোময় পাত্রস্থিত বুদ্‌বুদ। জলের বুদ্‌বুদ যেমন জল, মনের বুদ্‌বুদও সেইরূপ মনই। বিশ্বের এই মনোময় প্রকৃতিকে লক্ষ্য করিয়াই এডিংটন বলিয়াছেন, "একটা অসীম সত্তাকে স্বীকার করিতে হইবে বটে, কিন্তু সেই সত্তা আমাদের মনের প্রকৃতির সহিত একই ধারায় গ্রথিত জানিতে হইবে।" এডিংটনের সার কথা এই যে আমাদের সহিত বাহ্য প্রকৃতির কোন বিষয়ে কোন বৈসাদৃশ্য নাই। আমরাও যেমন মনোময়, বাইরের জগৎও তেমনি মনোময়। কাহারও সহিত কাহারও প্রকৃতিগত তফাৎ নাই। উভয়ে একই মায়ের সন্তান। এক বিরাট অধ্যাত্মভাণ্ডে বা মনোময় পাত্রে উভয়েই অবস্থিত। সেই পাত্র বিরাট ও অসীম। আমাদের মত শত শত ক্ষুদ্র মন তাহার ভিতর উঠিতেছে, ভাসিতেছে ও ডুবিতেছে।

স্যার জেম্‌স্ জিন্‌স্ (Sir James Jeans) কথাটাকে টানিয়া লইয়া আরও পরিষ্কার ভাষায় বুঝাইতে চাহিলেন। তিনি বিশ্বের বস্তুসমূহের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া ঠিক্ এডিংটনের মতই দেখিলেন যে বাস্তবিকই এই দুনিয়াটা মনোময়। জড় বলিয়া ইহার কোথাও কিছু নাই। সমস্তই যে একটা অসীমের খেলা তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। অতএব এইখানেই তিনি তাঁহার ঈশ্বরতত্ত্ব (Theism) আনিয়া কথাটাকে একেবারে পরিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। জেম্‌স্ জিন্‌স্ বলিলেন, "সর্ব্বপ্রথমে ইহাই বুঝা যায় যে এই ব্রহ্মাণ্ড এমন একটা মনের সৃষ্টি যাহা গণিতের নিয়মানুসারে চিন্তা করে। দ্বিতীয়তঃ, এই সমস্ত বিশ্বটাই ঐরূপ এক ব্যক্তির মনেরই চিন্তা ছাড়া আর কিছুই নহে।"

অতএব জেম্‌স্ জিন্‌স্ এই মনোময় দুনিয়ার অন্তরালে ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানিলেন। বাস্তবিক পক্ষে আজ পর্য্যন্ত জড়বিজ্ঞান ঘাঁটিয়া ঘাঁটিয়া একেবারে ঈশ্বরতত্ত্ব পর্য্যন্ত পৌঁছিতে আমরা আর কাহাকেও বড় একটা দেখি নাই। অতএব এডিংটন ও জিন্‌সের চিন্তাধারা যে কোন্ মুখী তাহা বেশ অনুধাবন করিবারই বিষয়। তাঁহারা জড়ের চিন্তা করিতে করিতে এক অজড় রাজ্যে গিয়া পৌঁছিয়াছেন। সেখানে গিয়া তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে মনই একমাত্র সত্তা। একদিন তাঁহারা 'নীরেট জড়ের" সত্তা স্বীকার করিয়া ভুলই করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহারা বলিয়া ফেলিলেন, "আমরা জড় সম্বন্ধে এমন কিছু জানিয়া ফেলিয়াছি যে আমাদিগকে আর জড়বাদী বলা চলে না।"

সম্রাটের রজত জুবিলী

পঁচিশ বা পঞ্চাশ বৎসর রাজ্যশাসন অনেক রাজার ভাগ্যেই ঘটে না। সেই জন্য রাজার রাজত্বকাল পঁচিশ, পঞ্চাশ বা ষাট বৎসর পূর্ণ হইলে তদুপলক্ষে উৎসবানুষ্ঠান করা য়ুরোপের নানা দেশে প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ দেশে ইংরাজশাসনে সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকাল পঞ্চাশ

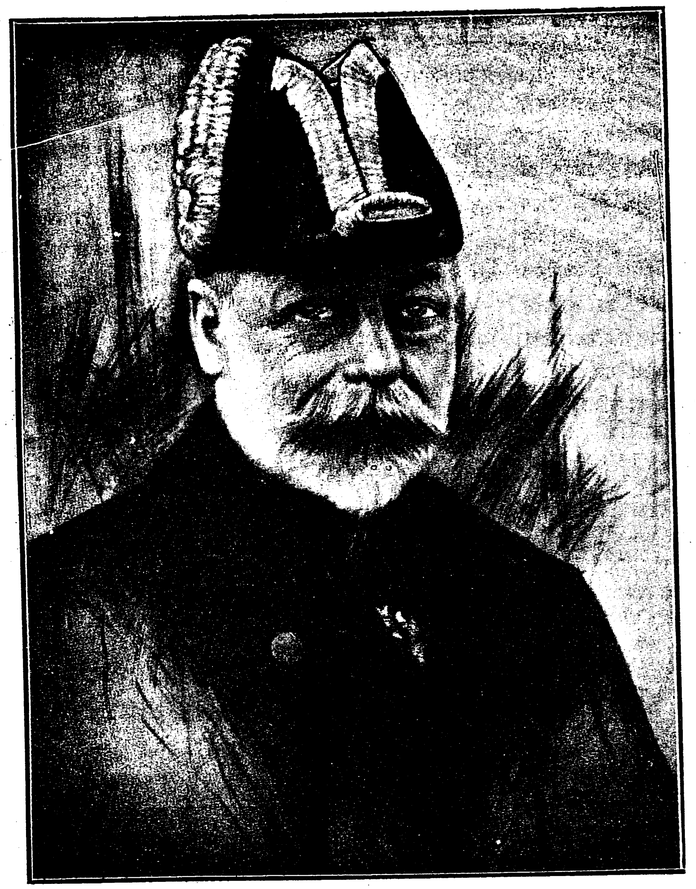

ভারত-সম্রাট মহামতি শ্রীল শ্রীযুক্ত পঞ্চম জর্জ্জ

বৎসর পূর্ণ হইলে প্রথম এইরূপ অনুষ্ঠান হইয়াছিল। তাঁহার রাজত্বকাল ষাট বৎসর পূর্ণ হইলেও উৎসবানুষ্ঠান হইয়াছিল। সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের রাজত্বকাল পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হইল। তদুপলক্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সকল স্থানে উৎসবানুষ্ঠান হইয়াছে।

গত পঁচিশ বৎসর পৃথিবীর ইতিহাসে স্মরণীয় কাল। এই সময়ের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা—জার্ম্মাণ যুদ্ধ। এত বড় যুদ্ধ প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত কোন দেশে হয় নাই। ইহার ফলও পৃথিবীব্যাপী। ভারতবর্ষ যে কেবল যুদ্ধের সময় ধনপ্রাণ দিয়া সাম্রাজ্যের জন্য ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিল, তাহাই নহে—পরন্তু তাহার পর যুদ্ধান্তে ব্যবসামন্দার ফল হইতেও অব্যাহতি লাভ করে নাই। যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষ হইতে যে অর্থসাহায্য ও লোকবল প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহাতেই ভারতবর্ষের সাহায্য পরিমাপ করা যায় না। কারণ, যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষ পরোক্ষভাবে যে ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে, তাহাও অসামান্য। যুদ্ধকালে ভারতবর্ষ হইতে নিম্নলিখিত দ্রব্য সরবরাহ না হইলে জার্ম্মাণীর শত্রুপক্ষীয়রা বিশেষ অসুবিধায় পড়িতেন এবং এই সব দ্রব্যই বাজারদর অপেক্ষা অল্প মূল্যে সরবরাহ করা হইয়াছিল—

(১) অহিফেন
(২) চর্ম্ম
(৩) অভ্র
(৪) পাট

পাট বাঙ্গালা হইতে রপ্তানী করা হইয়াছিল। যুদ্ধের পরেই বিলাতের 'টাইমস' পত্র লিখিয়াছেন :—

"১৯১৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার পাট-কলগুলির সহিত মূল্য সম্বন্ধে যে চুক্তি হয়, তিন বৎসর তাহাই বহাল রাখা হইয়াছিল। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে পাটের বাজারদর অনেক বাড়িয়াছে।"

ভারতবর্ষেও এই পঁচিশ বৎসরে অল্প পরিবর্ত্তন হয় নাই এবং সেই পরিবর্ত্তনে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের প্রভাবও অল্প নহে। যুবরাজরূপে তিনি যখন সস্ত্রীক ভারতবর্ষে আগমন করেন, তখন বঙ্গভঙ্গজনিত আন্দোলনে বাঙ্গালা বিক্ষুব্ধ। পরে যখন তিনি রাজা হইয়া পুনরায় ভারতে আগমন করেন, সেই সময় তিনি পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ সংযুক্ত করিবার ব্যবস্থা ঘোষণা করেন। যুদ্ধকালে এ দেশ হইতে যে কয়জন সাংবাদিক বিলাতের সংবাদ সরবরাহ মন্ত্রিমণ্ডলের আমন্ত্রণে য়ুরোপে গিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে যিনি বাঙ্গালী তাঁহাকে সম্রাট বলিয়াছিলেন—

"যুবরাজরূপে বাঙ্গালায় যাইয়া আমি যাহা লক্ষ্য করিয়াছিলাম, তাহাতে আমার মনে হইয়াছিল—বাঙ্গালীদিগের অভিপ্রায় সিদ্ধ করিয়া বাঙ্গালাকে গভর্ণরের অধীন প্রদেশে পরিণত না করিবার কোন কারণ নাই।"

সে বার বিলাতে ফিরিয়া যাইয়া তিনি শিল্পীদিগের এক সভায় শিল্পী মাত্রকেই ভারত ভ্রমণের পরামর্শ দিয়াছিলেন।

তিনি সে বার বিলাতে ফিরিয়া যে বাণী দিয়াছিলেন—তাহার মূল কথা—সহানুভূতি।

বিলাতের রাজপরিবার—ভারতের শাসনভার গ্রহণাবধি—এ দেশের লোকের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশে কখন কার্পণ্য দেখান নাই। সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হইতে রাজ্যভার গ্রহণ করার সময় যে ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহার ইতিহাসেও এই সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। তখন সিপাহীবিদ্রোহের স্মৃতিচঞ্চল ইংরাজরা উগ্র ব্যবস্থার পক্ষপাতী—বড়লাট লর্ড ক্যানিং দয়ার পরিচয় প্রদান করায় তাঁহারা তাঁহার উপর বিরক্ত। ঘোষণার পাণ্ডুলিপি অনুমোদন-জন্য মহারাণীর নিকট প্রেরিত হইলে তিনি তাহা ফিরাইয়া দিয়া লিখেন—রক্তরঞ্জিত আন্তর্দেশিক যুদ্ধের পর এক জন মহিলা রাজ্যশাসনভার গ্রহণ উপলক্ষে প্রতীচ্য দেশের লক্ষ লক্ষ প্রজাকে উদ্দেশ করিয়া ঘোষণা করিতেছেন

সম্রাজ্ঞী মেরী

—ইহা স্মরণ রাখিয়া যেন ঘোষণা রচিত হয়। আর ঘোষণায় যেন উদারতা, দয়া, ধর্ম্মবিষয়ে পরমতসহিষ্ণুতা, স্বাধীনতা ও বিচারে অপক্ষপাতের কথা লিখিত থাকে। খসড়ায় লিখিত ছিল, ভারতবাসীরা যেন স্মরণ রাখেন,

মহারাণী সে দেশের লোকের ধর্ম্মমত ধ্বংস করিতে পারেন। ভিক্টোরিয়া ইহার প্রতিবাদ করিয়া মত প্রকাশ করেন—তিনি স্বীয় ধর্ম্মে যে শান্তি ও সুখ লাভ করেন, তাহাতে তিনি কখন অপরের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। ঘোষণার উপসংহারে লিখিত হয়—প্রজাদিগের কল্যাণ-কল্পেই দেশ শাসন করা হইবে এবং—

"(ভারতীয়) প্রজার সমৃদ্ধিতেই আমাদিগের শক্তি

সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড (পিতা)

নিহিত থাকিবে ; তাহাদিগের সন্তোষেই আমরা নিরাপদ হইব ; তাহাদিগের কৃতজ্ঞতায় আমরা পুরস্কার লাভ করিব।"

এই ঘোষণায় যে উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা হয় ত কোন কোন রাজপ্রতিনিধি বা রাজকর্ম্মচারী রক্ষা করিতে পারেন নাই—কিন্তু সেই আদর্শ যে এ দেশ সম্বন্ধে বিলাতের রাজপরিবারে আদর্শ নহে, এমন কথা কখন বলা হয় নাই।

সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহার তিন পুত্রকে এ দেশে পাঠাইয়াছিলেন :—

প্রথমে তাঁহার মধ্যম পুত্র ডিউক অব এডিনবরা এ দেশে আগমন করেন।

তাহার পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র (পরে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড) এ দেশে আইসেন।

তাঁহার পুত্র ডিউক অব কনট এ দেশে সেনাবিভাগে চাকরী লইয়া আসিয়াছিলেন।

প্রায় যাট বৎসর পূর্ব্বে যুবরাজরূপে এডওয়ার্ডের আগমনস্মৃতি বাঙ্গালা সাহিত্য-রসিকের নিকট উজ্জ্বল হইয়া আছে। সেই সময় বহু রচনার মধ্যে কবি হেমচন্দ্রের ও নবীনচন্দ্রের রচনা স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে। নবীনচন্দ্র তাঁহার 'ভারত-উচ্ছ্বাসে' যুবরাজকে সম্বোধন করিয়া ভারতের দুর্দ্দশার কথা লিখিয়াছিলেন :—

"ছিল অক্ষৌহিনী অষ্টাদশ যার,
আজি পরহস্তে আত্মরক্ষা তার ;
অক্ষয় আছিল যার অস্ত্রাগার,
আজি অশ্রুরাশি মহাস্ত্র তাহার ;
মহাকাব্য 'মহাভারত' যাহার,
মহারঙ্গভূমি কুরুক্ষেত্র হায় !
ভীষ্মদ্রোণার্জ্জুন অভিনেতৃ যার,
যুবরাজ ! আজি সে জাতি কোথায় ?"

তিনি লিখিয়াছিলেন :—

"এই ধরাতলে আদি হিন্দুজাতি,
ধরাতলে আদি—হিন্দুসিংহাসন ;
আচন্দ্রভাস্কর হায় ! যার ভাতি
এবে শূন্য সেই পুণ্য সিংহাসন।
বসি সিংহাসনে দেখ একবার,
অদৃষ্টের শোক-অভিনয় স্থান।
দেখ শেষ অঙ্ক—শোক পারাবার—
আজি হিন্দুস্থান—হিন্দুর শ্মশান।"

হেমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—কুমার !—

"এই কৃষ্ণবর্ণ জাতি পূর্ব্বে যবে
মধুমাখা গীত শুনাইল সবে,
স্তব্ধ বসুন্ধরা শুনি বেদগান
অসাড় শরীরে পাইল পরাণ,
পৃথিবীর লোক বিস্ময়ে পূরিয়া
উৎসাহ-হিল্লোলে সে ধ্বনি শুনিয়া
দেবতা ভাবিয়া স্তম্ভিত রহে।
"এই কৃষ্ণবর্ণ জাতি সে যখন
উৎসবে মাতিয়া করিত ভ্রমণ,
শিখরে শিখরে—জলধির জলে—
পদাঙ্ক অঙ্কিত করি ভূমণ্ডলে ;
জগৎব্রহ্মাণ্ড নখর-দর্পণে
খুলিয়া দেখাত মনুজসন্তানে ;
সমর-হুঙ্কারে কাঁপিত অচল
নক্ষত্র, অর্ণব, আকাশমণ্ডল—
তখন তাহারা ঘৃণিত নহে !
"যখন জৈমিনি, গর্গ, পাতঞ্জলি,
মম অঙ্কস্থল শোভায় উজলি—
শুনাইল ধীর নিগূঢ় বচন,
গাইল যখন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ;
জগতের দুঃখে সুকপিলবস্তু
শাক্যসিংহ যবে ত্যজিলা গার্হস্থ্যে—
তখন (ও) তাহারা ঘৃণিত নহে।
"তাদেরই রুধিরে জনম এদের,
সে পূর্ব্ব গৌরব সৌরভের ফের
হৃদয়ে জড়ায়ে ধমনী নাচায়,
সেই পূর্ব্বপানে কভু গর্ব্বে চায়—
এ জাতি কখন জঘন্য নহে।"

আর এই উপলক্ষেই হেমচন্দ্রের 'বাজিমাৎ,' রচিত হয়।

যুবরাজ এডওয়ার্ডের পুত্র এলবার্ট ভিক্টর এ দেশে আসিয়াছিলেন এবং প্রত্যাবর্ত্তনের অল্প দিন পরে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুতে রাজপুত্র জর্জ্জ ভবিষ্যৎ রাজ্যাধিকারী হয়েন।

যুবরাজরূপে এ দেশে আসিয়া তিনি ফিরিয়া যাইয়া যে বাণী দান করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ আমরা পূর্ব্বে করিয়াছি।

রাজা হইয়া এ দেশে আসিলে তিনি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অভিনন্দন পত্রের উত্তরে যে বাণী দান করেন, তাহার মূল কথা—আশা।

রাজা হইয়া সপ্তম এডওয়ার্ড যেমন—পিতার পর রাজা জর্জ্জও তেমনই সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার

মহারাণী আলেকজান্দ্রা (রাজমাতা)

ঘোষণার মূল নীতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া শাসননীতি ঘোষণা করেন।

জার্ম্মাণ যুদ্ধের মধ্যেই বিলাতের সরকার এ দেশে ইংরাজ শাসনের মূলনীতি ঘোষণা করেন—

"শাসনের সকল বিভাগে ভারতবাসীর সহিত ক্রমবর্দ্ধন-শীল যোগ এবং ভারতবর্ষ যাহাতে বৃটিশ সাম্রাজ্যমধ্যে

থাকিয়া ক্রমে দায়িত্বশীল শাসন প্রবর্ত্তন করিতে পারে সেই জন্য স্বায়ত্ত-শাসনশীল প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা।"

এই নীতি প্রচারের পরই অনুসন্ধান ও আলোচনার ফলে শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত হয়। শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সম্রাটের ঘোষণা প্রচারিত হয়। তাহার চতুর্থ

মহারাণী ভিক্টোরিয়া (পিতামহী)

দফায় যাহা উক্ত হইয়াছে, নিম্নে তাহার মর্ম্মানুবাদ প্রদত্ত হইল—

"আমার ভারতীয় প্রজাদিগের মনে স্বায়ত্ত-শাসনশীল প্রতিষ্ঠানের জন্য আগ্রহবৃদ্ধি আমি সহানুভূতি সহকারে লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি। সামান্য আরম্ভ হইতে এই আগ্রহ ক্রমে বুদ্ধিমান লোকের চিত্ত অধিকার করিয়াছে। ইহা অকৃত্রিমতা সহকারে—নির্ভীকভাবে নিয়মানুগ পথে অগ্রসর হইয়াছে। সময় সময় কোন কোন স্থানে কেহ কেহ দেশপ্রেমের ছদ্মবেশে অনাচারের অনুষ্ঠান দ্বারা ইহাতে কলঙ্কারোপের যে চেষ্টা করিয়াছে, তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। বৃটিশ সাম্রাজ্য যে আদর্শ লইয়া জার্ম্মাণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহাতে ভারতবাসীর এই আগ্রহ আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং ভারতবর্ষ সাম্রাজ্যের সংগ্রামে, উদ্বেগে ও জয়ে যে অংশ গ্রহণ করিয়াছে, তাহার জন্য ইহা সকলেরই সমর্থন লাভ করিয়াছে। ইংলণ্ডের সহিত ভারতের সম্বন্ধ-প্রতিষ্ঠা হইতেই এই আগ্রহের উদ্ভব। * * * ইহার উদ্ভব না হইলে এ দেশে বৃটিশের কায অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত। সেই জন্যই রাজনীতিকোচিত বুদ্ধিবশে বহুদিন পূর্ব্বে এ দেশে প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হয়। ক্রমে ক্রমে ইহার প্রসার বৃদ্ধি করা হইয়াছে এবং আজ ভারতবর্ষ দায়িত্বশীল শাসনের পথে পদার্পণ করিল।"

সম্রাট পরে বলেন, তিনি এই পথে ভারতবাসীর যাত্রা সহানুভূতি সহকারে লক্ষ্য করিতে থাকিবেন।

এই ঘোষণায় রাজনীতিক অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তি-দিগকে মুক্তিদানের নির্দ্দেশ ছিল; বলা হইয়াছিল—রাজনীতিক উন্নতি লাভের আগ্রহেই তাহারা আইন ভাঙ্গিয়াছিল।

এইরূপে ভারতবর্ষের ইতিহাসে নূতন যুগ প্রবর্ত্তন করিয়া সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ প্রাদেশিক শাসন-ব্যাপারে কতকাংশের ভার দেশের লোককে প্রদান-ব্যবস্থা করেন।

নূতন শাসন-পদ্ধতি কিরূপ হইবে, কাহারা ব্যবস্থাপক সভায় ও ব্যবস্থা পরিষদে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে ভোট দিতে পারিবেন—কোন্ কোন্ বিভাগের ভার ব্যবস্থাপক সভার নিকট কৈফিয়তের দায়ী মন্ত্রীর উপর ন্যস্ত করা হইবে—এই সকল বিষয়ের আলোচনায় প্রায় এক বৎসর কাল অতিবাহিত হয়। তাহার পর নূতন ব্যবস্থায় ব্যবস্থাপক সভা এবং ব্যবস্থা পরিষদ ও রাষ্ট্রীয় পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই সময় ভারতের রাজনীতিক গগনে ঘনঘটা—পঞ্জাবে অনাচার, শাসন-সংস্কার ব্যবস্থার অসম্পূর্ণতা ও খিলাফৎ সমস্যা লইয়া কংগ্রেস অহিংস অসহযোগ নীতি

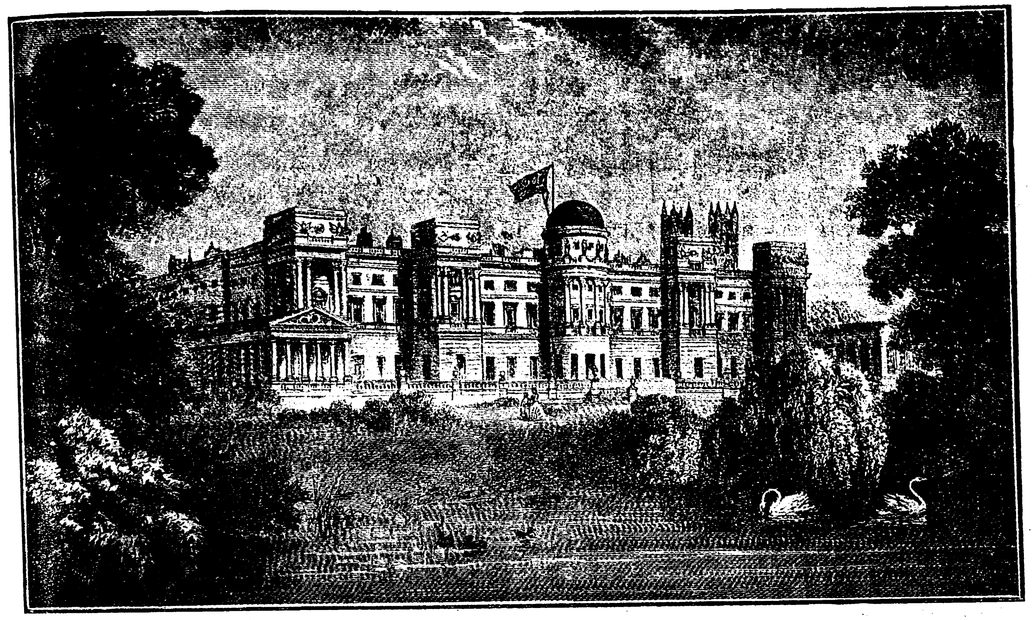

বাকিংহাম প্রাসাদ

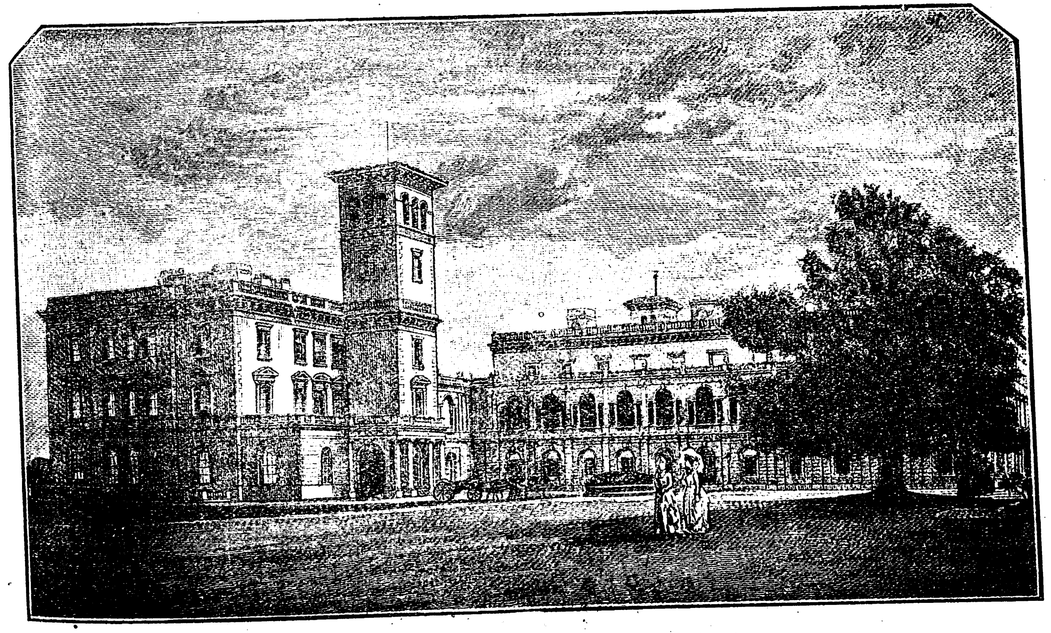

অস্‌বোর্ণ হাউস

প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। গান্ধীজী এই অসহযোগ আন্দোলনে নেতা এবং তাঁহার ব্যক্তিগত প্রভাব সমগ্র ভারতে অনুভূত হইতেছে। এই নীতির জন্য কংগ্রেস ব্যবস্থাপক সভাদি বর্জ্জন করিতে চাহে।

এই অবস্থায়—প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে,—নূতন ব্যবস্থাপক সভাগুলির উদ্বোধন হয়। এই উদ্বোধন-কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য সম্রাটের পিতৃব্য—সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার পুত্র

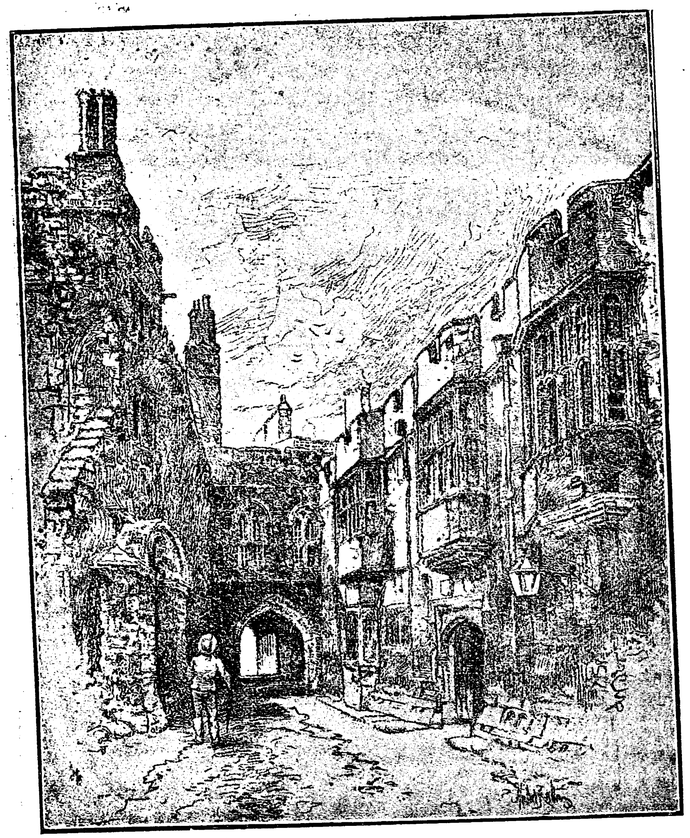

উইণ্ডসর কাস্‌ল্

ডিউক অব কনট রাজার প্রতিনিধিরূপে এ দেশে আগমন করেন। তিনিই উদ্বোধনে সম্রাটের উক্তি পাঠ করেন। তাহাতে বলা হইয়াছিল—

"অনেক দিন হইতে—হয়ত কয় পুরুষ ধরিয়া স্বদেশ-প্রেমিক ও রাজভক্ত ভারতবাসীরা ভারতবর্ষে স্বরাজের স্বপ্ন দেখিয়া আসিয়াছেন। আজ আপনারা আমার সাম্রাজ্যমধ্যে স্বরাজের আরম্ভ প্রাপ্ত হইলেন—বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশে অধিবাসীরা যে স্বাধীনতা সম্ভোগ করেন, আপনারা সেই স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইবার সম্পূর্ণ সুযোগও লাভ করিলেন।"

সম্রাটের উক্তি পাঠ করিয়া রাজ-পিতৃব্য যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি বলেন—এই শাসন-সংস্কারে ভারতে স্বৈর শাসনের অবসান হইল; ভারতবাসীর রাজনীতিক আকাঙ্ক্ষা ও দেশের রাজনীতিক অবস্থা বিবেচনা করিলে স্বৈরশাসন রক্ষা করা অসঙ্গত হয়।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি পঞ্জাবের দুর্ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলেন—

"এ দেশে আসিয়াই আমি লক্ষ্য করিতেছি, যাঁহাদিগের (অর্থাৎ যে ইংরাজ ও ভারতবাসীর) মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল ও থাকা প্রয়োজন—তাঁহাদিগের মধ্যে বিরোধভাব প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ভারতের সুন্দর মুখের উপর অমৃতসরের করাল ছায়াপাত হইয়াছে। পঞ্জাবে যে ভীষণ ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার জন্য সম্রাটের কত বেদনা, তাহা আমি অবগত আছি।"

রাজ-পিতৃব্য যে লোককে সেই স্মৃতি মুছিয়া ফেলিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, সে-ও হয়ত সম্রাটের অভিপ্রায়ানুসারে। যাঁহারা আয়ার্লণ্ডের ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারাই ইহা অনুমান করিতে পারিবেন। আয়ার্লণ্ড যখন অন্তর্বিপ্লবে ক্ষতবিক্ষত—তথায় যখন ইংরাজ-বিদ্বেষ রক্তপাতে ও অনলশিখায় আত্মপ্রকাশ করিতেছিল, তখনই বেলফাষ্টে সম্রাট বলিয়াছিলেন—

"আইরিশরা যে ধর্ম্মাবলম্বীই কেন হউন না—আর যে স্থানেই কেন বাস করুন না যে সব স্বায়ত্তশাসনশীল দেশ লইয়া বৃটিশ সাম্রাজ্য সংগঠিত সেই সকলের সহিত একযোগে কায করিবেন—ইহাই আমার আন্তরিক কামনা। আমি আশা করি, আমার আয়ার্লণ্ডে আগমনে আইরিশদিগের মধ্যে বিবাদ-বিরোধের অবসান হইবে। সেই আশায় আমি আইরিশদিগকে অনুরোধ করিতেছি—তাঁহারা ধৈর্য্য ধারণ করুন—মিলনে উদ্যোগী হউন; তাঁহারা ক্ষমার অনুশীলন করুন—পূর্ব্বকথা বিস্মৃত হউন; যে দেশকে তাঁহারা ভালবাসেন, সেই দেশে শান্তির, সন্তোষের ও সদ্ভাবের নবযুগ প্রবর্ত্তিত করুন।"

ইহার পর তিনি যুবরাজকে ভারতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। রাজনীতিক বিক্ষোভহেতু তাঁহার ভারত-ভ্রমণ আশানুরূপ সুখদায়ক হয় নাই। কিন্তু তাহাতে এ দেশের সম্বন্ধে রাজার নীতি পরিবর্ত্তিত হয় নাই।

শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তনকালে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুসারে সাইমন কমিশন ভারতবর্ষের রাজনীতিক অবস্থা পরীক্ষা করিয়া মত প্রকাশ করিবার পর যে গোল-টেবিল-বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ১২ই নভেম্বর তারিখে তাহার উদ্বোধনে সম্রাট বলিয়াছিলেন—

"আমি বিশেষ মনোযোগ ও সহানুভূতি সহকারে—উৎকণ্ঠা সহকারেও—এই বৈঠকের কার্য্যের গতি লক্ষ্য করিব। আমার ভারতীয় প্রজাপুঞ্জের অবস্থা আমি সর্ব্বদাই মনে রাখিয়া থাকি এবং আপনাদিগের বিবেচনাকালে আপনারা অবশ্যই তাহা মনে রাখিবেন।"

ইংলণ্ডের রাজা স্বৈর-শাসনাধিকার পরিচালিত করেন না—কিন্তু তাঁহার প্রভাব কত অধিক তাহা কাহারও অবিদিত নাই। সেই প্রভাব যে বঙ্গভঙ্গ পরিবর্ত্তন করিবার জন্য প্রযুক্ত হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ আমরা পূর্ব্বেই করিয়াছি। প্রজার প্রতি বর্ত্তমান সম্রাটের সহানুভূতির পরিচয় নানা প্রকারে প্রকাশ পাইয়াছে। জার্ম্মাণ যুদ্ধের সময় তিনি প্রজার সহিত তুল্যভাবে ত্যাগস্বীকারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি বার বার—এ দেশের প্রজার প্রতি অনুরাগের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন।

তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া যে বাণী প্রচার করিয়াছেন, তাহার মূল কথা—আশা।

ভারতবাসীর হৃদয় আজ নূতন আশায় স্পন্দিত হইতেছে। প্রতীচীর যে শিক্ষা ও দীক্ষা প্রাচীর দেহে নবশক্তি সঞ্চার করিয়াছে, তাহাতেই ভারতে প্রভূত পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। নূতন ভাবপ্রবাহই ভারতে দেশাত্মবোধ বিকশিত করিয়াছে। সুতরাং ভারতবাসী

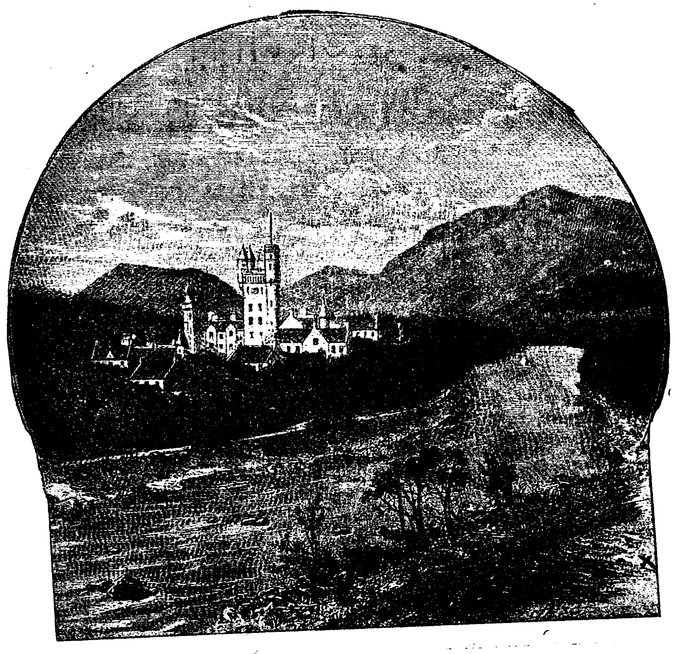

ব্যাল্‌মোরাল কাস্‌ল্

যে আজ স্বরাজ তাহার জন্মগত অধিকার বিবেচনা করিতেছে, তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। শত বর্ষ পূর্ব্বে—১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড মেকলে বলিয়াছিলেন, ভারতের ভবিষ্যৎ এখনও অন্ধকারে আচ্ছন্ন; কিন্তু যদি কখন এমন হয় যে, সুশাসনফলে ভারতীয়গণ উৎকৃষ্টতর শাসনাভিলাষী হইবে এবং য়ুরোপীয় শিক্ষার ফলে তাহারা য়ুরোপীয় প্রতিষ্ঠান লাভ করিতে চাহিবে, তবে তাহা ইংরাজের পক্ষে বিশেষ গৌরবজনকই হইবে। আজ আর সে দিন দূরস্থ নহে।

আজ দেশব্যাপী শান্তির মধ্যে ভারতীয় মনোভাব নূতন আকাঙ্ক্ষায় পুষ্ট হইয়াছে—তাই ভারতবাসী স্বাবলম্বনের দ্বারা আপনার স্থান আপনি অধিকার করিবার চেষ্টা করিতেছে।

লর্ড মিণ্টো যথার্থই বলিয়াছিলেন, এই নব ভাবের প্রবাহগতি রুদ্ধ করা সম্ভব নহে। তবে সহানুভূতির সহিত তাহার গতি নিয়ন্ত্রিত করা যায়। আর যে আশার উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী, সে আশা পূর্ণ করিতে সাহায্য করাই সঙ্গত।

সম্রাটের রাজত্বকাল পঞ্চবিংশ বর্ষ মধ্যে ভারতে রাজনীতিক, অর্থনীতিক, শিক্ষা সম্বন্ধীয় ও ভাবগত যে পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছে, তাহা স্মরণ করিয়া আজ আমরা মনে করি, সহানুভূতির দ্বারা আজিকার আশা অদূর ভবিষ্যতে পূর্ণ করিবার উপায় হইবে এবং মেকলে যে দিন ইংলণ্ডের ইতিহাসে সর্ব্বাপেক্ষা গর্ব্বের বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন সে দিনের আগমন বিলম্বিত হইবে না।

ভাইটামিন ও বাঙ্গালীর খাদ্য

শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস এম-এসসি

বৌদ্ধ যুগে বাংলার খাদ্যের বিশেষ খবর আমরা জানিনা। তবে ঐ যুগের নিরামিষ আহার (lacto vegetarian diet) যে অন্ততঃ তৎকালের নগরগুলিতে উপযুক্ত (adequate) ছিলনা তাহা গৌড়নগরের ধ্বংস হইতে অনেকটা অনুমান করা যায়। মহামারীর প্রকোপ প্রতিরোধ করিতে উপযুক্ত খাদ্য যে অনেকটা সমর্থ তাহা আধুনিক খাদ্যবিদ্‌গণ একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন। অতঃপর হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে শাক্ত মত এ দেশে প্রাধান্য লাভ করে। ফলে জৈব—আমিষ জাতীয় খাদ্যের বেশ প্রচলন দেখা যায়। কবি-কঙ্কণের ফুল্লরার মুখের (শ্রাবণে) 'মাংসের পসরা লয়ে ফিরি ঘরে ঘরে। আচ্ছাদন নাই অঙ্গে স্নান বৃষ্টি নীরে' ॥ (আশ্বিনে), কেহ না আদরে মাংস কেহ না আদরে। দেবীর প্রসাদ মাংস সবাকার ঘরে ॥' কথা উক্ত মতই সমর্থন করে। শ্রদ্ধেয় দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"পরন্তু জগাই মাধাই প্রভৃতির বৃত্তান্তে জানা যায়—তাহারা ব্রাহ্মণ হইয়া সর্ব্বদা মদ্য এবং গোমাংস ভক্ষণ করিত, কিন্তু এরূপ বোধ হয় না যে, তাহারা তজ্জন্য জাতিচ্যুত অবস্থায় ছিল। এই কালে বাঙ্গালী খাইয়া পরিয়া বেশ সুখী ছিল।" কিন্তু এই যুগ বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। বস্তুতঃ বহুবর্ষ বৌদ্ধত্বের পরে বাঙ্গালী যেন কেবলমাত্র পাঁটা কিনিয়া পাটাতে মসলা বাটিতে বসিয়াছিল, ইতিমধ্যে দুয়ারে শ্রীগৌরাঙ্গদেব মাদলে টঙ্কার দিয়া—বৈষ্ণবমত প্রচার করাতে ভাবপ্রবণ বাঙ্গালী পাঁটাকে কৃষ্ণের জীব জ্ঞানে প্রণাম করিয়া ছাড়িয়া দিল এবং মসলা ফেলিয়া পাটাতে চন্দন বাটিতে আরম্ভ করিল! চৈতন্য-যুগে দেশে দুগ্ধের প্রাচুর্য্য ছিল। তৎপরবর্ত্তী কালে ভক্তবর রামপ্রসাদ সেনের বিদ্যাসুন্দর কাব্যের "অপূর্ব্ব সন্দেশ নামে এলাইচ দানা। ফুল-চিনি, লুচি, দধি, দুগ্ধ. ক্ষীর, ছানা ॥" এবং তাঁহার অধ্যাত্ম গানের "দারাসুত পরিপাটি, পিঁড়ি পেতে দেয় দুধের বাটি" প্রভৃতি পদ হইতে ঐ যুগে বাংলা দেশে দুগ্ধ এবং দুগ্ধজাত খাদ্যোপকরণের কিরূপ প্রচলন ছিল তাহার বেশ আভাস পাওয়া যায়। কিছু দিন আগে পর্য্যন্তও লোকে আশীর্ব্বাদ করিবার সময় বলিত "বাবা, দুধে ভাতে থাক।" বাংলায় কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পাটের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় অধিকাংশ স্থলে পতিত গোচারণ ভূমি আবাদে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন পল্লীতে একান্নবর্ত্তী পরিবারের সংখ্যা হ্রাস ও ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দেশে দুগ্ধবতী গাভী পালনের অন্তরায় স্বরূপ হইয়াছে। সুতরাং আজ মুষ্টিমেয় বাঙ্গালী ব্যতীত অধিকাংশই দুগ্ধ হইতে একেবারে বঞ্চিত! দুগ্ধের উপকারিতার কথা কাহাকেও নূতন করিয়া বলিবার আবশ্যকতা নাই। দুগ্ধের অভাব পূরণ করিতে পারে ডিম, মাছ ও মাংস প্রভৃতি। সুতরাং এই সব খাদ্যের বহুল প্রচলন আবশ্যক। বাঙ্গালীর বর্ত্তমান খাদ্য উপকারী প্রোটিন ও ভাইটামিনের তরফ হইতে কিরূপ অপকৃষ্ট তাহা ডাক্তার বীরেশচন্দ্র গুহের পরীক্ষায় এবং কর্ণেল আর, ম্যাকক্যারিসনের (Col. R. Mc. Carrison) পরীক্ষার ফলে বিশেষ জানা গিয়াছে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল-মেসের ভাত, ডা'ল, মাছ, তরকারি ইত্যাদি ল্যাবরেটরীর বহুসংখ্যক ইন্দুরকে খাওয়াইয়া দেখা গিয়াছে, ইহাতে তাহাদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি হয় না। সুরাবীজ (yeast) প্রভৃতি ভাইটামিন-যুক্ত খাদ্য যোগ করিলে উহারা স্বাভাবিক ভাবে বাড়িতে থাকে। বলা বাহুল্য, এই মেসের খাদ্য কলিকাতার যে কোনও সাধারণ মেসের খাদ্য অপেক্ষা ভাল ভিন্ন মন্দ নয়। সুতরাং বাঙ্গালীর খাদ্য যে adequate বা উপযুক্ত নয় তাহা অনেকটা প্রমাণ-সিদ্ধ।

ম্যাক্ ক্যারিসন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশবাসীর সাধারণ খাদ্য একই মায়ের গর্ভজাত সমান ওজনের কতকগুলি ইন্দুর শাবককে কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া খাওয়াইয়া পরীক্ষান্তে তাহাদের ওজনের নিম্নলিখিত রূপ পার্থক্য লক্ষ্য করিয়াছেন।

জাতীয় খাদ্য	নির্দ্দিষ্ট খাদ্য ভোজী ইন্দুর দলের গড় ওজন
শিখ	২৩৫ গ্রাম (১১ গ্রাম=১ তোলা)
পাঠান	২৩০ "
মহারাষ্ট্র	২২৫ "
কানারিজ	১৮৫ "
বাঙ্গালী	১৮০ "
মাদ্রাজী	১৫৫ "

সচরাচর আমরা মনে করি, শিখের ছেলে শিখের মত পালোয়ান হইবে ইহা স্বতঃসিদ্ধ; খাদ্যের বিভিন্নতা গৌণ কারণ। কিন্তু ম্যাক ক্যারিসনের পরীক্ষায় দেখা যায়, এক মায়ের সন্তানই খাদ্যের বিভিন্নতাবশতঃ বিভিন্ন আকার ও অবয়ব পাইয়াছে। বাংলা দেশেও এক বংশের লোকেরই, যাঁরা দুই চারি পুরুষ জমিদারী করিয়া ঘৃতদুগ্ধে পুষ্ট হইয়াছেন, তাঁহাদের দৈর্ঘ্য বিস্তার, ঐ বংশের দরিদ্র অর্দ্ধভুক্ত লোকের চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠতর তাহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। সুতরাং খাদ্যের উপর সুস্থতা ও রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা ব্যতীত জাতির দৈর্ঘ্য ও অঙ্গসৌষ্ঠবও যে বহুল পরিমাণে নির্ভর করে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। শিখদের খাদ্যের উপাদান জানিতে অনেকেরই কৌতূহল জন্মিতে পারে। এ কারণ উহা নিম্নে লিখিত হইল।

যাঁতায় ভাঙ্গা গমের আটার চাপাটি
দুধ, মাখন, ঘি, দধি ও ঘোল
ডা'ল শাক-সব্জি,—টাটকা গাজর, বাঁধাকপি,
গোল আলু ও টম্যাটো, টাট্‌কা মাংস (হাড় ও চর্ব্বিসহ)
[সপ্তাহে একদিন]

ম্যাকক্যারিসন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোকের স্বাস্থ্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া লিখিয়াছেন—

"Indeed nothing could be more striking than the contrast between the manly, stalwart and resolute races of the North—the Pathans Beluchis, Sikhs, Panjabis, Rajputs and Marhattahs—and the poorly developed toneless and supine people of the east and south : Bengalis, Madrassis, Kanares, and Travancorians. Besides, Protein element of food, Vitamins and mineral elements are concerned in bringing about this result."

অর্থাৎ উত্তর অঞ্চলের তেজদৃপ্ত, উন্নতকায়, দুর্দ্ধর্ষ পাঠান, বেলুচি, শিখ, পাঞ্জাবী, রাজপুত এবং মারহাট্টাদের সহিত পূর্ব্ব এবং দক্ষিণ প্রদেশের হীনস্বাস্থ্য, নির্ব্বীর্য্য, 'অলসদেহ ক্লিষ্ট-গতি' বাঙ্গালী, মাদ্রাজী, কানারিজ এবং ত্রিবাঙ্কুরবাসীদের কি আকাশ পাতাল পার্থক্য! এবং খাদ্যের প্রোটিন, ভাইটামিন ও লবণ জাতীয় পদার্থই এই পর্ব্বত-প্রমাণ পার্থক্যের জন্য মুখ্যতঃ দায়ী।

বস্তুতঃ প্রত্যেক বাঙ্গালীই তাহার দৈনন্দিন খাদ্যে জৈব-প্রোটিন, স্নেহজাতীয় পদার্থ (ঘৃত মাখন ইত্যাদি), ভাইটামিন ও লবণ জাতীয় পদার্থ যথাসম্ভব রাখিতে চেষ্টা করিবেন। শেষোক্ত পদার্থের জন্য দুগ্ধ, টাটকা শাক-সব্জী ও ফলমূল প্রয়োজনীয়। ভাতের পরিবর্ত্তে এক বেলা অন্ততঃ আটার রুটির প্রচলন করা জাতীয় স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য অপরিহার্য্য। বিদ্যালয়ের বালকদের খাদ্য সম্বন্ধে যথাস্থানে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। নরওয়ে দেশে স্কুলের ব্যয়ে 'ওস্‌লো প্রাতরাশ' (Oslo Breakfast) নামে নিম্নলিখিত ভাইটামিন-প্রধান খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়া শিশুদের স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি লক্ষিত হইতেছে।

Oslo Freakfast :—

প্রত্যেক ছেলেকে— আধসের খাঁটি দুগ্ধ,
আটার রুটি ও মাখন
কাঁচা গাজর ও আপেল
অথবা
একটি কমলা লেবু ও পনির

জাতির প্রকৃত উন্নতিকামী ধনবান্ বাঙ্গালীর লক্ষ টাকা ব্যয়ে মন্দির বা নাট্যশালা নির্ম্মাণের অপেক্ষা জাতির মেরুদণ্ড গঠনে বিদ্যালয়ের বালকদের জন্য এইরূপ ব্যয় কি অবশ্য প্রয়োজনীয় ও শাশ্বত ধর্ম্মের সোপান নহে?

এক্ষণে ভাইটামিনের উপকারিতা এবং বাঙ্গালীর সহজ-প্রাপ্য ভাইটামিনপূর্ণ কয়েকটী খাদ্য দ্রব্যের উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিতে চাই।

ভাইটামিন 'এ'র অভাবে "রাতকাণা" ও অন্য প্রকার চক্ষুরোগ জন্মে; ফুস্‌ফুস্ যন্ত্রের দুর্ব্বলতাও ইহার অভাবে ঘটিয়া থাকে। এই অবস্থায় যক্ষ্মা প্রভৃতি মারাত্মক রোগের আক্রমণের সম্ভাবনাও বেশী হয়। শরীরের ব্যাধি প্রতিষেধক শক্তিও ভাইটামিন 'এ'র উপর নির্ভর করে বলিয়াই জানা যায়।

ভাইটামিন 'বি'র অভাবে হৃদ্‌যন্ত্র দুর্ব্বল হয়, বেরিবেরি জন্মে, মুখে রুচি থাকে না এবং শরীরের বৃদ্ধি স্থগিত হয়। স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যও বি-ভাইটামিনের অভাবে ঘটিয়া থাকে।

ভাইটামিন 'সি' স্কার্ভি নিবারণ করে। তদ্ভিন্ন পাইওরিয়া রোগে ইহা উপকারী।

ভাইটামিন 'ডি' শরীরের অস্থি-সংগঠনে নিতান্ত আবশ্যক। এ কারণ জীবের শরীর বৃদ্ধির সময় ও মেয়েদের গর্ভাবস্থায় (ভ্রূণের অস্থি-নির্ম্মাণ জন্য) ইহা অতীব প্রয়োজনীয়। অভাবে শিশুদের রিকেটস্ ও পরিণত বয়স্কদের 'অসটিওম্যালেসিয়া' (Osteomalacia) নামে অস্থিরোগ জন্মে। দাঁতের 'ক্যারিজ' (Carries) নামে রোগও 'ডি'র অভাবে ঘটিয়া থাকে।

ভাইটামিন 'ই'র সম্পূর্ণ অভাবে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই প্রজনন ক্ষমতা লোপ পায়। শরীরের স্বাভাবিক, সম্যক বৃদ্ধি ও সুস্থতার জন্য খাদ্যে সমুদয় ভাইটামিনেরই অস্তিত্ব অপরিহার্য্য।

অধিকাংশ শাকসব্জীই ভাইটামিন 'ডি' ব্যতীত অপর সমুদয় ভাইটামিন এবং লবণ জাতীয় পদার্থের জন্য বিখ্যাত। ভাইটামিনের জন্য পালং সকল শাকের সেরা। উহাতে লৌহ ঘটিত লবণও যথেষ্ট থাকে। দুগ্ধে লৌহ লবণের অল্পতা প্রযুক্ত পাশ্চাত্য দেশে শিশুকে পাঁচ মাস বয়স হইতেই পালং শাকের ঝোল খাইতে দিবার ব্যবস্থা দেখা যায়। আমাদের দেশে খুকুমণির বিয়ের ছড়াতে "রুই মাস পালংএর

শাক আসে ভারে ভারে।" প্রভৃতি কথা পালংএর শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয়ই দিয়া থাকে।

লেটুস শাক ভাইটামিন বি ও ই'র জন্য পরিচিত।

গাজর ভাইটামিন এ'র শ্রেষ্ঠ আধার এবং বেগুন ও শাঁকআলুতে ভাইটামিন বি বেশ পাওয়া যায়। টাট্‌কা পাকা লঙ্কাতে ভাইটামিন এ এবং সি দৃষ্ট হয়। শ্রদ্ধেয় Dr. গুহের পরীক্ষায় পেয়ারাতে ভাইটামিন 'সি' সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দেখা গিয়াছে। আনারস, বাতাবি লেবু, আম, জাম প্রভৃতি ফল ভাইটামিন সি এবং মটর, মসুরি, মুগ, ছোলা, অড়হর, খেঁসারি, মাগকলাই প্রভৃতির ডা'লে বি ভাইটামিনের প্রাচুর্য্য লক্ষিত হইয়াছে।

গোল্ আলুতে ভাইটামিন সি ও বি, পরিমাণে অল্প থাকিলেও আলু সাধারণতঃ বেশী খাওয়া হয় বলিয়া উহা হইতে অনেকটা ভাইটামিন পাওয়া যায়।

অঙ্কুরিত মুগ ও ছোলাতে ভাইটামিন সি উৎপন্ন হয়।

ডিম ও দুধ ভাইটামিন এ এবং ডি'র প্রধান আধার।

আপেল, আঙ্গুর, কমলা, নাসপাতি প্রভৃতি ভাইটামিন 'সি'র জন্য অতি পরিচিত হইলেও উহা সাধারণ বাঙ্গালীর সহজপ্রাপ্য নহে। সুতরাং আমাদের আম, লিচু, আনারস, পেয়ারা, কাগজি ও বাতাবি লেবু, কলা, পেঁপে এবং ট্যমাটোর কথা উল্লেখ করাই যুক্তিযুক্ত। ভাইটামিন প্রসঙ্গে ইহাদের পুণ্য নাম স্মরণ করা হইয়াছে। এখানে টম্যাটো এবং আমের কথা একটু উল্লেখ করিতে চাই।

কমলালেবু, আপেল এবং আঙ্গুরকে পায়ে ধরিয়া সাধিলেও যখন তাহারা বাংলা দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিতে অনিচ্ছুক, তখন দরিদ্রের বন্ধু টম্যাটোকেই সশ্রদ্ধ আহ্বান করা উচিত। ফলতঃ ভাইটামিন সি ও এ'র মূর্ত্তিমান অবতার আপেল বিনিন্দ্যকান্তি এই লিবেস্ আপ্‌ফেলকে (Liebes Apfel = প্রেম ফল—জার্ম্মাণ) বাঙ্গালার তুলসী কুঞ্জের ন্যায় প্রত্যেক গৃহ প্রাঙ্গণেই সাদরে স্থান দেওয়া কর্ত্তব্য। সুপক্ক টম্যাটোর বর্ণসৌষ্ঠবে স্বতঃই বলিতে ইচ্ছা করে—"'লোলকান্ত্যা' যদি ন রমসে লোচনৈর্বঞ্চিতোঽসি"।

তারপর রবীন্দ্রের 'পল্লবঘন আম্রকানন' এবং কালিদাসের 'প্রফুল্ল চূতাঙ্কুরঃ তীক্ষ্ণশায়কঃ' প্রভৃতি কথা চিরদিন ভাবুকের মনে ভাবরসের সঞ্চার করিয়াছে। অবশ্য রসালের রস-সম্ভার যুগে যুগে বাঙ্গালীর রসনারও কম তৃপ্তি সাধন করে নাই। আজ ভাইটামিন 'এ' ও সি'র প্রকৃষ্ট আধার বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়াতে আম্র দরিদ্র ভারত ভূমি ত্যাগ করিয়া জাহাজে উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। জাতীয় ধনাগম ও স্বাস্থ্যলাভ উভয় উদ্দেশ্যেই এখন হইতে দেশে এই অমৃত ফলের চাষের বিস্তার হওয়া সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়।

ভাইটামিন অধ্যায়ে শাক সব্জি, ফলমূল, ও সৌরকরের সঞ্জীবনী শক্তির বিষয় অবগত হইয়া বিস্ময় বিহ্বল চিত্তে বলিতে ইচ্ছা করে—"মাধ্বীর্ণঃ সন্ত্বোষধীঃ। ওঁ মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তু সূর্য্যঃ ওঁ মধু, মধু, মধু।"

আমেরিকা আবিষ্কার

শ্রীঅমিয়কুমার চক্রবর্ত্তী এম-এ

প্রবাদবাক্য বা কিংবদন্তীকে আমাদের দেশের পণ্ডিতগণ বড় একটা আমল দিতে চাহেন না। তাঁহারা ইহাকে মিথ্যা বা ভূয়ো কথা বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন। এই মনোবৃত্তি কিন্তু আমাদের দেশের পক্ষে মোটেই মঙ্গলজনক নহে। অবশ্য বৈজ্ঞানিক প্রমাণের প্রতি লোকের অত্যধিক বিশ্বাস বশতঃই এই ধারণা জন্মিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া কিংবদন্তীকে একেবারে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। প্রত্যেক কিংবদন্তীর পেছনেই একটা কিছু সত্ত্বা আছে, যাহাকে ভিত্তি করিয়া কিংবদন্তীর সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং কিংবদন্তীকে নেহাৎ মিথ্যা বা রচা কথা বলিয়া একেবারে উড়াইয়া না দিয়া তাহার ভিত্তিটুকুর উদ্ধার সাধনের চেষ্টা করাই সমীচীন। ইহাতে এক দিকে যেমন অন্ধকারাচ্ছন্ন অনেক সত্যই আবিষ্কৃত হয়, পক্ষান্তরে দেশের প্রতি একটা মায়া মমতার ভাবও উত্তরোত্তর আমাদের মনে জাগিয়া উঠে। অসুররাজ বলির পাতাল গমনের বিষয়ও এই রকমই একটা কিংবদন্তী যাহাকে আধুনিক পণ্ডিতবর্গ মোটেই বিশ্বাস করেন না, যদিও এ বিষয়ে পুরাণে অনেক কিছু বলা হইয়াছে। মহারাজ বলি ঠিক কোন্ দেশের রাজা ছিলেন তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন হইলেও, তিনি যে অন্ততঃ ভারতসীমান্তের বা মধ্যএশিয়ার কোনও স্থানের রাজা ছিলেন তাহা অনুমান করিয়া লওয়া অসঙ্গত হইবে না। পৌরাণিক এবং মহাকাব্যের প্রমাণের উপর নির্ভর করিলে অসুরভূমিকে মোটামুটি কথায় ভারত-সীমান্তে বা মধ্যএশিয়ায়ই ফেলিতে হয়, যদিও ভারত

মধ্যস্থ অনেক অসুর-রাজ্যের অস্তিত্বের খবরও আমরা এই সমস্ত গ্রন্থে পাইয়া থাকি। সে যাহা হউক, এ কথা ঠিক যে মহারাজ বলি অনার্য্য ছিলেন, এবং তিনি আর্য্য সভ্যতা বিকাশের প্রথম যুগেই রাজত্ব করিতেছিলেন। কশ্যপপুত্র বামন বিষ্ণুর ছলনায় প্রতারিত হইয়া বলির পাতাল গমনের কথা আমাদের দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের মুখেই শুনা যায়। ইহাতে শিক্ষিত অশিক্ষিতের কোন কথাই নাই। সুতরাং বলির পাতাল গমনের ব্যাপারে কিছু সত্য থাকাই খুব সম্ভব, এবং বলির সঙ্গে ভারতের সম্বন্ধ থাকাও খুবই সম্ভবপর ব্যাপার, নতুবা সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া এ বিষয় ভারতের আপামর সাধারণের মধ্যে এ ভাবে ব্যাপ্ত থাকিত না। এখন পাতাল বলিতে ঠিক কোন্ স্থানকে বুঝাইতে পারে তাহাই সমস্যার বিষয়। এ বিষয়ে পুরাণ, মহাকাব্য বা অন্যান্য প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে বিশেষ কিছু সঠিক প্রমাণের অভাব-বশতঃ মহা অসুবিধা হইয়া পড়িয়াছে। এ বিষয়ে একটা কিছু অনুমান করিতে যাওয়া বিপজ্জনক। যাহা হউক, এ ক্ষেত্রে দেশীয় কিংবদন্তীকে আশ্রয় করিয়া আমেরিকাকে পাতাল বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাউক, এবং দেখা যাউক, সংস্কৃত গ্রন্থের কোনও প্রমাণ এই অনুমানকে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে কোনও সাহায্য করে কি না। এ বিষয়ে আমি নিজে স্বাধীন ভাবে, কাহারও সাহায্য ব্যতীত যে যে প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহাই পাঠকবর্গের বিবেচনার জন্য ধরিয়া দিতেছি।

প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ বরাহমিহির তদীয় সুপ্রসিদ্ধ "সূর্য্য-সিদ্ধান্ত" নামক গ্রন্থে বলেন—

মধ্যে সমন্তাদস্যস্য ভূগোলো ব্যোম্নি তিষ্ঠতি।
বিভ্রাণঃ পরমাং শক্তিং ব্রহ্মণো ধারণাত্মিকাম্॥
তদন্তরপুটাঃ সপ্ত নাগাসুর সমাশ্রয়াঃ।
দিব্যৌষধিরসোপেতা রম্যাঃ পাতালভূময়ঃ॥

* * * *

* * * *

উপরিষ্ঠাৎ স্থিতাস্তস্য সেন্দ্রাদেবামহর্ষয়ঃ।
অধস্তাদসুরাস্তদ্বদ দ্বিষন্তোঽন্যোন্যমাশ্রিতাঃ॥

ততঃ সমন্তাৎ পরিধিঃ ক্রমেণায়ং মহার্ণবঃ।
মেখলেব স্থিতো ধাত্র্যা দেবাসুর বিভাগকৃৎ॥

সূর্য্যসিদ্ধান্ত—গোলাধ্যায়

অর্থাৎ অণ্ড বা সৌরজগতের মধ্যে আকাশে পৃথিবী ঘূর্ণায়মান অবস্থায় আছে। এই পৃথিবীকে দুইটি গোলার্দ্ধে বিভক্ত করিলে একটি গোলার্দ্ধের মধ্যে দিব্যৌষধি এবং রসপরিপূর্ণ এবং নাগাসুর অধ্যুষিত সুরম্য পাতালভূমি বিদ্যমান। এই ভূগোলের অর্থাৎ গোলাকার পৃথিবীর উপরাংশে অর্থাৎ উপরের গোলার্দ্ধে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ এবং মহর্ষিগণ বাস করেন, এবং নিম্নাংশে বা নীচের গোলার্দ্ধে তাঁহাদের শত্রু অসুরগণ বাস করেন। এই দেবভূমি এবং অসুরভূমি, উভয়ের মধ্যস্থলে সমুদ্র পৃথিবীকে মেখলার ন্যায় বেষ্টন করিয়া আছে। ইহা দেখিয়া মনে হয় যেন ভগবান, দেবতা এবং অসুর, এই দুই জাতিকে পৃথক্ করিবার জন্যই তাঁহাদের উভয়ের রাজ্যের চতুর্দ্দিকে সমুদ্র দিয়া বেষ্টন করিয়া দিয়াছেন।

দেবভূমি এবং অসুরভূমির এই ভৌগোলিক অবস্থান হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে উপরাংশের বা দেবভূমির বর্ত্তমান নাম এশিয়া, ইয়োরোপ, এবং আফ্রিকা প্রভৃতি মহাদেশ, এবং অসুরভূমির বর্ত্তমান নাম আমেরিকা। এই দুই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডকে প্রশান্ত মহাসাগর, আটলান্টিক মহাসাগর, উত্তর মেরু এবং দক্ষিণ মেরু সাগরসমূহ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, এবং এক ভূখণ্ডকে অন্য ভূখণ্ড হইতে পৃথক্ করিতেছে। সমুদ্রের এই প্রকার অবস্থান দেখিয়াই 'সূর্য্যসিদ্ধান্ত' বলিয়াছেন যে সমুদ্র পৃথিবীকে মেখলার ন্যায় বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে।

দেবভূমিতে অবস্থিত প্রধান প্রধান নগরীর অবস্থান এবং সেখানে বিষুবরেখা এবং অক্ষরেখা প্রভৃতির প্রভাব কতদূর সে বিষয়ে সূর্য্যসিদ্ধান্ত বলেন—

সমন্তান্মেরু মধ্যাস্তু তুল্যভাগেষু তোয়ধেঃ।
দ্বীপেষু দিক্ষু পূর্ব্বাদি নগর্য্যো দেবনির্ম্মিতাঃ॥
ভূবৃত্তপাদে পূর্ব্বস্যাং যমকোটীতি বিশ্রুতা।
ভদ্রাশ্ববর্ষ নগরী স্বর্ণপ্রাকার তোরণা॥
যাম্যায়াং ভারতেবর্ষে লঙ্কাতদ্বন্মহাপুরী।
পশ্চিমে কেতুমালাখ্যে রোমকাখ্যা প্রকীর্ত্তিতা॥

উদক্‌সিদ্ধপুরী নাম কুরুবর্ষে প্রকীর্ত্তিতা।
তস্যাং সিদ্ধা মহাত্মানো নিবসন্তি গতব্যথাঃ॥

* * * *
* * * *

তাসামুপরিগো যাতি বিষুবস্থো দিবাকরঃ।
ন তাসু বিষুবচ্ছায়া নাক্ষস্যোন্নতিরিষ্যতে।

সংক্ষেপে ইহার তাৎপর্য্য এই যে, দেবভূমিতে দ্বীপসমূহে পূর্ব্ব দিকে দেবনির্ম্মিত পুরীসমূহ আছে। ভূবৃত্তপাদে অর্থাৎ মেরুপর্ব্বতের (বর্ত্তমান আল্টাই পর্ব্বত ?) * পাদদেশে পূর্ব্ব দিকে যমকোটী এবং স্বর্ণপ্রাকারতোরণা ভদ্রাশ্ববর্ষ নগরী। দক্ষিণ দিকে ভারতবর্ষে লঙ্কা নামক মহাপুরী, এবং পশ্চিম দিকে কেতুমালবর্ষে রোমকনগরী (রোম নগরী ?) উত্তর দিকে কুরুবর্ষে সিদ্ধপুরুষদিগের আবাসস্থল সিদ্ধপুরী। এই সমস্ত নগরীর এবং দেশের উপরে বিষুবরেখাতে স্থিত সূর্য্যের কিরণ পড়ে; কিন্তু সেখানে বিষুবরেখা এবং অক্ষরেখার কোনও বিশেষ প্রভাব নাই।

সকলেই জানেন যে এশিয়া এবং ইয়োরোপ মহাদেশের উপর দিয়া বিষুবরেখা যায় নাই। কেবল আফ্রিকা মহাদেশের নীচের দিক দিয়া বিষুবরেখা চলিয়া গিয়াছে। বিষুবরেখা এবং অক্ষরেখার (Tropic of Cancer) মধ্যবর্ত্তী উষ্ণমণ্ডলের প্রভাবও দেবভূমিতে (আফ্রিকা ছাড়া) বিশেষ নাই। কেবল ভারতের দাক্ষিণাত্য এবং ব্রহ্মদেশ ও শ্যাম এবং আরবদেশের সামান্য পরিমাণ স্থানের উপরই উষ্ণমণ্ডলের প্রভাব।

এবার দেবলোকে এবং পাতালভূমিতে সূর্য্যকিরণের প্রকৃতি কিরূপ তাহা দেখা যাউক। সূর্য্যসিদ্ধান্ত বলেন—

মেষাদৌ দেবভাগস্থে দেবাণাং যাতি দর্শনম্।
অসুরাণাং তুলাদৌ তু সূর্য্যস্তদ্ভাগসঞ্চরঃ॥
অত্যাসন্নতরা তেন গ্রীষ্মে তীব্রকরারবেঃ।
দেবভাগে সুরাণাং তু হেদন্তে মন্দতাঽন্যথা॥

অর্থাৎ মেষাদি ছয়টি রাশিতে (মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ এবং কন্যা) সূর্য্য দেবভাগে বিচরণ করে, এবং তুলাদি ছয়টি রাশিতে (তুলা, বৃশ্চিক, ধেনু, মকর, কুম্ভ এবং মীন) সূর্য্য অসুরভূমিতে বিচরণ করে। এই মেষাদি ছয়টি রাশি বৈশাখ মাস হইতে আরম্ভ হইয়া আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত থাকে। সুতরাং বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র এবং আশ্বিন এই ছয়টি মাসে সূর্য্য দেবভূমির ঠিক উপরে কিরণ দেয় (shines perpendicularly)। তখন সূর্য্যের উত্তরায়ণ হয়। এই উত্তরায়ণে সূর্য্য বিষুবরেখার উত্তরাংশে দেবভূমিতে থাকে বলিয়া সেখানে সূর্য্যের তাপ প্রখর হয় এবং গ্রাষ্মাদি ঋতুর আবির্ভাব হয়। পক্ষান্তরে, দক্ষিণায়নে তুলাদি ছয়টি রাশিতে এবং সেই হেতু কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন, এবং চৈত্র এই ছয় মাসে সূর্য্য অসুরভূমির অর্থাৎ বিষুবরেখার দক্ষিণ দিকে থাকে, এবং সোজা ভাবে (perpendicularly) কিরণ দেওয়ায় সেখানে সূর্য্য-কিরণের তীব্রতা দেখা যায়, এবং গ্রীষ্মাদি ঋতুরও আবির্ভাব দেখা যায়। সুতরাং এই কয়টি মাসে দেবভূমিতে সূর্য্যের দূরত্বনিবন্ধন সূর্য্যকিরণের মন্দতা দেখা যায়, এবং তখন সেখানে হেমন্ত, শীতাদি ঋতুর প্রাদুর্ভাব হয়! ঠিক এই কারণেই মেষাদি ছয়টি রাশিতে সূর্য্যের দূরত্বনিবন্ধন অসুরলোকে শীতাদি ঋতুর প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। কাজেই দেবভূমিতে যখন শরৎ কাল, তখন অসুরভূমিতে বসন্ত কাল; এবং দেবভূমিতে যখন বসন্ত কাল, অসুরভূমিতে তখন শরৎ কাল। ভূপৃষ্ঠের এক দিকে অর্থাৎ এশিয়া ইয়োরোপ প্রভৃতি মহাদেশের ঋতুর সঙ্গে ভূপৃষ্ঠের অপর পার্শ্বের ঋতুর তুলনা করিলে দেখা যায় যে ঋতুর এইরূপ বৈচিত্র্য দক্ষিণ আমেরিকায় এবং উত্তর আমেরিকার মেক্সিকো প্রভৃতি কয়েকটি দেশে দেখা যায়।

দেবভূমি এবং অসুরভূমিতে দিনমান এবং রাত্রিমানের সময়ের পার্থক্য সম্বন্ধে সূর্য্যসিদ্ধান্ত বলেন—

অতো দিনক্ষেপে তেষামন্যোন্যং হি বিপর্য্যয়াৎ।
অহোরাত্রপ্রমাণং চ ভানোর্ভগনপুরণাৎ॥
দিনক্ষপাধমেতেষাময়নান্তে বিপর্য্যয়াৎ।
উপর্য্যাত্মানমন্যোন্যং কল্পয়ন্তি সুরাসুরাঃ॥

তাৎপর্য্য :—ভানুর ভগন এবং পুরণ দ্বারা দেবলোকের এবং অসুরলোকের রাত্রির প্রমাণ হয়। দেবলোকে যখন দিন তখন অসুরলোকে রাত্রি, এবং অসুরলোকে যখন দিন তখন দেবলোকে রাত্রি হয়। "যদা দেবানাং দিনং তদা দৈত্যানাং রজনী, যদা দেবানাং রাত্রিস্তদা দৈত্যানাং দিনমিতি"। দেবতারা মনে করেন যে তাঁহারা উপরে আছেন, এবং অসুরগণও মনে করেন যে তাঁহারাই উপরে আছেন। আমাদের যখন দিন তখন আমেরিকায় রাত্রি হইয়া থাকে, এবং আমাদের যখন রাত্রি তখন আমেরিকায় দিনমান হইয়া থাকে। আমরা মনে করি যে আমরাই ভূপৃষ্ঠের উপরেই আছি, এবং আমেরিকার অধিবাসিগণ নীচে আছেন; এবং আমেরিকান্‌গণও মনে করেন যে তাঁহারাই ভূপৃষ্ঠের উপরে আছেন। পরস্পরের এরূপ মনে করিবার কারণ এই যে পৃথিবী ঘূর্ণায়মান অবস্থায় আছে। পর্য্যায়ক্রমে উভয় দিকই উপরে এবং নীচে যায়।

পাতাললোক সম্বন্ধে মহাভারতে আছে—

অত্র সূর্য্যাংশুভির্ভিন্না পাতালতলমাশ্রিতাঃ।
মৃতা হি দিবসে সুত পুনর্জীবন্তে বৈ নিশি॥

উদ্যোগপর্ব্ব—৯৯ অধ্যায়

অর্থাৎ নারদ ইন্দ্রসারথি মাতলিকে বলিতেছেন, "এ স্থান (পাতাল) সূর্য্যকিরণ হইতে পৃথক্। অর্থাৎ দেবলোকে যখন সূর্য্য দেখা যায় তখন এ স্থানে সূর্য্যকিরণ থাকে না। এখানকার অধিবাসিগণ আমাদের যখন দিন তখন নিদ্রিত থাকে, এবং আমাদের যখন রাত্রি তখন ঘুম হইতে জাগিয়া উঠে।" এখানে মৃত অর্থে গতপ্রাণ নহে, মৃত অর্থে নিদ্রিত। কারণ দিবসে মৃত লোক রাত্রিতে কখনও বাঁচিয়া উঠিতে পারে না। আমাদের যখন দিন তখন পাতাল বা আমেরিকায় রাত্রি থাকে, এবং তজ্জন্যই সেখানকার অধিবাসিগণ নিদ্রিত থাকে। আমাদের যখন রাত্রি তখন তাহাদের দিন; কাজেই তাহারা ঘুম হইতে জাগিয়া উঠে।

এই সমস্ত প্রমাণ হইতে মোটামুটি ধরিয়া লওয়া যায় যে সূর্য্যসিদ্ধান্ত বর্ণিত পাতালভূমি আমেরিকা ব্যতীত আর কিছুই নহে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে পাতালভূমি দক্ষিণ মেরু বা কুমেরুতে অবস্থিত ছিল। সম্প্রতি দক্ষিণ মেরুতে জলের নীচে (২।৩ হাত মাত্র নীচে) এক বিরাট ভূমিখণ্ডের আবিষ্কার হইয়াছে। তাঁহারা হয় ত বলিবেন যে এই স্থানকেই পূর্ব্বে পাতাল বলা হইত। কিন্তু পাতালভূমি দক্ষিণ মেরুতে হইলে তাহার সম্বন্ধে উপর নীচের কথা আসিতে পারে না। পৃথিবীর অবস্থান সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে পৃথিবী শূন্যে কাৎ হইয়া ঘুরিতেছে; উপরে উত্তর মেরু এবং নীচে দক্ষিণ মেরু। ঘুরিবার নিয়ম হইল পূর্ব্ব এবং পশ্চিম দিকে। সুতরাং এই ঘূর্ণনের ফলে পূর্ব্ব গোলার্দ্ধ (old world) এবং পশ্চিম গোলার্দ্ধ (new world) পর্য্যায় ক্রমে উপরে এবং নীচে যায়। যদি পৃথিবী পূর্ব্ব এবং পশ্চিমে না ঘুরিয়া উত্তর এবং দক্ষিণ দিকে ঘুরিত, তবে পর্য্যায়ক্রমে উত্তর মেরু এবং দক্ষিণ মেরু উপরের দিকে এবং নীচের দিকে যাইত। তাহা হইলে বিষুবরেখার (Equator) দুই দিকে অবস্থিত ভূখণ্ড, উত্তর গোলার্দ্ধ এবং দক্ষিণ গোলার্দ্ধ, পর্য্যায়ক্রমে উপরের দিকে এবং নীচের দিকে যাইত, এবং তথাকার অধিবাসিগণও বলিতেন যে আমরাই উপরে রহিয়াছি ও অন্যেরা নীচে আছেন। এরূপ কিন্তু পূর্ব্ব গোলার্দ্ধ এবং পশ্চিম গোলার্দ্ধের লোকেরাই মনে করিয়া থাকেন। "সূর্য্যসিদ্ধান্তের" অধ্যাপকগণ, অর্থাৎ যাঁহারা "সূর্য্যসিদ্ধান্ত" পড়াইয়া থাকেন তাঁহারা,

"মেষাদৌ দেবভাগস্থে দেবানাং যাতি দর্শনম্।
অসুরাণাং তুলাদৌ তু সূর্য্যস্তদ্ভাগ সঞ্চরঃ॥"

এই শ্লোকের অর্থ উত্তর গোলার্দ্ধ এবং দক্ষিণ গোলার্দ্ধ এই পর্য্যন্ত বুঝিয়াই সন্তুষ্ট হইয়া আছেন। কিন্তু পূর্ব্বের শ্লোক "উপরিষ্টাৎ স্থিতাস্তস্য···ইত্যাদি, এবং পরবর্ত্তী শ্লোক "উপর্য্যাত্মানং·····সুরাসুরাঃ" ইত্যাদি এবং দিনমান এবং রাত্রিমান সম্বন্ধীয় শ্লোকগুলির স্পষ্টার্থ না বুঝিয়া পাতাল-ভূমিকে আমেরিকা না বলিয়া দক্ষিণ মেরু বলিয়া থাকেন। সত্য বটে, পাতালভূমির অনেকাংশ দক্ষিণ গোলার্দ্ধে অবস্থিত। কিন্তু এই পাতালভূমি যে পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠে অবস্থিত এবং চারিদিকে সমুদ্রদ্বারা পরিবেষ্টিত, এবং ইহা যে আমেরিকা, এই কথা তাঁহারা কখনও বলেন নাই। বস্তুতঃ আমেরিকার সর্ব্বাংশ দক্ষিণ গোলার্দ্ধে না হইলেও সূর্য্যসিদ্ধান্ত যে পাতালভূমিকে মোটামুটি ভাবে সমগ্র আমেরিকাই ধরিয়া লইয়াছিলেন ইহা অনেকটা অনুমান করিয়া লওয়া খুব অসঙ্গত হইবে না।

এই সমস্ত প্রমাণের বিরুদ্ধে যে কিছু বলিবার নাই তাহাও আমি অস্বীকার করিতেছি না। তবে এই প্রমাণের স্বপক্ষে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া আমি আমার মতকে দৃঢ় করিতে চেষ্টা করিব। এই প্রবন্ধে

* মেরুপর্ব্বত এবং দেবভূমি সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ আমি ইতিপূর্ব্বে ভারতবর্ষে ১৩৩৭ চৈত্র এবং ১৩৩৮ বৈশাখ সংখ্যায় "লোকতত্ত্ব" নামক প্রবন্ধে দিতে চেষ্টা করিয়াছি। অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গ ঐ প্রবন্ধটি পড়িয়া দেখিলে সহজেই বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

ভারতবর্ষ বলিতে বর্ত্তমান বৃটিশ ভারতকে বুঝাইতেছে না, বৃহত্তর ভারতকেই বুঝাইতেছে। এই বৃহত্তর ভারত প্রাচীন কালে সুদূর মধ্যএশিয়ার প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আর মধ্যএশিয়ার সঙ্গে যে মানব-সভ্যতার প্রথম হইতেই ভারতবর্ষ রাজনীতিক এবং সমাজনীতিক ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ছিল, তাহাও বর্ত্তমানে সর্ব্ববাদীসম্মত সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। যুগের পর যুগ ধরিয়া মধ্যএশিয়া হইতে বহু জাতি আসিয়া ভারতে বসতি স্থাপন করিয়াছে—ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। মহারাজ বলি ভারতে না হইয়া মধ্যএশিয়া অথবা উত্তর এশিয়ার কোনও স্থানের রাজা হইলেও এই কারণেই ভারতে এত সুপরিচিত।

এবার আমেরিকার আদিম অধিবাসিগণ সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। আমেরিকার আদিম অধিবাসিগণকে সাধারণ কথায় রেড ইণ্ডিয়ান বলা হয় (Red Indian)। নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ বহু গবেষণার ফলে স্থির করিয়াছেন যে এই রেড ইণ্ডিয়ানগণ আমেরিকার ভূঁইফোড় লোক নহেন। তাঁহার পৃথিবীর অন্য এক স্থান হইতে অতীতের কোন এক সুদূর দিনে আমেরিকায় আসিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন।

"The absence of anthropoid apes from America at any period of the world's history, clearly precludes the possibility of man's having originated independently in the New World, even if the anthropoids be collateral descendants with man of a remote common ancestor. The population of America must, therefore, have come from the Old World. Only two probable routes exist..... ..... We are, therefore, compelled to look to a further extension of land between North America and Northern Europe on the one hand, and between Northwest America and North-east Asia on the other."

Wanderings of Peoples by Prof. Haddon F. R. S., p. 73. cf. Keane, Man: Past and Present, pp. 336-37.

অর্থাৎ আমেরিকায় মানুষের পূর্ব্বপুরুষ বানরগণের অস্তিত্বের কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না বিধায় স্বীকার করিতে হয় যে আমেরিকার অধিবাসিগণ মূলতঃ তথাকার ভূঁইফোড় লোক নহেন। সুতরাং পূর্ব্ব গোলার্দ্ধ হইতেই (Old World) মানুষ যাইয়া আমেরিকায় বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। পূর্ব্ব গোলার্দ্ধ হইতে আমেরিকায় যাইবার দুইটি সম্ভবপর এবং প্রশস্ত রাস্তা দেখা যায়।..... ...মানবসভ্যতার সেই আদিম যুগে জলপথ অপেক্ষা স্থলপথেই যাতায়াতের সম্ভাবনা অধিক থাকায় আমরা ধরিয়া লইতে বাধ্য হই যে এক দিকে উত্তর আমেরিকা ও উত্তর ইয়োরোপ স্থল দ্বারা যুক্ত ছিল, অপর দিকে উত্তর-পশ্চিম আমেরিকা উত্তর-পূর্ব্ব এশিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল।

পণ্ডিতপ্রবর কীন্ (Keane) সাহেবও এই কথাই বলেন (Keane, Man: Past and Present pp. 336-37)।

পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হইল যে আমেরিকার আদিম অধিবাসিগণ খাস আমেরিকার লোক নহেন; তাঁহারা হয় এশিয়া মহাদেশের নতুবা ইয়োরোপের লোক। এবার তাঁহাদের আকৃতি প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যাইবে তাঁহারা ঠিক কোন্ মহাদেশের লোক। এ সম্বন্ধে অধ্যাপক হ্যাডন্ বলেন—

"Ethnologists are generally agreed as to the similarity of type prevailing among most of the peoples of the New World, which points to an original common parentage. For instance, the coarse, lank, black hair is a prevailing characteristic throughout both the Northern and the Southern continent, and in other respects a resemblance to the Mongoloid type is equally widespread. Thus, it is to Asia rather than to Europe that we must look for the first ancestors of the American Indians, though it would not be correct to regard them as a branch of the Mongol race."

Haddon, Wanderings of Peoples, p. 76.

অর্থাৎ আমেরিকার আদিম অধিবাসিগণের অধিকাংশেরই আকৃতি প্রকৃতি এক প্রকার দেখিয়া নৃতত্ত্ববিদগণ সকলেই স্বীকার করেন যে তাঁহারা একই জাতির অন্তর্ভুক্ত। তাঁহাদের সরু, কাল, খাড়া চুল দেখিয়া মনে এই প্রতীতি জন্মে যে মঙ্গোলয়েড জাতির সঙ্গে ইঁহাদের খুব সাদৃশ্য আছে। সুতরাং তাঁহাদের পিতৃপুরুষদিগের

আদিম বাসস্থান তল্লাস করিতে হইলে আমরা স্বভাবতঃই ইয়োরোপের দিকে না তাকাইয়া এশিয়ার দিকে তাকাইব। এ সম্বন্ধে পণ্ডিতপ্রবর কীন্ (Keane) আরও স্পষ্টতর ভাবে বলিতেছেন—

"Nevertheless he believes in the original unity of the Indian race in America, basing his conclusions on the colour of the skin, which ranges from yellowish white to dark brown, the straight black hair, scanty beard, hairless body, brown and often more or less slanting eye, etc., etc.....In all these characters the American Indians resemble the yellowish brown peoples of eastern Asia and a large part of Polynesia. He also believes that there were many successive migrations from Asia." Keane, Man; Past and Present, pp. 340-41.

cf. A. Hrdlicka, American Anthropology, Vol. XIV, 1012, p. 10; and Wissler. Relation of Nature to Man, pp. 209-10.

অর্থাৎ কীন্ সাহেব সুপণ্ডিত Hrdlicka সাহেবের মত বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিতেছেন যে তিনি (Hrdlicka) আমেরিকান ইণ্ডিয়ান্‌গণের শরীরের রং, যাহা সাদা এবং হলদে মিশ্রিত হইতে গাঢ় পীতবর্ণ পর্য্যন্ত দেখা যায়, খাড়া কাল চুল, স্বল্প শ্মশ্রু, লোমবিহীন দেহ, এবং পিঙ্গলবর্ণ ও অল্পবিস্তর কাৎ করা চক্ষু দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে তাঁহারা মূলতঃ একই জাতির অন্তর্ভুক্ত। এই সমস্ত আকৃতি প্রকৃতি অনুসারে দেখা যায় যে আমেরিকান ইণ্ডিয়ানগণের সঙ্গে পূর্ব্ব এশিয়া এবং পলিনেশিয়ান (প্রশান্ত মহাসাগরস্থ দ্বীপবিশেষ) হলদে-পীত জাতির বিশেষ সৌসাদৃশ্য আছে। উক্ত Hrdlicka সাহেব আরও বিশ্বাস করেন যে এশিয়া হইতে পর পর অনেক দল লোক যাইয়া আমেরিকায় বসবাস করিতে আরম্ভ করেন।

এই ত গেল বাহ্যিক আকৃতি প্রকৃতির সাদৃশ্য। এবার ভাষাগত এবং দৃষ্টিগত সাদৃশ্য সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। এ সম্বন্ধে অধ্যাপক A. F. Chamberlain মহাশয় বলেন :—"Certain real relationships between the American Indians and the peoples of North Eastern Asia, known as "Paleo-Asiatics, have, however, been revealed as a result of extensive investigations of the Jesup North Pacific Expedition. The general conclusion to be drawn from the evidence is that the so-called 'Paleo-Asiatic' peoples of North-eastern Asia, i. e., the Chukchee, Kamchadale, Gilyak, Yukaghir, etc., really belong physically and culturally with the aborigines of North western America..... .....It is the opinion of good authorities also that the 'Paleo-Asiatic' peoples belong linguistically with the American Indians, rather than with the other tribes and stocks of Northern or Southern Asia.

American Anthropology, vol. XIV, 1912, p. 55.

সংক্ষেপে ইহার তাৎপর্য্য এই—অধ্যাপক এ, এফ, চেম্বারলেনের মতে Jesup North Pacific Expedition কর্ত্তৃক বিশেষ অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে, আমেরিকান ইণ্ডিয়ান এবং উত্তর-পূর্ব্ব এশিয়ার অধিবাসিগণের মধ্যে (যেমন চাক্‌চি, কামচাডেল, গিলজাক, জুকাখির প্রভৃতি জাতিসমূহ) দৈহিক এবং কৃষ্টিগত সম্বন্ধ বিশেষ ভাবেই বিদ্যমান। বিশেষজ্ঞগণ এ কথাও বলেন যে "Paleo-Asiatic" (অর্থাৎ এশিয়ায় আদিম অধিবাসী) লোকগণের সহিত উত্তর বা দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য জাতিসমূহের অপেক্ষা আমেরিকান ইণ্ডিয়ানগণেরই ভাষাগত সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠভাবে বর্ত্তমান আছে দেখা যায়।

অতএব দেখা গেল যে উত্তর-পূর্ব্ব এসিয়ার তথাকথিত মঙ্গোলয়েড জাতি বা পেলিও-এশিয়াটিক জাতিই প্রথমে আমেরিকায় যাইয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। আমেরিকান ইণ্ডিয়ানগণ প্রকৃতপক্ষে মঙ্গোলয়েড বা পেলিও-এশিয়াটিক জাতির মতই খিচুড়ি জাতি। "The American Indians are more diversified in type than in language. The Loncheur, for instance, were said by Petitot to resemble the Hindus, whereas others were Mongols or Tartars or Samoyed etc."

Scientific American, 1932, Aug., p. 89.

অর্থাৎ আমেরিকান ইণ্ডিয়ানগণের মধ্যে ভাষাগত পার্থক্য অপেক্ষা দৈহিক আকৃতি প্রকৃতির পার্থক্য অনেক বেশী। উদাহরণ স্বরূপ দেখান যাইতে পারে যে লঙ্কেউর নামক

জাতির আকৃতি-প্রকৃতি হিন্দুদের মত; এতদ্ভিন্ন অন্যান্য জাতিসমূহ এশিয়ার মঙ্গোল, তাতার, সেমোয়েড প্রভৃতি জাতির ন্যায়,—ইহাই পণ্ডিতপ্রবর পেটিটটের ধারণা।

এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে এশিয়ার এই মঙ্গোলয়েড বা পেলিও-এশিয়াটিক জাতি প্রথম কখন এবং কোন্ রাস্তা দিয়া আমেরিকা গিয়াছিলেন। প্রথমোক্ত বিষয়ে যদিও কোন স্থিরসিদ্ধান্ত আজ পর্য্যন্ত হয় নাই, তথাপি আমরা বিশেষজ্ঞগণের মত উদ্ধৃত করিয়া একটা কিছু বলিতে চেষ্টা করিব। দ্বিতীয় বিষয়ে এ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত প্রমাণাদির সাহায্যে একটা কিছু সিদ্ধান্ত করা কঠিন নহে। যাহা হউক এ বিষয়েও আমরা পণ্ডিতগণের মতানুসরণ করিয়া সম্ভবপর ব্যাপারেরই সমর্থন করিব. এবং এতৎসঙ্গে পুরাণাদির উপাখ্যানের কথা বাদ দিয়া মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া, এবং মানবজাতির বিস্তারের সেই চির পুরাতন এবং চির-নূতন কারণেরই অবতারণা করিয়া কিছু বলিতে প্রয়াস পাইব।

পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ বিশ্বসৃষ্টির প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবীর বয়সকে নানা প্রকার ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। আমাদের পুরাণাদিতে উক্ত "কল্প" প্রভৃতির ন্যায় এই যুগ-সমূহও এক একটি বহু সহস্র বৎসরে ব্যাপ্ত। এই এক একটি বহুসহস্রবৎসরব্যাপী যুগের মধ্যেও স্থলবিশেষে ২।৩টি করিয়া স্তর আছে। পেলিওলিথিক্, নিওলিথিক্ প্রভৃতিও এইরূপ এক একটি যুগবিশেষ, যাহাদের মধ্যে সভ্যতার ভিন্ন ভিন্ন স্তর আছে (Different stages of civilisation in the Paleolithic and the Neolithic periods)। এই যুগ এবং স্তরসমূহ অবশ্য অনেকটা অনুমানের উপরই প্রতিষ্ঠিত। উক্ত পেলিওলিথিক যুগের মধ্যে সলুট্রিয়ান (Solutrean) এজিলিয়ান (Azilian) প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুগ এবং স্তর আছে। এক এক যুগে মানুষ ক্রমসভ্যতার নিয়মানুযায়ী ধাপে ধাপে উচ্চ সভ্যতার দিকে অগ্রসর হইয়াছে। পৃথিবীর সমস্ত দেশেই মানব-সভ্যতার মধ্যে এই বিভিন্ন যুগ এবং স্তরসমূহ বর্ত্তমান আছে। অবশ্য ইহাও ঠিক যে সকল দেশেই এক যুগ একই সময়ে আরম্ভ হয় নাই। প্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক Keith (কীথ) সাহেবের মতে সাধারণতঃ পেলিওলিথিক যুগ খৃঃ পূঃ দশ সহস্র বৎসরের বহু পূর্ব্ব হইতে (যেমন ২৫০০০, ২০০০০ বৎসর হইতে) ধরা হয়, অর্থাৎ পেলিওলিথিক যুগ খৃঃ পূঃ ২০০০০।২৫০০০ অব্দ হইতে খৃঃ পূঃ ১০০০০ অব্দ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। নিওলিথিক যুগ ছিল (Neolithic) খৃঃ পূঃ ৮০০০ অব্দ হইতে খৃঃ পূঃ ২০০০ অব্দ পর্য্যন্ত। এই দুই বিশাল যুগের মধ্যে ছিল এজিলিয়ান যুগ বা স্তর (খৃঃ পূঃ ১০০০০—খৃঃ পূঃ ৮০০০)। অতঃপর আরম্ভ হয় ব্রোঞ্জের যুগ ((Age of Bronze)। লৌহ যুগ (Iron Age) আসিয়াছে খৃষ্টের জন্মের অল্প কিছু কাল পূর্ব্বে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে আমেরিকায় মানুষের পূর্ব্বপুরুষ বানরের (Anthropoid monk) কঙ্কাল পাওয়া যায় না। সেখানে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন যে সমস্ত নরকঙ্কাল এবং আদিম মানুষের প্রস্তর নির্ম্মিত অস্ত্র-শস্ত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহার সহিত এশিয়া এবং ইয়োরোপ-খণ্ডে প্রাপ্ত একই প্রকারের নরকঙ্কাল এবং প্রস্তর নির্ম্মিত অস্ত্র-শস্ত্রের বিচার করিয়া পণ্ডিতগণ একপ্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আমেরিকায় আদিম মানব পদার্পণ করিয়াছিল এখন হইতে ১৮০০০—১৫০০০ বৎসরের মধ্যে। এ সম্বন্ধে লস্ এঞ্জেলসের (Los Angelos) সাউথ-ওয়েষ্ট যাদুঘরের অধ্যক্ষ (curator) পণ্ডিতপ্রবর Harrington (হ্যারিংটন) বলেন—"We can therefore say that according to most of the evidence at hand, man came to America in the Solutrean stage of the Late Paleolithic in the upper Pleistocene period, about 15000 to 18000 years ago.

Probably there was a centre somewhere in Asia where Solutrean man developed his superior flint work, from which streams of migration carried it westward into Europe and eastward into America.....That other migrations occurred or continued on up into the Neolithic period cannot be doubted."

Scientific American, July, 1932, p. 10.

সুতরাং দেখা গেল যে আনুমানিক ১৫।১৬ হাজার বৎসর পূর্ব্বে এসিয়া হইতে মানবজাতি প্রথম যাইয়া আমেরিকায় বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহারা যে যুগে আমেরিকায় গিয়াছিলেন তাহা ছিল প্রস্তরের যুগ; সমস্ত অস্ত্র শস্ত্রাদি তখন পাথর দ্বারাই নির্ম্মিত হইত। পরবর্ত্তী

যুগসমূহেও মধ্যএশিয়া এবং উত্তর-পূর্ব্ব এশিয়া হইতে দলের পর দল যাইয়া আমেরিকায় বসবাস করিতে থাকেন। নিওলিথিক যুগ পর্য্যন্তও (অর্থাৎ ৮০০০—২০০০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত) যে দলে দলে এশিয়াবাসিগণ আমেরিকায় গিয়াছিলেন সে বিষয়ে পণ্ডিতপ্রবর হ্যারিং-টন নিঃসন্দেহ। এবার আমরা রাস্তার বিষয় খানিকটা আলোচনা করিব। সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে নৌকা, জাহাজ প্রভৃতি চালনা বিষয়ে অনভিজ্ঞ উত্তর-পূর্ব্ব এশিয়ার অর্দ্ধসভ্য মানবকুল কি উপায়ে আমেরিকা যাইয়া পৌছিলেন, তাহা জানিতে বাস্তবিকই আমাদের কৌতূহল উদ্দীপিত হয়। নিম্নে আমরা এ যাবৎ প্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক প্রমাণাদির সাহায্যে সেই রহস্যেরই দ্বার উদ্ঘাটন করিতে চেষ্টা করিব এবং এই সঙ্গে আমরা এশিয়াবাসীর সেই বিপৎসঙ্কুল রাস্তা পার হইয়া আমেরিকায় যাইয়া বসবাস করিবার সম্ভবপর কারণ সম্বন্ধেও মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া কিছু কিছু বলিতে চেষ্টা করিব। অবশ্য এই কারণ প্রদর্শনের মধ্যে বর্ত্তমানে পৌরাণিক বা উপাখ্যানমূলক কোন প্রমাণই দেখান হইবে না।

সমস্ত বিষয় দেখিয়া শুনিয়া ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ এবং নৃতত্ত্ব-বিদ্‌গণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে বর্ত্তমান কালের বেরিং প্রণালী (Bering strait যাহা এশিয়া এবং আমেরিকাকে বিভক্ত করিতেছে) প্রাগৈতিহাসিক যুগে বেরিং যোজক ছিল। বেরিং প্রণালীর দুই তীরস্থ মাটীর প্রকৃতি এক রকম দেখিয়া ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ এই সিদ্ধান্তের উপরই বিশেষ জোর দেন। পূর্ব্বেও আমি অন্য স্থলে প্রসঙ্গক্রমে হ্যাডন্ এবং কীন্ নামক (Haddon and Keane) দুই মহামনীষীর এবম্প্রকার সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিয়াছি। সুতরাং আমরা নিঃসন্দেহে এই সিদ্ধান্তে পৌছিতে পারি যে পেলিও-এশিয়াটিক জাতি প্রথমতঃ বেরিং যোজক পার হইয়াই আমেরিকায় উপনীত হইয়াছিলেন। যদি কেহ এর পরও সন্দেহ করেন যে ১৫০০০ বৎসর পূর্ব্বে বেরিং প্রণালী বেরিং প্রণালীই ছিল, বেরিং যোজক ছিল না, তাহা হইলেও এই বেরিং পার হইয়াই যে এশিয়াবাসী আদিম মানব আমেরিকা গিয়াছিলেন, এ বিষয় প্রমাণ করিতেও বিশেষ কষ্ট হইবে না।

এশিয়া এবং আমেরিকার মানচিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে এই দুই মহাদেশের মধ্যবর্ত্তী বেরিং প্রণালীর প্রস্থ মাত্র ৪০ মাইল। আকাশ যেদিন পরিষ্কার থাকে সেদিন এক পার হইতে অপর পার স্পষ্ট দেখা যায়। এই সামান্য ব্যবধানটুকু আদিম মানবের পক্ষেও যথেষ্ট বাধা নহে। এতদ্ব্যতীত এই প্রণালীতে ডায়োমেড নামক দুইটী দ্বীপ অবস্থিত থাকায় (the two Diomede Islands) ইহা পার হইবার পক্ষে বিশেষ সুবিধারই সৃষ্টি হইয়াছিল। তিতীর্ষু দলের পক্ষে এই যোড়াদ্বীপ বিশ্রাম-স্থলের কাজই সম্ভবতঃ করিয়াছিল। কিঞ্চিৎ দক্ষিণ দিকে এল্যুটিয়ান দ্বীপপুঞ্জ (The Alutian Archipelago)ও যেন একটি প্রাকৃতিক সেতুর কাজই করে। উপনিবেশ স্থাপনেচ্ছু বিরাট বাহিনীর কথা বাদ দিলেও একটু সাহসী মৎস্যজীবী অথবা নৌকার মাঝিই ঐ দ্বীপপুঞ্জ অতিক্রম করিয়া আমেরিকায় পৌছিতে পারে। কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের পক্ষ হইতে কাপ্তেন বার্কলে কেনন (Capt. Barclay Kennon) নামক একজন সুদক্ষ নাবিক উত্তর প্রশান্ত মহাসাগর পর্য্যবেক্ষণ করিতে গিয়াছিলেন। তিনি সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া পণ্ডিতপ্রবর Lelandএর নিকট যে চিঠি দিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ এ স্থলে করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তিনি লিখিয়াছিলেন যে গ্রীষ্মকালে একজন নৌকার মাঝি খোলা নৌকাতে করিয়া এল্যুটিয়ান দ্বীপপুঞ্জ হইয়া কামস্কাট্‌কা হইতে অলস্কা উপদ্বীপ (From Kamskatka—to Alaska) পর্য্যন্ত সহজেই পৌছিতে পারে; এবং এই সামান্য জলভাগ অতিক্রম করিবার সময় সে সর্ব্বদাই স্থলভাগের সন্ধান পাইবে। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দের ১২ই আগষ্ট তারিখে কাপ্তেন কুক্ (Capt. Cook)ও বেরিং প্রণালী হইতে একই সময়ে এশিয়া এবং আমেরিকা উভয় ভূখণ্ডকেই দেখিয়া-ছিলেন (cf. Buzley, The dawn of modern Geography, p. 497, ff. 1 & 2)। ডায়োমেড নামক দ্বীপদ্বয়ে ইদানীং কালে যে প্রাচীন মানবের কঙ্কাল এবং অস্ত্রশস্ত্রাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের রকম-সকম দেখিয়া শুধু ইহাই প্রমাণিত হয় যে প্রাগৈতিহাসিক যুগের আমেরিকা-গমন-প্রয়াসী যাত্রীদল এই দুই দ্বীপে কিয়ৎকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। তবে তাঁহারা সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন নাই; করিবার কল্পনা করেন নাই। সুতরাং প্রণালীই থাকুক আর যোজকই থাকুক, ইহা ঠিক যে

পেলিও-এশিয়াটিক বা মঙ্গোলয়েড্ জাতি বেরিং পার হইয়াই আমেরিকা গিয়াছিলেন কি এবার এশিয়াবাসিগণের আমেরিকা গমনের সম্ভবপর কারণ সম্বন্ধেই কিছু আলোচনা করিব।

আমরা যে যুগের কথা বলিতেছি সে যুগে আমেরিকায় মানুষ ছিল না, সেখানে ছিল কেবল জীবজন্তু আর প্রকৃতিদত্ত প্রচুর দ্রব্যসম্ভার। মানুষ না থাকার দরুণ এই সমস্ত জীবজন্তু কেবল বাড়িয়াই চলিতেছিল, এবং প্রকৃতির দান, শস্য, ফলমূল প্রভৃতি উপযুক্ত ভোক্তার অভাবে নষ্ট হইয়া যাইতেছিল। পক্ষান্তরে অগণিত কাল হইতে এশিয়ার মানবজাতি কেবল বৃদ্ধিই পাইতেছিল এবং সেই হেতু সেখানকার খাদ্যসম্ভারও আস্তে আস্তে কমিতেছিল। এমন কি খাদ্যান্বেষণে এশিয়ার যাযাবর জাতিসমূহ (nomads) সীমান্ত দেশগুলি পর্য্যন্ত চষিয়া বেড়াইতেছিল। বন, জঙ্গল, তুষারাবৃত স্থান, যেমন সাইবেরিয়া, কামস্কাট্কা প্রভৃতিও তাহাদের অগম্য রহিল না। যাযাবর জাতির সাধারণ ধর্ম্মই হইতেছে এক দেশ হইতে আর এক দেশে যাওয়া। তাহারা কৃষিকার্য্য জানে না বা করে না বলিয়াই প্রকৃতিদত্ত জিনিসসমূহই তাহাদের প্রধান অবলম্বন। এক স্থানের জিনিস ফুরাইয়া গেলে অথবা অধিকতর শক্তিশালী কোনও জাতি কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইলে তাহারা স্বদেশ ছাড়িয়া অন্য দেশের সন্ধানে বাহির হয়। বাস্তবিক পক্ষে স্বদেশ বলিতে তাহাদের কিছুই নাই। যেখানে যখন থাকে, তখনকার মত ইহাই তাহাদের স্বদেশ। সাইবেরিয়া প্রভৃতি স্থানে আজ পর্য্যন্ত অনেক যাযাবর জাতি দেখা যায়। পূর্ব্বে যে মধ্যএশিয়ার সর্ব্বত্রই যাযাবর জাতি ছিল এ কথা আমাদের পুরাণ, মহাকাব্যাদিতে ত পাওয়া যায়ই; হেরোডোটাস্, ষ্ট্রেবো, টলেমি প্রভৃতির গ্রন্থাদিতেও তাহাদের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সাইবেরিয়ার সেই যুগের যাযাবর জাতিসমূহ খুব সম্ভবতঃ মঙ্গোলিয়ানগণের পূর্ব্বে ঐ দেশ দখল করিয়াছিলেন। পেলিও-এশিয়াটিক জাতি দেখিতে যদিও অনেকটা মঙ্গোলিয়ানদের মতই, তথাপি এই দুই জাতির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। যাহা হউক, সেই পেলিও-এশিয়াটিক জাতি খুব সম্ভবতঃ খাদ্যান্বেষণে অথবা প্রবলতর কোনও শক্তি কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া খানিকটা সাহস সঞ্চয় করতঃ বেরিং পার হইয়া অলস্কা উপদ্বীপে যাইয়া উপনীত হইয়াছিলেন এবং সেখানকার প্রচুর খাদ্যসম্ভার দেখিয়া সেখানে স্থায়ীভাবেই বসবাস করিতে লাগিলেন। একবার এইরূপে রাস্তা খোলা হইয়া গেলে ইহা আর বন্ধ হইল না। নূতন নূতন শিকার এবং মৎস্যের সন্ধানে অতঃপর অনেক দলই সাইবেরিয়া হইতে আমেরিকায় যাইতে লাগিলেন। যাইবার পথে কেহ কেহ হয়ত ডায়োমেড দ্বীপদ্বয়ে কিয়ৎকাল অবস্থানও করিয়াছিলেন, এবং পরে সেখানকার খাদ্যসম্ভার ফুরাইয়া গেলে আস্তে আস্তে নূতন দেশের সন্ধানে বাহির হইয়া সম্মুখেই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড দেখিতে পাইলেন। এইরূপে সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া এশিয়া মহাদেশ হইতে দলের পর দল যাইয়া উত্তর আমেরিকায় এবং দক্ষিণ আমেরিকায় বসতি স্থাপন করিয়াছেন। (cf. "Scientific American, August 1932, pp. 86-87)

কিন্তু তাঁহারা আমেরিকায় পদার্পণ করিয়াই দেখিলেন যে সেখানে ধাতু নাই। অথচ এশিয়া মহাদেশের সর্ব্বত্রই তাঁহারা ধাতুর সন্ধান পাইয়াছেন। এই সমস্ত ধাতু অবশ্য লৌহ ছাড়া; কারণ লৌহের আবিষ্কার হইয়াছে অনেক পরে। অদল বদল দ্বারা প্রাপ্ত জিনিসের উৎস হইতে দূরে সরিয়া পড়িয়া তাঁহারা পুনরায় প্রস্তরের যুগেই ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু তাঁহারা পূর্ব্বের সেই গৌরবময় দিন সমূহের কথা ভুলিতে পারেন নাই। পেটিটট্ (Petitot) এবং ম্যাকেঞ্জি, এই দুই মনীষী বহু দিন যাবৎ আমেরিকান্ ইণ্ডিয়ান্গণের রীতি নীতি লক্ষ্য করিয়া, এবং তাঁহাদের মধ্যে চলিত কিংবদন্তীগুলি জানিয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। স্যার আলেকজাণ্ডার ম্যাকেঞ্জি বলেন যে আমেরিকান্ ইণ্ডিয়ানগণের বিশ্বাস যে তাঁহারা অন্য একটি বৃহৎ মহাদেশ হইতে এ দেশে আসিয়াছেন এবং তাঁহারা ক্রমাগত পূর্ব্ব দিক ধরিয়াই অগ্রসর হইয়াছিলেন। ঐ দেশে তাঁহারা এক অত্যাচারী জাতির অধীন ছিলেন, এবং সেখান হইতে পলাইয়া আসিয়া দ্বীপ-পরিপূর্ণ, লম্বা এবং অপ্রশস্ত একটি হ্রদ পার হইয়া পরিশেষে আসিয়া আমেরিকায় উপনীত হইয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহারা একটি নদী দেখিলেন, যেখানে চক্‌চকে একপ্রকার ধাতুর সাক্ষাৎ মিলিল। বলা বাহুল্য যে এই হ্রদটি বেরিং প্রণালী ব্যতীত আর কিছুই নহে, এবং ধাতুটি হইতেছে বর্ত্তমান ম্যাকেঞ্জি নদীর তীরস্থ তাম্র।

এ সম্বন্ধে Scientific American পত্রিকায় প্রকাশিত (আগষ্ট, ১৯৩২) Marius Barbean, National Museum of Canada, Ottawa, কর্ত্তৃক লিখিত "How America was first Discovered" শীর্ষক অনুপাদেয় প্রবন্ধটি পঠিতব্য।

এই আমেরিকা-প্রবাসী পেলিও-এশিয়াটিক্ জাতির সভ্যতা এবং আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করিলেও এই ধারণাই বদ্ধমূল হয় যে তাঁহারা এশিয়ার লোক। তবে এশিয়ার অন্যান্য যাযাবর জাতির ন্যায় তাঁহাদের সভ্যতা এখনও অতিশয় নিম্নস্তরের। এশিয়ায় থাকা কালীন তথাকার সভ্য জাতিগণের সংস্পর্শে আসিয়া যেটুকু সভ্যতা অর্জ্জিত হইয়াছিল, ঠিক সেইটুকুই আজ পর্য্যন্ত তাঁহাদের মধ্যে অবর্দ্ধিত অবস্থায় বর্ত্তমান আছে। এশিয়ার সঙ্গে এবং তথাকার সুসভ্য জাতিসমূহের সঙ্গে সম্বন্ধবিহীন হইবার ফলেই খুব সম্ভরতঃ এরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছে। সেই সুদূর অতীতে মানব-সভ্যতাও বিশেষ অগ্রসর হয় নাই ইহা নিঃসন্দেহ। তবে স্থানীয় আবহাওয়ার দোষে এবং গুণে সভ্যতার অনেক অদলবদল হইয়াছে ইহাও ঠিক, যেমন ধাতব জিনিসের ব্যবহার ইত্যাদি। যে দেশে যে জিনিস পাওয়া যায় না, পূর্ব্ব হইতে সে জিনিসের ব্যবহার অন্য দেশে থাকা কালীন জানা থাকিলেও, পারিপার্শ্বিক অবস্থার গতিকে নূতন দেশে তাঁহাদিগকে অনেক ধাতুর সহিতই সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। আর একটি বিশেষ কথা এই যে, এশিয়া মহাদেশ হইতে পূর্ব্ব হইতে কেবল অর্দ্ধসভ্য যাযাবর জাতিই আমেরিকা গিয়াছেন, সুসভ্য জাতি গিয়াছেন অনেক পরে। সে বিষয় পরে আলোচিত হইবে। এশিয়ায় থাকা কালে তথাকার অপেক্ষাকৃত সুসভ্য জাতির সংস্পর্শে আসিয়া যাযাবর জাতি-সমূহও সম্ভবতঃ অনেক বিষয় নিজেদের মধ্যে চালাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু আমেরিকা যাওয়ার পর আর সে সুযোগ হয় নাই। এবার আমরা তাঁহাদের সভ্যতার মাপকাঠি সম্বন্ধে খানিকটা আলোচনা করিব।

মানব-সভ্যতার ইতিহাস পাঠ করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, সভ্যতার মূল বিষয়গুলি কোনও এক স্থান হইতে সমগ্র পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমান যুগের মুদ্রাঙ্কন-রীতি ও বারুদ, এবং প্রাচীন যুগে ঘোড়া, গম প্রভৃতি এক স্থান হইতেই কালক্রমে সমগ্র পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তদনুসারে দেখা যায় যে মধ্যএশিয়া প্রদেশেই প্রথমতঃ কৃষিবিদ্যা, চক্র, গৃহপালিত পশ্বাদি, এবং গম, যব ইত্যাদি শস্যসমূহের আবির্ভাব হইয়া পরিশেষে পৃথিবীর সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এ বিষয়ে অধ্যাপক উইস্‌লার বলেন —Fundamentals of Old World culture—"Cereals, cattle, plough, and the wheel. As a matter of fact, the fundamental traits are often found to have a single origin: viz., the horse, ox, wheat, printing, gun powder etc.—Wissler—American Indians, pp. 389-ff & Man & Culture, pp. 111-12. কিন্তু ""The wheel is absent from the New World, even the spinners and potters there failing to grasp the principles of the old World. Therefore, the peopling of the New World must have taken place at a very remote period, or by wild tribes only.—American Indians—chap. on New World Origins—by Wissler.

অর্থাৎ আমেরিকার আদিম অধিবাসিগণের মধ্যে এশিয়ার (পূর্ব্ব গোলার্দ্ধের) সভ্যতার মূল কায়দা কানুন-গুলি দেখা যায় না। তাঁহাদের মধ্যে 'চাষ করিবার লাঙ্গলের, এবং সূতা কাটিবার ও মৃৎপাত্র নির্ম্মাণ করিবার "চাকা"র প্রচলন নাই। কাজেই ধরিয়া লইতে হইবে যে এই সকল লোক এশিয়ার সভ্য জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না, বা তাঁহারা মধ্যএশিয়া হইতে এমন যুগে আমেরিকা গিয়াছিলেন যখন মধ্যএশিয়ায় সভ্যতা-বিকাশ হয় নাই।

আমেরিকার আদিম অধিবাসিগণ বস্ত্র বয়ন করিতে জানেন। কিন্তু সেই বস্ত্র তাঁত হইতে যে আকারে বাহির হইয়া আসে, ঠিক সেই আকারেই কোন কাটা ছাঁটা ব্যতীত ব্যবহার করা হয়, অর্থাৎ আমাদের মত থান কাপড় কাটিয়া ছাঁটিয়া সার্ট, কোট প্রভৃতির মত করা হয় না। এই প্রকারের শিল্পকে Textile শিল্প বলা হয়। পণ্ডিতগণের মতে এই Textile শিল্প দক্ষিণ এশিয়া (মধ্যএশিয়ার তাতার, পারস্য প্রভৃতি দেশে) এবং ভূমধ্য সাগরের তীরস্থ জাতিদের আদি শিল্প, এবং এই সকল স্থান হইতে এই শিল্পজাত দ্রব্যসমূহ পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রথম ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। Wissler সাহেব বলেন—

"In the great weaving area of Mexico and the Andes, clothing is of woven cloth. The peculiarity of such clothing is that it was never cut and fitted, but each garment was worn in the form in which it came from the loom. Thus, in the textile area we find that tailoring is at its lowest.

When we look to the Old World we find a similar distribution. Across Southern Asia and around the Mediterranean is the great historical textile area from which all our fine textiles seem to have been derived."—

American Indians—pp. 62-63.

এই সমস্ত লোক সূতা এবং পশম (ছাগল, মেষ প্রভৃতির লোম) দ্বারা বস্ত্রাদি তৈয়ার করেন। এই পশম এবং লোমের কাজ যে মধ্যএশিয়ারই বৈশিষ্ট্য তাহা সকলেই জানেন। তাঁহাদের সূতা কাটিবার প্রণালীর মধ্যেও এশিয়ার প্রভাব বিশেষ ভাবে বিদ্যমান। তাঁহারা যদিও চরকার কার্য্য প্রণালী জানেন না, তথাপি তাঁহারা চরকার (wheel) পূর্ব্ববর্ত্তী যন্ত্র তক্‌লির (টেকো) কাজ বিশেষ ভালভাবেই জানেন এবং ইহা দ্বারা সুন্দর সুন্দর সূতা প্রস্তুত করেন। এই তক্‌লি এশিয়ারই জিনিস। এশিয়া হইতেই প্রথমে তকলি এবং পরে চরকা পরবর্ত্তী যুগসমূহে পৃথিবীর সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় হইতেছে তাঁহাদের মাছ ধরিবার রীতি। মাছ ধরিবার জালও নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে এশিয়া হইতেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই আদিম অধিবাসিগণ আমাদের মতই মাছ ধরিবার জাল তৈয়ার করিতে পারেন। ইঁহাদের মাটির জিনিস তৈয়ার করিবার রীতিও সম্পূর্ণরূপে এশিয়ার প্রণালীর অনুকরণ সন্দেহ নাই। সভ্যতার প্রথম যুগেই কুমারের "চাক" (wheel) আবিষ্কৃত হয় নাই। চাক আবিষ্কৃত হইয়াছিল অনেক পরে। কাজেই আমেরিকার আদিম অধিবাসিগণের মধ্যে কুমারের চাক বা চক্রের প্রচলন নাই। খুব সম্ভবতঃ, তাঁহারা যখন মধ্যএশিয়া হইতে আমেরিকায় চলিয়া যান, তখনও সেখানে চাকার প্রচলন আরম্ভ হয় নাই। তাঁহাদের মধ্যে মাটীর হাঁড়ি, বাটি, ভাঁড় প্রভৃতি জিনিস নির্ম্মাণ করিবার দুই প্রকার প্রণালী দেখা যায়। একটি হইতেছে শুধু হাত দিয়া। মাটী খুব নরম করিয়া দড়ির আকারে করা হয়। পরে সেই দড়িগুলিকে একটির উপর আর একটি দিয়া কৌশলে হাত দিয়া টিপিয়া পাত্রের আকার দেওয়া হয়। আমাদের দেশে চাকার প্রচলন থাকিলেও এখন পর্য্যন্ত কুমারের মেয়েরা হাত দিয়া উপরিউক্ত প্রণালীতেই হাঁড়ি, সরা, বাটি প্রভৃতি তৈয়ার করিয়া থাকেন। চাকা ঘুরাইতে খুব জোরের প্রয়োজন হয় বলিয়া কেবল পুরুষেরাই সাধারণতঃ চাকার সাহায্যে মৃন্ময় পাত্রাদি তৈয়ার করেন। কাজেই এই হাত দিয়া মাটীর পাত্র তৈয়ার করিবার প্রণালী সম্পূর্ণ এদেশীয়।

আর একটি নিয়ম হইতেছে চাকারই ঠিক পূর্ব্ব সংস্করণ। ইহাতে চাকা ব্যবহার করা হয় না সত্য, কিন্তু একটি কাঠের টুক্‌রা ব্যবহার করা হয়। পায়ের সাহায্যে এই কাঠের টুক্‌রাকে ঘুরাইয়া হাত দিয়া হাঁড়ী প্রভৃতি তৈয়ার করা হয়। এই প্রকার যন্ত্রের পরেই যে চাকার আবিষ্কার হয় তাহা সহজেই অনুমেয়।

ইহাদের বাঁশ, বেতের কাজের মধ্যেও সম্পূর্ণরূপে এশিয়ার প্রভাব দৃষ্ট হয় (American Indians by Wissler, chap. on Textile arts, pp. 42-70)। এই প্রকার আরও অনেক বিষয় দেখান যায় যদ্দ্বারা তাঁহাদের সঙ্গে এশিয়ার সম্বন্ধ নিকট হইতে নিকটতর ভাবে প্রমাণিত হয়।

এক্ষণে মেক্সিকোনিবাসী মায়া এবং আজটেক্ নামক দুইটি অধুনালুপ্ত সুসভ্য জাতির বিষয় খানিকটা আলোচনা করা যাইবে, এবং এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইবে যে পরবর্ত্তী যুগসমূহে এমন কি, খৃষ্টীয় অব্দে পর্য্যন্ত এশিয়া হইতে আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপনেচ্ছু দল গিয়াছিলেন।

পর্ত্তুগীজগণ এবং স্পেনীয়গণ যখন মেক্সিকোতে পদার্পণ করেন, তখন তাঁহারা সেখানে আজ্‌টেক্ নামে এক সুসভ্য জাতিকে দেখিয়াছিলেন। দয়াশীল শ্বেত-জাতির দয়ার বলে এই জাতি এখন ধ্বংসোন্মুখ। যে আজটেক্ সভ্যতা কয়েক শতাব্দী মাত্র পূর্ব্বেও গৌরবের উচ্চ সীমায় ছিল, তাহা আজ প্রত্নতাত্ত্বিকগণের ভাবিবার বস্তু মাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সম্প্রতি 'গরু মারিয়া জুতা দান' করিবার মত এই হতভাগ্য অধিবাসিগণের সভ্যতার মাপকাঠি বাহির করিয়া, ইঁহারা যে সভ্য ছিলেন,

এ কথা প্রমাণ করিবার জন্য অনেক পণ্ডিত উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। মেক্সিকো সহরের চারিদিকে বিগত কয়েক বৎসর হইতেই মাটী খুঁড়িবার কাজ চলিতেছে। ফলে সেখানে "মায়া" নামক আর একটি সভ্য জাতির অবস্থানের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। এই মায়াবংশীয়গণ আজ্‌টেক্‌গণের পূর্ব্বে মেক্সিকো এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে অবস্থান করিতেছিলেন। বিশাল বিশাল প্রাসাদ, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, ব্রোঞ্জ ইত্যাদি ধাতুর বিবিধ দ্রব্য এবং অস্ত্রশস্ত্র, নানা প্রকার দেবদেবীর মূর্ত্তি, খেল্‌না এবং পিরামিড্ প্রভৃতি মাটী খোঁড়ার ফলে বাহির হইয়াছে। এই সমস্ত জিনিস দেখিলে সত্যসত্যই ভারতীয় এবং চীনদেশীয় শিল্পকলার নিদর্শন পাওয়া যায়। (cf. Bulletins Nos. 74 and the following : Smithsonian Institution Bureau of American Anthropology ; South American Archæology by Joyce—Plates only) স্থানাভাব বশতঃ নিম্নে ২।১টি মাত্র জিনিসের বিষয় আলোচিত হইবে।

হণ্ডুরাস (Honduras) নামক স্থানে একটি পাথরের শিল্প পাওয়া গিয়াছে, যাহাতে শিল্পী একটি ভারতবর্ষীয় হাতীর চিত্র আঁকিয়াছেন। সেই হাতীর মাহুতও ভারতবর্ষীয় মাহুতই,—তাহার মাথায় পাগড়ী আছে। ইহা প্রথম আবিষ্কার করেন প্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক Elliot Smith (ইলিয়ট্ স্মিথ্)। তিনি Nature পত্রিকায় এক চিঠি ছাপিয়া প্রথম এই খবর জগৎ সমক্ষে জানাইয়াছেন (Nature Nov. 25, 1915, p. 340)। তিনি বলেন যে এই হাতী ভারতবর্ষের হাতী। আমেরিকায় হাতী কিংবা ঘোড়া পূর্ব্বে ছিল না *। কাজেই ইহা হয় ভারতবর্ষীয় কোনও শিল্পীর অঙ্কিত, নতুবা সেখানকারই কোনও শিল্পী কর্ত্তৃক অঙ্কিত যিনি ভারতবর্ষ হইতে আনীত হাতীর চিত্র দেখিয়াছেন। Elliot Smith বলেন—"This puts forward a claim that it is a picture of an Indian elephant with its turbaned mahut, modelled by a sculptor who had never seen the animal, but was copying an imported design. (Elliot Smith, F. R. S. Elephants and Ethnologists, p. 4)। নিম্নে এই শিল্প সম্বন্ধে পৃথিবীর অপর কয়েকজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের মতামত দেওয়া গেল—

(১) A. Von Humboldt, vues des cordilleres, et Manumens des peoples Indigenco l' Amerique নামক গ্রন্থে এই শিল্পকে দেবতা গণেশের ছবির অনুকরণে অঙ্কিত বলিয়া লিখিয়াছেন।

(২) E. B. Tylor, Researches into the Early History of Mankind নামক পুস্তকের ৩০৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে এই হস্তীর চিত্র দ্বারা ভারতীয় শিল্পকলার প্রভাব আমেরিকার শিল্পকলার উপরে খুব বিশেষ ভাবেই যে পড়িয়াছে, তাহা বেশ পরিষ্কার বুঝা যায়।

(৩) Lord Kingsborough, Antiquities of Mexico vol. VIII, p. 27এ লেখেন যে এই চিত্রটি বাস্তবিকই একটি হাতীর, যদিও ভারতীয় প্রভাব আমি বিশ্বাস করি না।

(৪) Hubert Howe Bancroft, The Native Races of the Pacific States of North America, vol. V, pp. 43, 48, f. n. 99, এবং vol. IV, pp. 163, 305.—বলেন যে আমেরিকার শিল্পকলার উপর হিন্দুসভ্যতার প্রভাব বিশেষ ভাবেই পড়িয়াছে।

(৫) Elliot Smith, F. R. S. Nature, Nov, 25, 1915, p. 340 ; Dec. 16, 1915, p. 425 ; January 27, 1916, p. 593 ; বলেন :—"A claim that the animal with the trunk sculptured on the copen stela B. and depicted the Maya and Aztec manuscripts, is the Indian elephant."

Elephants and Ethnologists, p. 17.

উপরের অভিমতগুলি হইতে স্পষ্টই ধরিয়া লওয়া যায় যে হণ্ডুরাসে প্রাপ্ত হাতীর চিত্রটি ভারতবর্ষীয় হাতীর, এবং ইহা দ্বারা আমেরিকার শিল্পকলার উপর ভারতীয় প্রভাব দৃষ্ট হইতেছে। শেষোক্ত অভিমত হইতে বুঝা যায় যে মায়া এবং আজটেক্ জাতির প্রাচীন পুঁথিতে প্রাপ্ত হাতীর চিত্রগুলিও ভারতীয় হস্তীর।

কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের আইহোলি (Aiholi) নামক স্থানে একটি মকরমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে।

* বহু বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকায় ঘোড়াজাতীয় একটি জীবের কঙ্কাল মাটীর নীচে পাওয়া গিয়াছিল, এবং ইহা লইয়া পণ্ডিত মহলে খুব তোলপাড়ও হইয়াছিল। বিশেষজ্ঞগণ কিন্তু ইহাকে ঘোড়ার কঙ্কাল বলিয়া বিশ্বাস করেন না।

পণ্ডিতগণ ইহাকে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। এই মকর মূর্ত্তিটি ভারতীয় মকরের। নিম্নে ইহার সম্বন্ধে কয়েকটি অভিমত দেওয়া গেল—

(1) "Indian Makara from a cave at Aiholi, in the form of the so-called crocodile, with fish scales, an elephant's trunk, and tusks, and a human figure emerging from the mouth (C, 6th century A. D.)

Elephants and Ethnologists—p. 18.

(2) "The Makara in Hindu ornament."
Archaeological Survey of India,
Annual Report, 1903-4, p. 227.

(3) "River-Goddess Ganga"—
Rupam, April, 1921.

(4) "A note on kirtimukha : Being the Life-History of an Indian Architectural ornament"—Rupam, January, 1920.

যে মূর্ত্তিটি পাওয়া গিয়াছে তাহা একটি হিন্দু নারীর পরিহিত অলঙ্কারে অঙ্কিত। মকরটির গায়ে মাছের আঁস, মুখের সম্মুখভাগে দন্তসমেত হাতীর শুঁড়, এবং মুখ হইতে একটি মনুষ্যমূর্ত্তি বাহির হইতেছে। ভারতীয় পণ্ডিতগণের মতে মনুষ্যমূর্ত্তিটি হইতেছে জলদেবতা গঙ্গার।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ঠিক এই প্রকারের ভারতীয় মকরের মূর্ত্তি মেক্সিকোতে পাওয়া গিয়াছে। এই আবিষ্কার লইয়া পণ্ডিতমহলে রীতিমত সাড়া পড়িয়া গিয়াছে (Elephants and Ethnologists—pp. 16-17)। এক্ষণে কথা হইতেছে যে এই সকল মূর্ত্তি কে বা কাহারা অঙ্কিত করিল? উত্তরে আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে এই সকল মূর্ত্তি ভারতীয় শিল্পে অভিজ্ঞ শিল্পীগণ কর্ত্তৃক খোদিত। তাঁহারা এশিয়া মহাদেশবাসীও হইতে পারেন, অথবা ভারতীয় শিল্পে প্রভাবান্বিত মায়া বা আজটেক্ জাতীয়ও হইতে পারেন। কিন্তু তাঁহারা মায়া জাতীয়ই হউন, বা আজটেক্ জাতীয়ই হউক, অথবা এশিয়া মহাদেশবাসীই হউন, এ স্থলে স্বীকার করিতে হইবে যে খৃষ্টীয় অব্দ পর্য্যন্ত এশিয়া মহাদেশের সুসভ্য জাতির সঙ্গে আমেরিকার সম্বন্ধ ছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আমেরিকার প্রাচীন অধিবাসিগণ তথাকার ভূইফোঁড় লোক নহেন। আরও দেখিয়াছি যে আমেরিকান ইণ্ডিয়ানগণের সভ্যতা খুব নিম্নস্তরের; মায়া বা আজটেক্ সভ্যতার সঙ্গে তাঁহাদের সভ্যতার কোনও তুলনাই হয় না বা হইতে পারে না। তাহা হইলে ভারতীয় শিল্পে প্রভাবান্বিত এই দুই জাতি এশিয়ার কোন্ স্থান হইতে গিয়াছিলেন? এই সমস্যার সমাধান আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। তবে পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে এই দুই জাতির সঙ্গে ভারতবর্ষের এবং চীনদেশের কৃষ্টিগত সম্বন্ধ থাকা খুবই সম্ভবপর। চীনদেশের কথা বলিবার কারণ আছে। ভারতীয় শিল্পকলার ন্যায় চীনদেশীয় শিল্পকলার নিদর্শনও মেক্সিকোতে পাওয়া গিয়াছে। Elliot Smith তাঁহার Elephants and Ethnologists নামক গ্রন্থে একটি অর্দ্ধদগ্ধ পিরামিডের ছবি দিয়াছেন। এই পিরামিডে একটি চীন দেশীয় লোকের মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। এই মূর্ত্তিটির সহিত আমেরিকার আদিম অধিবাসিগণের চেহারার কিছু সৌসাদৃশ্য থাকিলেও অনেক প্রত্নতাত্ত্বিকই ইহাকে খাঁটি চীনা লোক বলিয়া অভিমত দিয়াছেন। মেক্সিকোর আজটেক্ জাতির যে পঞ্জিকা (almanac) পাওয়া গিয়াছে তাহা লইয়াও পণ্ডিতমহলে খুব সাড়া পড়িয়াছে। পণ্ডিতগণের মতে এই পঞ্জিকায় নাকি ভারতীয় প্রভাব বিদ্যমান। গণিত বিদ্যায় ভারতবর্ষই এক কালে জগতের শীর্ষ স্থান দখল করিয়াছিল, এবং এই ভারতবর্ষেই প্রথম গণিতের সৃষ্টি, এ কথা সকলেই স্বীকার করেন। ভারতীয় গণিতের বিশেষত্ব শূন্য "o" (Zero)র উপর। কোনও সংখ্যার ডান দিকে শূন্য বসাইলে যে তাহার পরিমাণ দশগুণ বৃদ্ধি পায়, এ সত্য ভারতবর্ষেই প্রথমতঃ আবিষ্কৃত হয়। আজটেক্গণের পঞ্জিকার মধ্যে শূন্য পাওয়া গিয়াছে। ফলে ভারতীয় গণিতের আদর্শেই আজটেক্ পঞ্জিকার সাল, তারিখ প্রভৃতি গণনা করা হইয়াছে। তবে এ বিষয়ে এখন পর্য্যন্ত গবেষণা চলিতেছে। অদূর ভবিষ্যতেই এ সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

চীন ও ভারতবর্ষ এবং মেক্সিকোর কয়েকটি স্থান সম্বন্ধে ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়া বিচার করিয়া কয়েকজন পণ্ডিত মেক্সিকোর সঙ্গে ভারতবর্ষ এবং চীনদেশের নৈকট্য সম্বন্ধ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা ভাষাতত্ত্ববিদ্ নই বলিয়াই এ প্রসঙ্গ ভাষাতত্ত্ববিদ্গণের নিকট ছাড়িয়া দিতেছি। তবে এ স্থলে বহু-আলোচিত "ফুসাং". থিওরি সম্বন্ধে সংক্ষেপে একটু আলোচনা করিব।

চীনদেশের লিয়াং রাজবংশের (Liang Dynasty) দপ্তরখানায় যে পুরাতন রেকর্ড পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে হুইসেন (Hoei-sen) নামক চীনদেশীয় এক পর্য্যটক "ফুসাং" নামক সুদূর প্রাচ্যে এক দেশে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি সেই ফুসাং দেশের এক বর্ণনা দিয়াছেন। হুইসেন বলেন যে তাঁহার ফুসাং হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের ৪০ বৎসর পূর্ব্বে মধ্যএশিয়ার ফিপিন্ বা কোফেন্ (বর্ত্তমান কাবুল) নামক স্থান হইতে ৫ জন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী সমুদ্রযোগে ফুসাংএ উপনীত হইয়া তথাকার অধিবাসিগণকে নবধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন। হুইসেন খুব সম্ভবতঃ ৪৯৯ খৃষ্টাব্দে ফুসাং পৌছিয়াছিলেন। তিনি ফুসাং দেশের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহার এবং তৎবর্ণিত অন্যান্য দেশসমূহের অবস্থিতি নির্ণয় করিয়া লইয়া পণ্ডিত মহলে বহুদিন যাবৎ বাদানুবাদ চলিতেছে। চীনদেশীয় ভাষায় ফুসাং শব্দের অর্থে সুদূর প্রাচ্যদেশকে বুঝায়। Klaproth, Bretschneider এবং Theo. Simson প্রভৃতি কয়েকজন পণ্ডিত ফুসাং অর্থে জাপান দেশকে ধরিয়া লইয়াছেন; সুতরাং তাঁহাদের মতে হুইসেন কর্ত্তৃক আমেরিকা আবিষ্কারের কাহিনী উপন্যাস বা রচা কথা ব্যতীত কিছুই নহে। পক্ষান্তরে Leland এবং Vining প্রমুখ কয়েকজন পণ্ডিত বলেন যে ফুসাং অর্থে আমেরিকার মেক্সিকো দেশকেই বুঝাইতেছে। তাঁহারা বেশ জোরের সহিতই বলেন, হুইসেন বর্ণিত ফুসাং এবং তৎসংলগ্ন স্ত্রী-জাতির দেশ (Land of Women), চিত্রিত লোকের দেশ (Land of Marked bodies), ও হুনদেশ (Great Hun country) সকল গুলিরই অবস্থান যথাযথ ভাবে ঠিক করা সম্ভব। চারিটি দেশই যখন একই বর্ণনার মধ্যে আছে, তখন শেষের তিনটিকে বাদ দিয়া শুধু প্রথমটিকে রাখিলে সমস্ত ঘটনাটির প্রতিই অবিচার করা হয়—

They have boldly maintained that every point can be fixed; that the whole hangs together, and that fatal injury is done by the surrender of any part,—for if Fusang is Mexico, it is no less clear that the Land of women is Panama, that the Marked bodies are to be found in the Alentian Islands, and that the Great Hun country corresponds to the southern shore of Aleska.—Beazley: The Dawn of Modern Geography p.....] প্রসিদ্ধ পণ্ডিত De Guignes কিন্তু মধ্যপন্থী লোক। তিনি ১৭৬১ খৃঃ অব্দে "Proceedings of the (Paris) Academy of Inscriptions and Belles Letters, vol. XXVII" নামক গ্রন্থের "Investigation of the Navigation of the Chinese to the coast of America" নামক প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন যে হুইসেন বর্ণিত অন্য দেশগুলির কথা বাদ দিলেও খুব সম্ভবতঃ ফুসাং শব্দের অর্থে আমেরিকার মেক্সিকো দেশকেই বুঝায়। যাহা হউক হুইসেন বর্ণিত দেশ এবং তথাকার অবস্থা সম্বন্ধে যে সমস্ত বাদানুবাদ হইয়াছে, তাহা হইতে, এবং তৎপরবর্ত্তী যুগ সমূহে প্রত্নতাত্ত্বিকগণের চেষ্টায় যে সমস্ত জিনিস আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌছিতে পারি যে পরবর্ত্তী যুগে অর্থাৎ খৃষ্টীয় অব্দে পর্য্যন্ত এশিয়ার কয়েকটি দেশের সঙ্গে (যেমন ভারতবর্ষ, চীন প্রভৃতি) সুদূর আমেরিকার কৃষ্টিগত সম্বন্ধ ছিল। প্রসিদ্ধ ভৌগোলিক Beazley সাহেবের মতে চীন এবং জাপান উভয় দেশেই সুদূর প্রাচ্যে অবস্থিত কোন দেশের আবিষ্কার সম্বন্ধে একটি সর্ব্বজনবিদিত প্রাচীন প্রবাদ আছে, এবং এই প্রবাদের সত্যতা সম্বন্ধে উভয় দেশের অধিবাসিগণই খুব দৃঢ় মত প্রকাশ করেন [Both in China and Japan the tradition of an ancient discovery of countries far to the East is said to be very old, very widespread, and very obstinate. Beazley : p.....] নিম্নের কয়েকটি ঘটনা হইতে জলপথেও আমেরিকা যাতায়াতের সম্ভাবনা আমরা কতকটা ধারণা করিয়া লইতে পারি—

(ক) বিগত ১৮৩৩ সালে, জাপানে পাশ্চাত্য কলকব্জাসমন্বিত বাষ্পীয় পোতের আমদানী হওয়ার পূর্ব্বে, একটি জাপানী ধরণের সমুদ্রগামী পোত (Junk) উত্তর আমেরিকার Queen Charlotte Islandএর নিকট ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছিল।

(খ) ১৮৩২ সালেও জাপানের একটি মাছ ধরিবার ছিপ জাতীয় নৌকা ফরমুসা এবং টোকিওর মধ্যবর্ত্তী কোন

স্থান হইতে প্রবল বাত্যা কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া মাত্র ৯জন আরোহীসহ আমেরিকার Sandwich দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছিয়াছিল।

ইয়োরোপের নর্স্‌ম্যানগণ (Norsemen) যে আমেরিকার পূর্ব্বপ্রান্তে খৃষ্টীয় ১০০০ অব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে যাইয়া উপনীত হইয়াছিলেন, এবং অতঃপর সে দেশে তাঁহারা বারবার আসা-যাওয়া করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সকলেই বর্ত্তমানে নিঃসন্দেহ, যদিও উত্তর সমুদ্রের জলদস্যুগণের (Vikings) লিখিত প্রবাদ বাক্য ভিন্ন এই ব্যাপার সম্বন্ধে কোনও একটি চিহ্ন বা প্রাচীন নিদর্শন অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই। Norsemenগণের আমেরিকা যাওয়া, এবং তথায় বসবাস করিবার ব্যাপার যদি প্রত্যক্ষ প্রমাণাভাবেও সত্য বলিয়া পণ্ডিত সমাজে সমাদৃত হইতে পারে, তবে Hoei-sen এবং তাঁহার বৌদ্ধ বন্ধুগণের আমেরিকা যাইবার ঘটনা সম্বন্ধে আমেরিকায় এত প্রমাণ পাওয়া সত্ত্বেও, এবং চীনদেশীয় রাজদপ্তরের সরকারী খাতায় লিখিত প্রমাণ সত্ত্বেও, কেন যে পণ্ডিত সমাজ এতটা সন্দেহ করিতেছেন তাহা বুঝা কঠিন। কালা আদমী বলিয়াই খুব সম্ভবতঃ এতটা অবিশ্বাস।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ভিক্ষু হুইসেন ফুসাং দেশে ৫জন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী দেখিয়াছিলেন। তাঁহারা কাবুল হইতে ফুসাং গিয়াছিলেন। খুব সম্ভবতঃ মধ্যএশিয়া এবং উত্তর-পূর্ব্ব এশিয়ার অধিবাসিগণের সংস্পর্শে আসিয়া ভারতবাসীগণও আমেরিকার বিষয় অবগত হইয়াছিলেন, এবং সেখানে যাইয়া নিজেদের ধর্ম্ম ও সভ্যতা বিস্তারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। সূর্য্যসিদ্ধান্ত, হুই-সেন এবং তদীয় বৌদ্ধ বন্ধুগণের কিছু পূর্ব্বেকার। এই সূর্য্যসিদ্ধান্ত-প্রণেতা জ্যোতির্ব্বিদ্ বরাহমিহির আমেরিকা বা পাতালের বিষয় পূর্ব্ববর্ত্তী লোকের মুখেই শুনিয়াছিলেন, এবং তৎকালে কিংবদন্তী, অথবা সত্য ঘটনাকে আশ্রয় করিয়াই পাতালভূমির বর্ণনা লিখিয়াছিলেন। পাতালভূমি সম্বন্ধে সম্যক্ ভৌগোলিক জ্ঞান না থাকিলে তিনি কখনও পাতালকে সমুদ্রবেষ্টিত বলিয়া লিখিতে পারিতেন না। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন যে সূর্য্যসিদ্ধান্তের বহু পূর্ব্ব হইতেই ভারতীয়গণ পৃথিবীর গোলত্বের বিষয় অবগত ছিলেন, এবং ভূপৃষ্ঠের এ দিকে অবস্থিত জম্বুদ্বীপ এবং অন্যান্য বর্ষসমূহ যে চতুর্দ্দিকে সমুদ্রবেষ্টিত, এ কথাও অবগত ছিলেন। সুতরাং সূর্য্যসিদ্ধান্ত-প্রণেতা বরাহমিহিরের মত একজন চতুর এবং বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্ যে ভূ-পৃষ্ঠের অর্থাৎ ভূগোলের অপর দিকে অবস্থিত একটি ভূখণ্ডের অবস্থান অনুমানে ধরিয়া লইবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এই যুক্তিটি খুব সুন্দর সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে পৃথিবীর অপর দেশের অন্য কোনও জ্যোতির্ব্বিদ এই প্রকার অনুমান করিতে পারেন নাই। কেহ কোনও দিন কোনও ভূখণ্ডের অবস্থিতি না জানিয়া আন্দাজের উপর নির্ভর করিয়া এত কিছু বলিতে পারেন না। পাতাল সম্বন্ধে, এবং সেখানকার জলবায়ু ও দিবারাত্রির সময় সম্বন্ধে সূর্য্যসিদ্ধান্ত যে সমস্ত নির্ভুল উক্তি করিয়াছেন তাহাকে কোনও মতেই উড়াইয়া দেওয়া চলে না। সূর্য্যসিদ্ধান্ত যে যুগে রচিত হইয়াছিল, সে যুগে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ভৌগোলিকগণের ভূগোল জ্ঞান নেহাৎ কম ছিল না। গ্রীস দেশীয় হোমার, হিকেটিউস্, এনাক্সিমেণ্ডার, হেরোডোটাস্, এরিষ্টোগোরাস্ প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া এরিষ্টটল, ইরাটোস্থোনিস্, পলিবিয়াস্, হিপ্পারকাস্, ষ্ট্রেবো, প্লিনী এবং টলেমি প্রভৃতি অনেকেই পৃথিবীর মানচিত্র তৈয়ার করিয়াছেন, এবং নানা দিগ্‌দেশের বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু কেহই এতাবৎ পৃথিবীকে গোল বলিয়া জানিতেন না, এবং তাঁহাদের বর্ণিত স্থানাদির বাহিরে Terra Incognita (অজানিত স্থান) ছাড়া যে অন্য কোনও সমুদ্র বেষ্টিত মহাদেশ ছিল যাহা আকার ও আয়তনে প্রায় তাঁহাদের অধ্যুষিত ভূখণ্ডেরই সমান এ কথা তাঁহারা কোথাও বলেন নাই। একমাত্র ভারতীয়গণই পাতালভূমির উল্লেখ বহু গ্রন্থে করিয়াছেন। সুতরাং ভারতীয়গণ নিশ্চয়ই পাতালভূমির অবস্থিতির বিষয় বহু পূর্ব্ব কাল হইতেই জানিতেন। তবে এ বিষয়ে প্রথম বিশেষ ভাবে, এবং পরিষ্কার রূপে আলোচনা-সূর্য্যসিদ্ধান্তেই পাওয়া যায়।

আমরা এই প্রবন্ধের প্রারম্ভেই মহারাজ বলির কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম। মহারাজ বলি সম্বন্ধীয় যে সকল প্রবাদ আমাদের দেশে প্রচলিত আছে, তাহাতে মনে হয় যে সে যুগেও পাতালভূমির অস্তিত্ব আমাদের দেশে বিশেষ ভাবেই জানা ছিল; নতুবা বলিকে পাতালভূমিতে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করা সম্ভব হইত না। পূর্ব্বেই আমরা কয়েকজন পণ্ডিত লোকের মতানুযায়ী বলিয়াছি যে আমেরিকায় এশিয়াবাসিগণ অনুমান খৃঃ পূঃ ১৩০০০।১৪০০০ অব্দ হইতে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বিশেষজ্ঞগণের মতে আর্য্য সভ্যতা আরম্ভ হইয়াছিল তাহার অনেক পরে। পুরাণাদিতে লিখিত বংশ তালিকা আলোচনা করিলেও আমাদের মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়। কশ্যপ-পুত্র বামন বিষ্ণুই বলিকে কৌশলে পাতালে প্রেরণ করিয়া আর্য্য সভ্যতার বিকাশের পথ প্রশস্ত করিয়াছিলেন। এই বামন বিষ্ণুর ভ্রাতুষ্পুত্র মনু অযোধ্যায় রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি ভারতে সূর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার বংশতালিকা লইয়া হিসাব করিলেও, এবং পুরাকালে আর্য্যগণ দীর্ঘজীবী ছিলেন, এ কথা স্বীকার করিয়া লইলেও, মনুর সময়কে খৃঃ পূঃ ১৪০০০।১৫০০০ অব্দে লওয়া যায় না।. সত্যের খাতিরে আমাদিগকে মনুর সময়কে বহু পরে আনিয়া ফেলিতে হয়। সুতরাং বিষ্ণু এবং বলির সময়ে আমেরিকা যাতায়াতের কথা এ দেশে একপ্রকার পুরাতন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি যে বাস্তবিক পক্ষে আমেরিকা আবিষ্কারের গৌরব এশিয়াবাসীরই প্রাপ্য। কিন্তু আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে পাশ্চাত্য দেশীয় মহা মহা মনীষিগণ এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেও আমাদের দেশের স্কুল-কলেজের পাঠ্য পুস্তকসমূহে আজ পর্য্যন্ত খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক কলম্বস্‌ই আমেরিকা আবিষ্কারক বলিয়া পরিচিত হইতেছেন, এবং পণ্ডিত মহাশয়গণও এ বিষয়ই ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিয়া আসিতেছেন। ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? আমাদের দেশের কর্ত্তৃপক্ষগণের এবং পণ্ডিতবর্গের এ বিষয়ে অবিলম্বে অবহিত হওয়া উচিত। আর্য্যই হউক আর অনার্য্যই হউক, সত্যের খাতিরেও আমাদের দেশের ছাত্রদিগকে প্রকৃত ঐতিহাসিক তত্ত্বই শিক্ষা দেওয়া উচিত।

যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

ছাত্রাবস্থায়, অর্থাৎ যখন আমরা ছাত্রবৃত্তি পড়িতাম, তখন বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন যেরূপ আগ্রহ সহকারে পাঠ করিয়াছিলাম, যোগেন্দ্রচন্দ্রের আর্য্যদর্শন পাঠে আগ্রহ তদপেক্ষা কম ছিল না। বঙ্গদর্শন এবং আর্য্যদর্শন দুইই এখন দুষ্প্রাপ্য; তথাপি, শৈশবে পঠিত উভয় মাসিকপত্রের অনেক কথাই মনে পড়ে। আর্য্যদর্শনে তড়িতের ইতিবৃত্ত আমার শিশুচিত্ত বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। গ্রীক ও হিন্দু প্রবন্ধ বুঝিবার সামর্থ্য তখনও হয় নাই। সে সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে উপন্যাসলেখক অপেক্ষা বঙ্গদর্শনের সম্পাদক হিসাবেই আমরা যেমন বেশী করিয়া চিনিতাম, তদ্রূপ, জীবনীকার অপেক্ষা আর্য্যদর্শনের সম্পাদক হিসাবেই আমরা যোগেন্দ্রনাথকে অধিক চিনিতাম। পরে অবশ্য উভয়ের সম্বন্ধেই আমাদের মনোভাবের অনেক পরিবর্ত্তন হয়। বস্তুতঃ আর্য্যদর্শনের প্রকাশ কালে তাহার প্রতিষ্ঠা বড় অল্প ছিল না।

যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম-এ মহাশয় নদীয়া জেলার সুবর্ণপুর গ্রামে উচ্চ কুলীন ব্রাহ্মণ—বন্দ্যোপাধ্যায় বংশে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামে তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ হইলে তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভার্থ কলিকাতায় আনীত হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষা এম-এ পাশ করিয়া তিনি বিশেষ ভাবে সংস্কৃত অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন এবং বহু শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিয়া আর্য্যশাস্ত্রে প্রভূত অধিকার লাভ করেন।

কর্ম্ম-জীবনে প্রবেশ করিয়া তিনি প্রথমে কিছু কাল অধ্যাপকতা করেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ভরতচন্দ্র শিরোমণি, জয়নারায়ণ তর্করত্ন, তারানাথ তর্কবাচস্পতি

প্রভৃতি তখনকার প্রসিদ্ধ অধ্যাপকগণের সাহচর্য্যে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। ক্যাথিড্রাল মিশন কলেজে তিনি সংস্কৃতের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহ আন্দোলনে যাঁহারা প্রত্যক্ষ ভাবে যোগদান করিয়াছিলেন, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে একটি প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কেবল আন্দোলনের প্রসার বৃদ্ধিতে সহায়তা করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের বিধবা কন্যাকে স্বয়ং বিবাহ করিয়া কার্য্যতঃ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

অধ্যাপকতা কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিবার কালে তিনি আর্য্যদর্শন প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। এই সাময়িক পত্রখানি কয়েক বৎসর সুসম্পাদিত হইয়া চলিবার পর বন্ধ হইয়া যায়। যে কয় বৎসর চলিয়াছিল, সেই সময়ের মধ্যে উহার যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি জন্মিয়াছিল।

অধ্যাপকতা কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে তিনি সরকারী কর্ম্মে নিযুক্ত হন এবং ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ গ্রহণ করেন। এই শ্রমসাধ্য কর্ম্ম উপলক্ষে তাঁহাকে অনেক অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করিতে হয়। ম্যালেরিয়ার আক্রমণে তাঁহার স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হয়।

যোগেন্দ্রনাথ অধ্যাপকতা ও ডেপুটীগিরি করিলেও মনে প্রাণে তিনি সাহিত্যিক ছিলেন। অনেক সময় তিনি মনে করিতেন, সকল প্রকার কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল সাহিত্য সেবাতেই আত্মনিয়োগ করিবেন। আর্য্যদর্শন তাঁহার এই সাহিত্যানুরাগের প্রকৃষ্ট পরিচয়। কিন্তু তাঁহার এই অভিলাষ তিনি কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। তথাপি কর্ম্মের অবসরে তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে—(১) গ্যারিবল্ডির জীবনবৃত্ত, (২) ওয়ালেসের জীবনবৃত্ত, (৩) আত্মোৎসর্গ, (৪) জন ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত, (৫) ম্যাটসিনির জীবনবৃত্ত, (৬) হৃদয়োচ্ছ্বাস, (৭) প্রাণোচ্ছ্বাস, (৮) মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জীবনবৃত্ত, (৯) শান্তি পাগল, (১০) কীর্ত্তিমন্দির, (১১) সমালোচনমালা, (১২) প্রাতঃস্মরণীয় চরিতমালা, (১৩) চিন্তাতরঙ্গিণী, (১৪) (১৫) (১৬) শিক্ষা সোপান তিন ভাগ, (১৭) হইতে (২৪) আইন সংগ্রহ আট ভাগ, (২৫-২৭) জ্ঞান সোপান তিন ভাগ, ইত্যাদি। ইহা ব্যতীত স্কুলের ছাত্রদের পাঠোপযোগী নানা বিষয়ক বহুসংখ্যক পুস্তক তিনি রচনা করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরামর্শ অনুসারে তিনি আত্মোৎসর্গ গ্রন্থখানি রচনা করেন।

দিনাজপুর, রঙ্গপুর, যশোহর প্রভৃতি স্থানে কিছুদিন করিয়া কর্ম্ম করিবার পর দ্বারভাঙ্গায় বদলী হইবার সময় তাঁহার স্বাস্থ্য এতই ক্ষুণ্ণ হয় যে চিকিৎসার্থ তাঁহাকে কলিকাতায় আগমন করিতে হয়। কিন্তু ভগ্ন স্বাস্থ্য আর পুনরুদ্ধার করা হইল না—সন ১৩১১ সালের ৩০এ জ্যৈষ্ঠ তিনি লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন।

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট রূপে তাঁহার অপক্ষপাত বিচার কার্য্য পরিচালনে কর্ত্তৃপক্ষ এবং অর্থী প্রত্যর্থী সকলেই সন্তোষলাভ করিতেন।

আসামের মাছ-ধরা

শিল্পী—শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রভূষণ দে

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

COLOURED ILLUSTRATION

বিচিত্রা ধরণী

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

সহসা ভাঙিল ঘুম ; গভীর রজনী ;
মৃতা স্তব্ধা বাক্যহীনা বিস্তৃতা ধরণী
প'ড়ে আছে ধূম্রবর্ণা ; দিকে দিকে দিকে
অজস্র শ্রাবণ-ধারা বর্ষে অনিমিখে
ভীতা ত্রস্তা ধরাপৃষ্ঠে—হরিণী-শরীরে
তীব্র ঘন বাণ সম। বায়ু ঘুরে ফিরে
দক্ষিণে পূরবে কভু প্রবল নিস্বনে
বাদলে বিত্রস্ত করি' অশান্ত চরণে
ছুটিছে উদ্দাম।
দাঁড়াইয়া বাতায়নে
হেরিতেছি জল আর পবনের সনে
দ্বন্দ্ব অবিরাম।
সহসা বাজিল বক্ষে
সর্ব্ব পৃথিবীর সর্ব্ব দেশে কক্ষে কক্ষে
উঠিছে উল্লাস যত ক্রন্দন নিশ্বাস ;
সানন্দ মিলন আর হাস্য পরিহাস ;
জননীর স্নেহ কথা ; প্রিয়ার ভাষণ ;
শিশুদের আলাপন ; যোদ্ধার গর্জ্জন ;
মিত্রজনে সকৌতুক রহস্য-বচন ;
আর্ত্ত, নিঃস্ব, ব্যথিতের উচ্ছ্বাস-বেদন ;
ধরণীর সর্ব্ব সুখ আর সর্ব্ব ব্যথা ;—
সহসা সকলে মিলি' রচি' নিবিড়তা
আসিল হৃদয়ে মোর। মনে হ'ল আজ
যে-মুহূর্ত্তে আমি হেরি, ভুলি' সব কাজ,
বরষার মেঘ আর বারির নর্ত্তন—
সে-মুহূর্ত্তে ধরা-বক্ষে বিচিত্র স্পন্দন
উঠিতেছে অবিরাম।

এই এ নিমেষে
বনে-ঘেরা ধরণীর কোন্ প্রান্তদেশে

জীর্ণ কুটীরের মাঝে বসিছে জননী
জাগরণ-শীর্ণা, ক্ষীণা, মলিন-বরণী—
মুমূর্ষু সন্তান বুকে ; মৃত্যু দয়াহীন
তীব্র কশাঘাতে নিত্য করিতেছে ক্ষীণ
সে প্রিয় সন্তানে। জননী নামায়ে মুখ
দুর্ভেদ্য বাহুর বাঁধে প্রসারিয়ে বুক,
আগুলায় সে সন্তানে ; ছাড়িবে না তারে ;
প্রাণ-আলো যত নেবে, তত আশা বাড়ে—
"রাখিব রাখিব ধ'রে।"
এরি পার্শ্বে জাগি'
সুরম্য দীপিত কক্ষে আনন্দের লাগি'
নবীন প্রণয়ী আর নব প্রণয়িনী
যাপিতেছে মধুভরা প্রথম যামিনী
মিলনের ; চোখে চোখে আর মুখে মুখে
হাস্য শুধু, হর্ষ শুধু, উচ্ছ্বসিত সুখে
ফেনিল আবেগ আর মদির চুম্বন।

আবার কোথায় কোন্ সুষুপ্ত ভবন—
নিস্তব্ধ চরণে চলে প্রতিহিংসা-ভরে
কোন নর, আত্মীয়েরে নাশিবার তরে
লয়ে ছুরি।
কোথা হাসে প্রথমা জননী,
আজি রাত্রে লভিয়াছে আনন্দের খনি
প্রথম সন্তান।
কোথাও জ্বলিছে ঘর—
যত্নে-ঘেরা আরামের সুন্দর নিগড়
সর্ব্বনাশা অগ্নিমুখে পুড়ে হয় ছাই।
ত্রস্ত গৃহী বলে—"কই, ভগবান নাই!"

বিবাহ-উৎসবে কোথা সারা গ্রাম মাতে—
উল্লাসে উচ্ছ্বাসে ভোজ্যে আজিকার রাতে
বহিছে প্রাণের বন্যা। শত নারী নর
বলে যেন—"দুঃখ নাই ধরণীর 'পর।"

প্রথমা বিধবা আজি কোথায় লুটায়,
আছাড়ি' ধরণী 'পরে করে 'হায়, হায়'
নাথহীনা। অন্ধকার গৃহখানি তার
দীর্ঘশ্বাসে বেদনায় কাঁপে বারম্বার।

আজিকে বরষা-রাত্রে বিচিত্র বিলাপ,
বিচিত্র আনন্দ, সুখ, বিচিত্র সন্তাপ—
ধরণীর মানবের সকল বেদন,
বরষা-ধারার মাঝে তোলে শিহরণ
হৃদয়ে আমার। চুম্বক সমান হিয়া
ধরণীর সর্ব্ব দেশ হ'তে আহরিয়া
সর্ব্ব দুঃখ সুখ আজি করে অনুভব ;—
বিচিত্র আস্বাদ তার ; সে যেন বিভব
সমারোহে হৃদয়েরে করিছে দুর্ব্বার ;—
সবাকার দুঃখ সুখ আজিকে আমার।

—

সুগায়িকা

শ্রীঅপরাজিতা দেবী

মাপ করবেন ;—পারবো না আজ হবেনা ভাই !
তুমি গাও,—আমি পালাতে চাই।—
শরীরটে আজ ভালো নেই মোটে,
টন্‌সিলে ব্যথা,—কম্‌প্লেন্ থ্রোটে,
আজ থাক ! আমি হাতজোড় করে চাইছি ক্ষমা ;—
দোহাই ! আজকে গাইবে রমা !

ইন্‌টারন্যাল্ সর্দ্দিতে ভাই ভুগছি ভারি,
এ' গলা নিয়ে কি গাইতে পারি ?—
দূঃর্ ! তা' কি হয় ? গাইবো কি করে ?
মোটে চড়বে না, গলা আছে ধরে !
গেয়ে যাবো খাদে ?···আনাড়ীর মত বোলোনা বেলা !!
—উপরোধে চলে ঢেঁকিও গেলা ?
—হঠাৎ এমন বল্‌লেই ঢেঁকি গেলা কি যায় ?
নিন্দে কুড়োতে কে আর চায় ?
যন্তরগুলো তত ভালো নয়,
এতে কি কখনো সুরে গাওয়া হয় ?—
সঙ্গত্ ভালো না হোলে গাইতে পারিনে মোটে !
তান্ টান্‌গুলো ঘুলিয়ে ওঠে।

বেসুরো বল্‌ছে বাজনাটা, শোনো,—পর্দ্দা ঢিলে !
এখনো বাঁচবে সারিয়ে নিলে।
তব্‌লা জোড়াটা না হলে তো ছাওয়া,
চলবেনা আর কোনো কিছু গাওয়া,
তানপূরো যদি রাখতে জোগাড়,—থাকতো মান !
এই গলাতেও চল্‌তো গান।

তাই তো বলছি, আজ কাজ নেই—দু'দিন যাক্ !
জোগাড় কিছুর না-ই বা থাক্,—
প্রমিস্ করছি, ছুটি-ছাটা দেখে—
শোনাবোই গান সবাইকে ডেকে,
গলাটা তখন সেরে যাবে ঠিক,—আশা তো হয় !
—রমা, গাও ; আজ—আমার নয়।

—

কুমারী ও শোরাব

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম-এ, বি-এল

(মহাকবি ফারদৌসীর সাহ্‌নামা অবলম্বনে)

[তুরাণের তরুণ সেনাপতি শোরাব ইরাণে তুর্কী বাহিনী লইয়া অভিযান করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা রোস্তাম ইরাণের প্রধান সেনাপতি। তাঁহার জননী সুনঙ্গম প্রদেশের রাজকন্যা। সুনঙ্গম তুরাণী প্রদেশ।]

সমাধি-ভূমির সাইপ্রেস-সম আকাশ-চাওয়া শির
নবীন কিশোর স্পর্দ্ধা-বিভোর যেদিন শোরাব বীর
সফেদ-কিল্লা-রক্ষী হুজীরে বন্দী করিল রণে
মলিন বিলাপ যুঝিল বিষাদে লুপ্ত প্রতাপ সনে।

গুরুদাফরীদ গোলাপ-কপোল গুজদুহমের কন্যা
রোষের আগুনে হইল দীপ্ত যেন রবি-কর-বন্যা
ইরাণের রবি ভাতিবে আবার পাবে বর্ব্বর শিক্ষা
সর্ব্বনাশের অমোঘ মন্ত্রে হবে তুরাণীর দীক্ষা।

পলকে লুকালো কালো কেশ-রাশি অজেয় লৌহবর্ম্ম
রোথক শিরোপা রক্ষিল শির—হিংসা-তীব্র মর্ম্ম
তূণ-ভরা বাণ রুধির-পিয়াসী
তরবারি-মুখে লক্‌লকে হাসি
অধীর অস্ত্রে শোভিত তরুণী সাধিবে বীরের ধর্ম্ম
বিক্রমে তার বুঝিবে তুর্কী কি করেছে অপকর্ম্ম।

ঈগলের বেগে উড়িল তাহার ক্ষিপ্র চপল বাজী
ঝঞ্ঝা-প্রবল বীর-রমণী দেখাইবে কার্‌সাজী—
তুরাণ-বাহিনী মুগ্ধ ত্রাসে শুনিল অট্টহাস
"শ্রেষ্ঠ তোদের কোন্ বীরের আজ সমরেতে অভিলাষ ?"
—কিশোর যোদ্ধা—এ হেন স্পর্দ্ধা—ভাবিল শোরাব বীর
বর দেহে তার শোভিল কবচ—চীনের মুকুট শির।
ইরাণী-ধনুর বাণের বন্যা-প্লাবিত তুরকী যোদ্ধা—
শ্রান্তে ব্যথিতে নাহি রক্ষিলে হারাবে তাদের শ্রদ্ধা।
ঢালে আবরিয়া বদন তাহার শোরাব কেশরী বীর
রক্তের নদী উজান বাহিয়া সম্মুখে এলো ধীর,
গুরুদাফরীদ—কার্ম্মুক হতে ছুটিল বহ্নি-বাণ
বিজলী-ঝলকে শোরাব কৃপাণে হইল সে খান্‌খান্।
ক্ষোভে অপমানে বীর-তরুণী হানিল হাতের বরশা
তাহার প্রকোপ রোধিবে শোরাব দেখি তার কত ভরসা।
কেশরী-শাবক রোস্তাম-শিশু—অস্ত্র এড়িল হাসি,
ক্ষেপিল ক্ষিপ্র আততায়ী-পরে সিংহ-বাঁধন ফাঁসি।
এ কি সর্ব্বনাশ ! বহে দীর্ঘশ্বাস—খসে গেল তার বর্ম্ম
বিস্মিত বীর শোরাব বুঝিল কৃষ্ণ-কেশের মর্ম্ম।
—'কুমারীর সনে যুঝিতেছি আমি তুরাণের আশা, বীর—
ছিঃ ছিঃ ক্ষম মোরে হে বার-কিশোরী অবনত মোর শির।'
"কিবা এ ভীষণ অরাতি-নাশন তুরাণের সেনাপতি
বীর-সুন্দর জিনেছ সমর ?"—ব্যঙ্গে কহিল সতী।
"বিশ্ব ঘোষিবে কীর্ত্তি তোমার মোর পরাজয়ে আজ।
রক্ত প্লাবন কিবা প্রয়োজন ? যুদ্ধে কি আর কাজ ?"
মুগ্ধ-পিপাসা-ক্লান্ত-নয়নে রোস্তাম-সুত তারে
হেরিল হর্ষে সুজুর-গণ্ড ইরাণের ফুল-হারে।
ইদেনের কোন্ ফুল-বীথিকার সুরভি-সরস রত্ন
কঠোর যুদ্ধ-প্রাঙ্গণে আজি—দেবের যে পায় যত্ন।
শৈল-শিরের হরিণীর মত মৃদু-চঞ্চল আঁখি,
ভ্রূ ধনুর তীর পলকে যাহার পূলকে রক্ত মাখি।
কহিল শোরাব—"ভাল তাই হবে, এস করি মোরা যুদ্ধ,
তোমারে মারিয়া ইরাণী-শোণিত-তর্পণে হব শুদ্ধ।"
সিন্দূর রাগে রঙিল যুবতী পাকা-দাড়িম্ব-গণ্ড
কহিল, "কিশোর, বৃথা এ স্পর্দ্ধা গর্ব্ব হবে পণ্ড।
বিশ্ব-বিশ্রুত কীর্ত্তিকাহিনী রবে চির দুর্জ্জনার
নিভৃত প্রান্তে কর সুন্দর যুদ্ধের অভিসার।
তুমি যদি হার অবলা-সমরে সাক্ষ্য রবে না কেহ ;
আমি যদি হারি—দিব ছাড়ি তোমা আজি এ দুর্গ গেহ।
নত শিরে মোরা বিজয়ী তোমায় সঁপিব মোদের দেশ ;
বৃথা রুধিরের কিবা প্রয়োজন কেন বা দ্বন্দ্ব রেশ।"
সম্মত বীর গুরুদাফরীদ সাথে ছাড়ি রণ-ক্ষেত্র
চলিল প্রান্তে জিনিতে সমর তেজ-ঝলসিত নেত্র।
শ্বেত দুর্গের তোরণের দ্বারে কহিল কুমারী—"বীর,
নিমেষের তরে লইব বিরতি—লভ বিশ্রাম ধীর।
রুধির-সিক্ত কলেবর মম শান্ত করিয়া আসি
সমরের সাধ মিটাব তোমার, হরিব মুখের হাসি।"
চলিল যুবতী দুর্গ মাঝারে তোরণ হল বন্ধ,
বাহিরে রহিল তুরাণের বীর ক্রোধে আঁখি হল অন্ধ।
পরিখার পরে দাঁড়ায়ে যুবতী কহিল শ্রীমুখে হাসি
"রক্ষা পেয়েছ কুমারী-সমরে—বোকা সুনঙ্গমবাসী,
শিবিরে বসিয়া কর প্রতীক্ষা—বিজয় লাভের আশে
রোস্তাম বীর ফেরু-পাল সবে অচিরে বাঁধিবে ফাঁসে।
বর্ব্বর যত তুর্কী সেনানী কেহ ফিরিবে না ঘর
স্পর্দ্ধা এবার ঘুচিবে তোমার হে দাম্ভিক-বর।"
বিস্মিত বীর পলকে হেরিল চপল চোখের জ্যোতি
যুদ্ধ শিখেছে কিশোর কেশরী, শেখেনি আঁখির গতি।*

* কলিকাতা য়ুনিভার্সিটি ইন্‌সটিটুটে ফারদৌসী উৎসবে পঠিত।

—

মহর্ষি

শ্রীপারুল দেবী (লাহিড়ী)

অনন্তের আশীর্ব্বাদে কোন্ এক প্রচ্ছন্ন কল্যাণে
হে কল্যাণময়,
এসেছিলে আশীষের রাঙালিপি লইয়া আননে,
ঋষি তব জয়।
যোগী তব ধ্যান মন্ত্র উচ্চারিল যেদিন ভারত
দৃপ্ত কণ্ঠে তার,
ত্যাগ ক্ষমা সংযমের দীপালোকে কর গো জাগ্রত
বিশ্ব পারাবার।
শিখাইলে মানবেরে মুক্ত শক্তি করিয়া উদ্যত
শ্রদ্ধাপূর্ণ মনে ;
সন্ন্যাসীর গৈরিকের ত্যাগ বস্ত্র ভিন্নও অনন্ত
পাবে সর্ব্বজনে।
দেখাইলে সংসারীও গৃহ মাঝে হইয়া সন্ন্যাসী
পারে রহিবারে ;
মানবের শ্রদ্ধারাশি সংসারেই উঠিয়া উচ্ছ্বসি
অশ্রু হোয়ে ঝরে।
প্রকৃতির ঘন ঘোর শ্যামলতা তোমার আসন
হোয়েছিল যোগী ;
ঐশ্বর্য্যের লুব্ধ আঁখি পারে নাই করিতে শাসন
হে ভোগবৈরাগী।
গৃহ তার পুরাতন ভোগময় অদৃশ্য শৃঙ্খলে
বাঁধিতে তোমায়
চেয়েছিল, কিন্তু হায় পারে নাই বৈরাগী পাগলে
করিবারে জয়।
শুধাইল গৃহ যবে গৃহী তুমি পাইয়া আমায়
কেন কর হেলা ?
বোলেছিলে মা আমার তুমিই তো শিখালে সবায়
করিতে এ খেলা।
ধ্যানী তব সৌম্য ধীর শান্ত মূর্ত্তি অনন্ত আহ্বানে
পাগল হইয়া
দিয়াছিল সংসারের ভোগলিপ্ত মানব সন্তানে
ধ্যানে জাগাইয়া।
চির জয়ী কালচ্ছায়া পারে নাই তোমার হিয়ায়
প্রসারিতে কর ;
শিশু সম শুভ্র হিয়া মগ্ন ছিল সাধনা ছায়ায়
ওগো ঋষিবর।
হে সাধক প্রকৃতিকে চেয়েছিলে গৃহের আসনে
সমান উৎসাহে ;
তাই তব অনাবৃত মুক্ত হিয়া গৃহের আহ্বানে
ধায় নগ্ন হোয়ে।
দিক্‌হারা স্বাধীনতা কখনও করে নি আঘাত
কাহারো অন্তরে
নির্জ্জনতা মাঝে তারা রচেছিল উদ্বুদ্ধ প্রভাত
নীরবে মন্থরে।
ভারতের কোন্ ঋষি পুন এলে ভারত দুয়ারে
আপন বেদীতে
কোলাহল মগ্ন বিশ্বে রচি গেলে নির্জ্জন প্রস্তরে
মুক্ত দীপ্ত চিতে।
সেই এক পাষাণের বেদী পরে ধ্যানের আসন
পাতি গেছ চলে ;
আরবার আসিবে কি তপোবনে তাহার ভাষণ
শুনাতে সকলে ?
তোমার সে লোভহীন সুগম্ভীর সংযত হিয়ায়
তপস্যার বল
ছিল বসি তন্দ্রাহীন অনলস অমৃত আশায়
হইয়া প্রবল।
তোমার সে আরাধনা দিকে দিকে আজিও বাজিছে
নব রূপ লয়ে
হে অমর, হে তপস্বী, ওই শোন, ধরণী কহিছে
আত্মহারা হোয়ে।
পৃথিবীর পূর্ব্ব হ'তে নামি গিয়া পশ্চিম অঞ্চলে
দক্ষিণ উত্তর
সবে কহে ধন্য ঋষি ধন্য তব আশীষ সফল
ধন্য কবিবর।
পুন এস এ ভারতে, এস ল'য়ে অনন্ত দর্শন
অতৃপ্ত কামনা ;
কৈশোরের যৌবনের সব সাধ করুক বর্ষণ
অমর সাধনা।

তুমি ভালোবেসেছিলে প্রকৃতির প্রত্যেক স্পন্দন
নিশ্বাস প্রশ্বাস ;
তুমি ভালোবেসেছিলে সংসারের ধূসর বরণ
সসীম আকাশ।
তাই প্রকৃতির প্রাণ তুলি দিল তোমার চরণে
তার শ্যামলতা ;
সংসারের তীর্থবারি বিলম্ব না করিল বরণে
তার নবীনতা।
হে তাপস পুন এস জয়টীকা অঙ্কন করিয়া
সমুন্নত ভালে
তোমার সে ভক্তিপূত প্রকৃতির উত্তরী লইয়া
তপ বেদীতলে।

"তোমার ধরায় প্রতি প্রাতে হোক—"

শ্রীহাসিরাশি দেবী

বন্ধু, হেরিছ আমার অদূর সুনীল সন্ধ্যাকাশে
রজনী আসিছে নামি—
চির যবনিকা সাথে,
তবুও ক্ষণিক দাঁড়ায়ে তোমার খেলার পান্থবাসে
নাম লিখে যাই আমি,—
আলোকের আলেয়াতে ;
আমি গেলে মোরে ভুলে যেও, আর কোন' দিন জাগায়ো না,
তার চেয়ে র'য়ো জাগি—
নব প্রভাতের তরে,
যে কথা কারেও শুধাওনি, তাহা আমারেও শুধায়ো না
পিছন হইতে ডাকি
আজি আগ্রহ ভরে।

তার চেয়ে দেখো দূর-দিগন্তে আকাশ ধরণী মিশি
যেথা হ'লো একাকার,—
উড়ে যায় বলাকারা,
তার চেয়ে শোনো বাঁশী কে বাজায়, সাড়া দেয় দিশি দিশি—
স্তব্ধ ব্যর্থতার
শেষ হয় আঁখিধারা !

কবে কোন দিন বেদনা-ব্যাকুল পাণ্ডুর শশধর
চেয়ে রবে' মুখ পানে,
সে কথা ভুলিয়া যাও,—
তার চেয়ে খেলো নূতন খেলায়, যা হয় পূর্ব্বাপর,
পুরাতন অবসানে ;
আবার ভুলিও তাও।

বন্ধু, আজিও আমার জীর্ণ মন-মর্ম্মরতলে
তোমারই নয়ন আঁকা
বুকের শোণিত দিয়া,—
লাজের লালিমা হারায়েও সে যে ঘন কালো হ'য়ে জ্বলে,
ব্যর্থ বাঁসনা মাখা,
ম্লান মুমূর্ষু হিয়া ;
পৃথিবীতে মোর হ'য়েছে কাকলী-কূজন-চিহ্ন শেষ,
দগ্ধ এ মরুপথে
বন্ধু, বিদায় আজ,—
তোমার ধরায় প্রতি প্রাতে হোক রবির নবোন্মেষ,
রামধনু রঙা রথে
আসুক রাজাধিরাজ।

আবাহন

শ্রীজ্যোতির্মালা দেবী বি-এ

দাও সে উদাত্ত বাণী গভীর আত্মার,
প্রোজ্জ্বল প্রণব-কল্প ঝঙ্কার যাহার
নিঃসংশয় আকর্ষণে—চুম্বকের সম—
ঊর্দ্ধ হ'তে ঊর্দ্ধে ল'বে চেতনায় মম।
রুদ্ধ মোর বক্ষমাঝে আনো হে ঋত্বিক,
জ্যোতির্দীপ্ত নবারুণ—সত্যের প্রতীক—
দ্যুলোক-আসন হ'তে। উচ্চারি' ওঙ্কার
প্রলয়-স্বননে খোল মন্দির-দুয়ার !

ছিন্ন কর হৃদি-গ্রন্থি, অর্ঘ্য তুলি' লহ,
মন্দ্রিয়া অন্তর তল জ্বালো বিদ্যুদ্বহ
ব্যোমপ্লাবী সাম-গান। দাও অভিনব
গঙ্গোত্রী-সন্নিভ চিত্তে গায়ত্রী-বিভব,
ভাস্কর-বন্দনাব্রতী ব্রহ্মিষ্ঠ-হৃদয় ;
গাহিব নির্ম্মুক্ত কণ্ঠে তব মন্ত্রচয়।

অতীতের ঐশ্বর্য্য

শ্রীনরেন্দ্র দেব

(প্রাচীন ইঙ্কা স্থাপত্য)

অতীতে যে দেশ একাধিকবার শিক্ষা ও সভ্যতার পরম সৌভাগ্যে গৌরবান্বিত হ'য়ে উঠেছিল, যা'দের পৌরাণিক সংস্কৃতির বহু নিদর্শন আজও মহাকাল সম্পূর্ণ হরণ করতে পারেনি, ভূতকালের অমিত শক্তিধর স্পেন তার দিগ্বিজয়ী দুর্দ্ধর্ষ বাহিনী নিয়ে গিয়ে যাদের শিল্প-সমুজ্জ্বল শান্ত প্রদেশ ধ্বংস করে নব-সাম্রাজ্য স্থাপনা করেছিল, সেই 'আন্দী' রাজ্যের অধিবাসী 'ইঙ্কা'দের ইতিহাস প্রাচ্যের তুলনায় খুব প্রাচীন না হ'লেও বহুদিনের পুরাতন যে নিশ্চয় এ বিষয়ে নানা নিঃসন্দেহ প্রমাণ পাওয়া গেছে।

দক্ষিণ আমেরিকার যে পার্ব্বত্য অংশ প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ঢালু হ'য়ে নেমে গেছে, যার একদিক ইক্যুয়েদোরের নদী 'অঙ্কম্মায়ু' ও অপর দিক চিলীর নদী 'মৌলী' আগ্রহে আবেষ্টন ক'রে রয়েছে, সেই ক্রমোচ্চ শৈলাঞ্চলের সুবিস্তৃত ভূভাগ ছিল একদা ইঙ্কাদেরই করতল গত। বর্ত্তমানে এ প্রদেশের অনেকখানি অধিকার করে রয়েছে ইক্যুয়েদোরের গণতন্ত্রাধীন রাজ্য, পেরু রাজ্যেরও প্রায় সমস্তটুকুই এর মধ্যে, বলিভিয়ার উচ্চ অধিত্যকা ও চিলীর উত্তর-সীমান্ত প্রদেশ এরই সীমানার মধ্যে ঢুকে

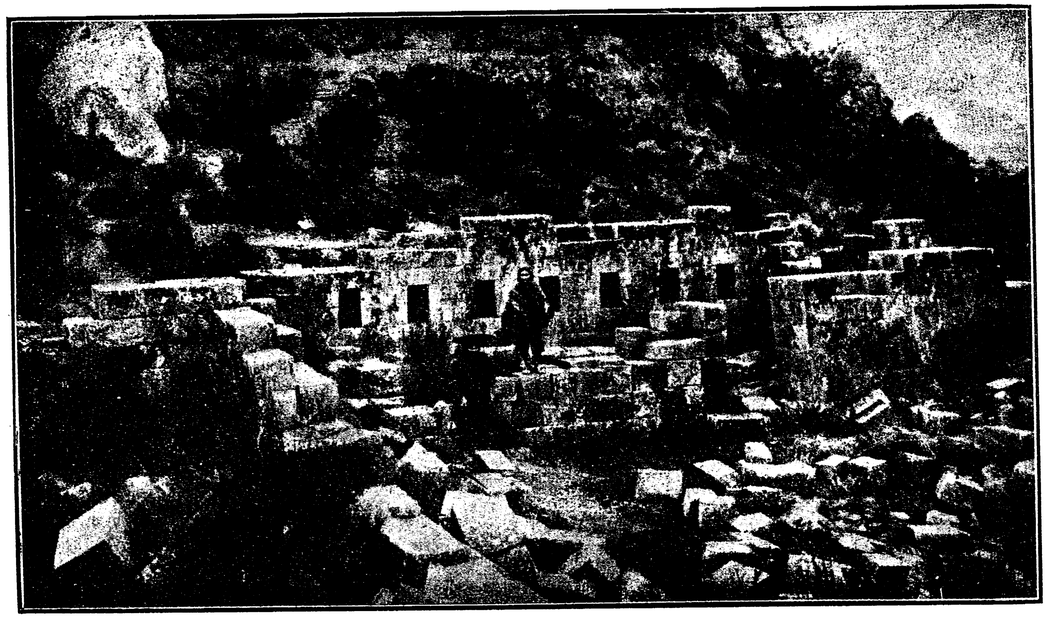

ইন্তিহোতানা মানমন্দির (কুজকোর অনতিদূরে পাইসাক নগরে নির্ম্মিত হ'য়েছিল ইঙ্কাদের এই গোলাকার মানমন্দির। ইঙ্কারা ছিল গ্রহোপাসক। সূর্য্য, চন্দ্র, শুক্রতারা প্রভৃতি গ্রহ নক্ষত্র ছিল তাদের দেবতা। তারা ছিল প্রকৃতিরও পূজারী! বজ্র, বৃষ্টি, রামধনু ইত্যাদিও তাদের কাছে পূজার্হ ব'লে গণ্য ছিল। মানমন্দিরের প্রাচীর গাত্রে যে কোলঙ্গাগুলি দেখা যাচ্ছে—ইঙ্কা স্থাপত্যের ঐ গুলি একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য)

পড়েছে আজ। ১৫৩৩ খৃঃ অব্দে পেরু-বিজয়ী ইতিহাস প্রসিদ্ধ পীজারো ইঙ্কাসাম্রাজ্যের যে চৌহদ্দি বর্ণনা ক'রে গেছেন তার উপস্থিত অবস্থা এই। সেদিন এই ইঙ্কাসাম্রাজ্য ছিল সকল দিক দিয়ে এমন সুব্যবস্থিত ও সুপরিচালিত যে পুরাতত্ত্ববিদেরা তা' অবগত হবার পর তাঁদের আর বিস্ময়ের অবধি ছিল না! ইঙ্কার শিল্পীদের হাতের কাজ—কি মৃৎ-শিল্পী, কি ভূষণ-শিল্পী, কি শিলা-শিল্পী ও ভবন-শিল্পী সকল বিভাগের শিল্পাচার্য্যগণের সৃষ্টিই এক অপরূপ নৈপুণ্যের পরিচয় প্রকাশ ক'রছে।

বিস্তৃত হ'য়েছিল প্রায় ১৪০০ খৃঃ অব্দে। কুজকো হ'য়ে উঠেছিল সেদিন নবীন ইঙ্কাসাম্রাজ্যের রাজধানী। দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে কুজকোই এখন একমাত্র প্রাচীনতম নগর যা আজও জীবনের স্পন্দন নিয়ে বেঁচে আছে। এই কুজকো শহরে এখনো এমন সব অতীত যুগের স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন রয়েছে যা ইঙ্কাদের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বে রচিত ব'লে জানা গেছে। ইঙ্কাদের পূর্ব্ববর্ত্তী সেই প্রাচীন জাতির কীর্ত্তি দর্শনে সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে মাথা নত না ক'রে উপায় নেই। স্থাপত্য-শিল্পে তাঁরা যে আশ্চর্য্য শক্তি ও কৌশলের

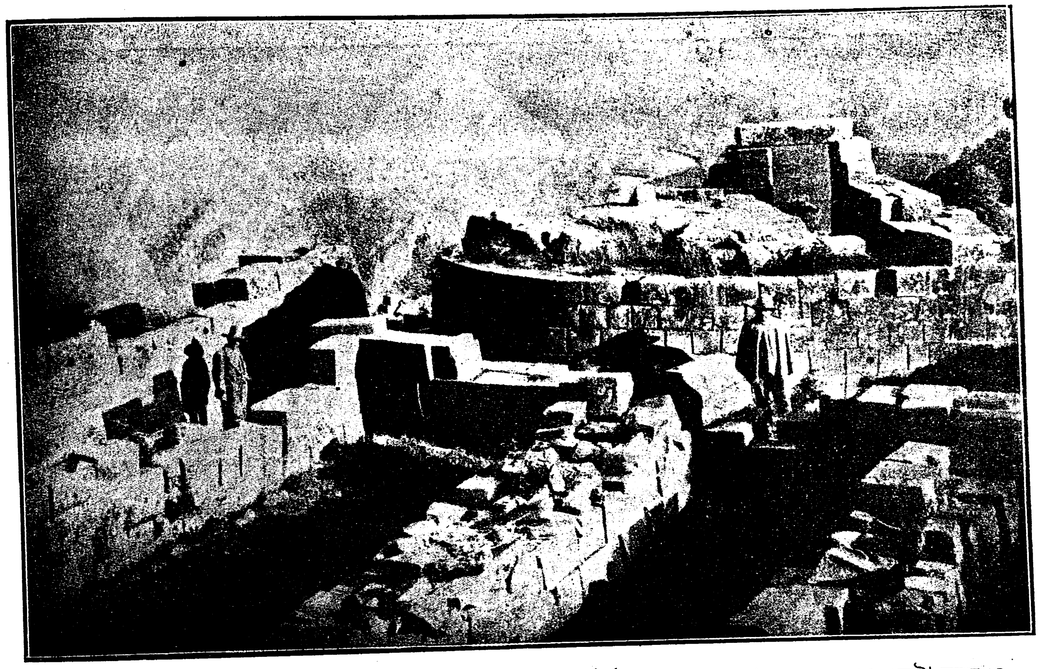

মানমন্দিরের অপরাংশ (কেবলমাত্র যে গঠন পারিপাট্যের গুণেই ইঙ্কা স্থাপত্য কলা সকলের মনে একটা সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার ভাব উদ্রেক করে তা' নয়, প্রত্যেক মন্দিরটির পারিপার্শ্বিক অপরূপ প্রাকৃতিক আবেষ্টন তাকে সুন্দরতর ক'রে তোলে দর্শকের চোখে। এই মানমন্দিরের পটভূমি স্বরূপ অদূরে যে ধূসর গিরিশ্রেণী উচ্চ শিরে অপেক্ষা করছে, তার সাহচর্য্যের গুণে এই ধ্বংসাবশেষ মন্দিরাংশ এখনো যেন তার আভিজাত্যটুকু হারায় নি বলে মনে হয়)

অথচ, ইতিহাস বলে ইঙ্কারাজ্যের পত্তন সুরু হ'য়েছিল সবেমাত্র ১১০০ খৃঃ অব্দে! এই সময় তারা সুদূর দক্ষিণাঞ্চল হ'তে দিগ্বিজয়ে অগ্রসর হ'য়ে 'কুজকো' নগরে এসে বসবাস আরম্ভ করেছিল। সমগ্র সাগরতীরে তাদের অধিকার পরিচয় দিয়েছিলেন, তার তুলনা হয়না। অগণিত দুর্ব্বহ বিশাল প্রস্তরখণ্ড নিয়ে তাঁরা ছিনিমিনি খেলে গেছেন! তাঁরা যে সব পাষাণ-প্রাসাদ নির্ম্মাণ ক'রে রেখে গেছেন, তা' গিরি-শিখরের মতই দীর্ঘ অটলতা নিয়ে এখনো দাঁড়িয়ে আছে।

কুজ্‌কো যেন এক বিষাদ-বেষ্টিত বিস্ময়! সাক্‌শা-হোমান্ পর্ব্বত শৃঙ্গের আড়ালে এই প্রাচীন শহর আপনাকে মেলে ধরেছে। পাহাড়ের উপর থেকে চোখে পড়ে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! পেরুর প্রশান্ত আকাশের প্রসারিত বুকে লীলায়িত হ'য়ে উঠেছে যেন এক নিসর্গচিত্র! ফিকে নীলের কোলে মেঘের দোল্‌না ঝুলছে। মৃদু বায়ু হিল্লোলে পর্ব্বত পৃষ্ঠে শস্যশীর্ষ নৃত্য ক'রছে। চতুপার্শ্বের পর্ব্বতাবেষ্টনের মধ্যে গভীর নিম্নে দেখা যাচ্ছে শ্যামলাবগুণ্ঠিতা রক্তাম্বরা নগরী 'কুজকো'—ইঙ্কার প্রাচীন রাজধানী,—যার পাথরে বাঁধা সঙ্কীর্ণ পথ বেয়েই গিরি শিখরের উপরে উঠ্‌তে হয়। প্রাচীন প্রাক্-ইঙ্কা রাজধানীর পরিত্যক্ত ভিত্তির উপর! এই ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বহু-কোণ বিশিষ্ট বড় বড় বিশাল প্রস্তর-গঠিত বেদীর উপর। ইঙ্কাদের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের শক্তিধর স্থপতিরা সেই বিপুল পাষাণ-প্রাচীর স্বচ্ছন্দে নির্ম্মাণ ক'রেছিলেন। অতীত যুগের সেই অতিকায় প্রস্তর স্থাপত্য যেন এ কালের অনধিকারপ্রবেশকারী য়ুরোপীয়দের ক্ষীণকায় ভবন-শিল্পকে চারিদিক হ'তে উপহাস ক'রছে। কুজকোর সঙ্কীর্ণ পার্ব্বত্যপথের উভয় পার্শ্বে প্রাচীন স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন বহন ক'রে আজও দাঁড়িয়ে রয়েছে—সারি সারি অসংখ্য পাষাণ মন্দিরের বিশাল

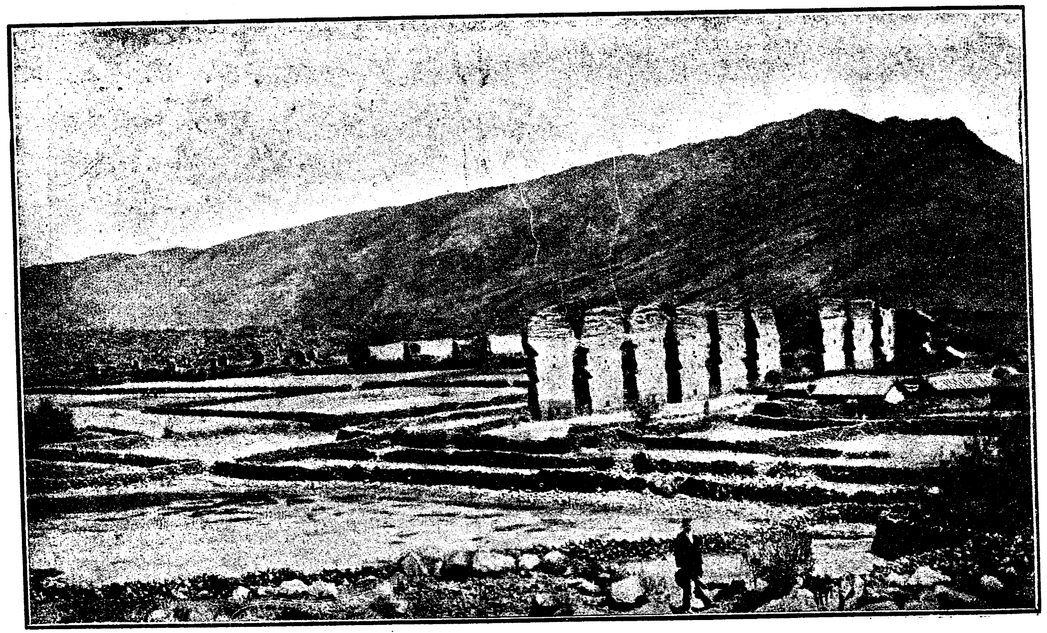

বীরকোষ দেবমন্দির (ইঙ্কারা নিজেদের পূতজাতি বলে গণ্য করতেন। চন্দ্র সূর্য্যের বংশধর বলে তাঁদের একটা অহঙ্কার ও গর্ব্ব ছিল। তাঁরা ছিলেন বীর্য্যবান-শক্তির সাধক। মহাবলশালী দেবতা বীরকোষের অর্চ্চনা ক'রতেন তাঁরা জনে জনে! শক্তিধর দেবতা বীরকোষের উদ্দেশে যে বিরাট মন্দির তাঁরা নির্ম্মাণ করেছিলেন টিটিকাকায় তারই ধ্বংসাবশেষ আজও দেখতে পাওয়া যায়)

এই পথের প্রতি পাষাণ সোপানে পা ফেলে উঠবার সময় এই কথাটাই সমস্ত মনকে যেন একেবারে আচ্ছন্ন ক'রে ধরে যে এইখানে দেখতে পাবো প্রাচীন ইঙ্কা ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী এক অজ্ঞাত জাতির অপরূপ কীর্ত্তিরাজির ধ্বংসাবশেষ! এখানে ইঙ্কাদের অধিকাংশ বড় বড় বাড়ী নির্ম্মিত হ'য়েছিল প্রস্তর ভিত্তি। এ পথে যেতে যেতে একাধিক 'ইণ্ডিয়ান' অধিবাসীর সঙ্গে দেখা হয়। এরা সেই বিলুপ্ত ইঙ্কাদের স্বজাতি বা বংশধর। তাদের প্রশান্ত গম্ভীর কৃষ্ণমূর্ত্তি যেন চির-শোকাচ্ছন্ন! তাদের চোখের দৃষ্টি নিষ্প্রভ। প্রাচীন কুজ্‌কো নগর যে বয়সের দিক দিয়েও বৃদ্ধ হয়ে পড়েছে

তা' জানতে পারা যায়—'ইণ্ডিয়ানদের' অনুচ্চকণ্ঠে আলাপ আলোচনা করা শুনলে! সমস্ত শহরে যেন একটা নিরানন্দ স্তব্ধতা বিরাজ করছে! শহরের পথে কোনো যান বাহনের উৎপাত নেই, লোকচলাচলও সেখানে অত্যন্ত কম। অতীতে একদিন বিজয়ী স্পেনের হাতে যে লাঞ্ছনা ও অপমান এদের সইতে হ'য়েছিল, যে নিষ্ঠুর নির্ম্মম অত্যাচার এদের উপর চলেছিল—তারই বেদনার সকরুণ স্মৃতি ও

সর্ব্বজ্ঞদেব 'রামক' ('কলসাশয়' প্রাসাদে ইঙ্কাদের এই দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইঙ্কারা এঁকে 'সর্ব্বজ্ঞদেব' বলে মনে ক'রতেন। কথিত আছে এই দেবতার সন্নিধানে এসে যে যা ভক্তিভরে শ্রদ্ধার সহিত জানতে চাইত, ইনি সে প্রশ্নের উত্তর দিতেন !— এমন জাগ্রত ছিলেন এই দেবতা। এঁর দক্ষিণ হস্তে লিপিদণ্ড ও বাম হস্তে লেখন-ফলক)

নিদারুণ ভীতি আজও এদের অন্তর ছেয়ে আছে! শুধু পাথরে খোদা তাদের সেই অপ্রশস্ত গহন গলিপথে আজও সেদিনের মতই সারি সারি ভারবাহী অশ্বতর ও উষ্ট্র শ্রেণী নানা ভার পৃষ্ঠে নিয়ে চলে। তাদের সেই ধীরমন্থর সুছন্দ সুন্দর

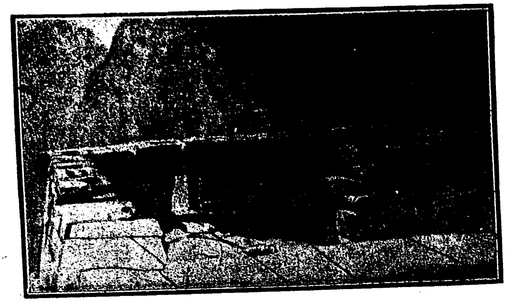

অর্দ্ধচন্দ্রাগার (এ গৃহটী অর্দ্ধ গোলাকৃতি। পর্ব্বতচূড়ার উপর নির্ম্মিত এই মানুষের কীর্ত্তি-চূড়া ইঙ্কা স্থাপত্যের গৌরব-শিখর-স্বরূপ ছিল। আজ এর অনেক-খানি অংশ ভেঙে পড়েছে বটে তবু এ অভিনব স্থাপত্যের তুলনা হয় না)

অর্দ্ধচন্দ্রাগারের অভ্যন্তরে (এ মন্দিরের অভ্যন্তরে ছিল পর্ব্বতচূড়ার উপর সমাসীন কোনো দেবতা নিশ্চয়! আজ তিনি নেই, তাঁর শিখরাসনও দীর্ণ হয়ে গিয়েছে। আসনপার্শ্বে ছিল এক গভীর গুহা, তার খানিকটা প্রকৃতির গড়া—খানিকটা মানুষের তৈরী। দেওয়ালের গায়ে ভিতর দিকেও সারি সারি কোলঙ্গা। প্রত্যেক কোলঙ্গার মাঝে মাঝে পাথরের দীর্ঘ বাট বেরিয়ে আছে)

মিছিল দর্শকের মনে অতীত যুগের বাণিজ্যযাত্রীদের বিস্মৃত চিত্র এঁকে দিয়ে চলে যায়।

পাথুরে শহর কুজ্‌কো যেন পাথরের মতই অসাড় নির্জ্জীব! পাথরের মতই এর অধিবাসীরা সুদৃঢ় কঠিন শব্দহীন ও অদ্বিতীয় সহিষ্ণু! ইঙ্কা স্থপতিরা না কি বিশেষজ্ঞদের মতে 'মায়া'-শিল্পীদের অপেক্ষাও অধিকতর শক্তিশালী ও নিপুণ ছিলেন। গঠন পারিপাট্যের দিক দিয়ে ইঙ্কারা নাকি 'মায়া'-স্থপতিদের তুলনায় অনেক বিষয়ে দক্ষতর নৈপুণ্যের পরিচয় রেখে গেছেন। প্রাচীন যুগের স্থাপত্য শিল্প সম্বন্ধে বিচার করবার সময় দু'টি কথা বিশেষ ভাবে মনে রাখা উচিত যে সে সময় লৌহ বা ইস্পাতের যন্ত্রপাতির অস্তিত্ব ছিল না। পৃথিবীর কোনো দেশ তখনও লোহার

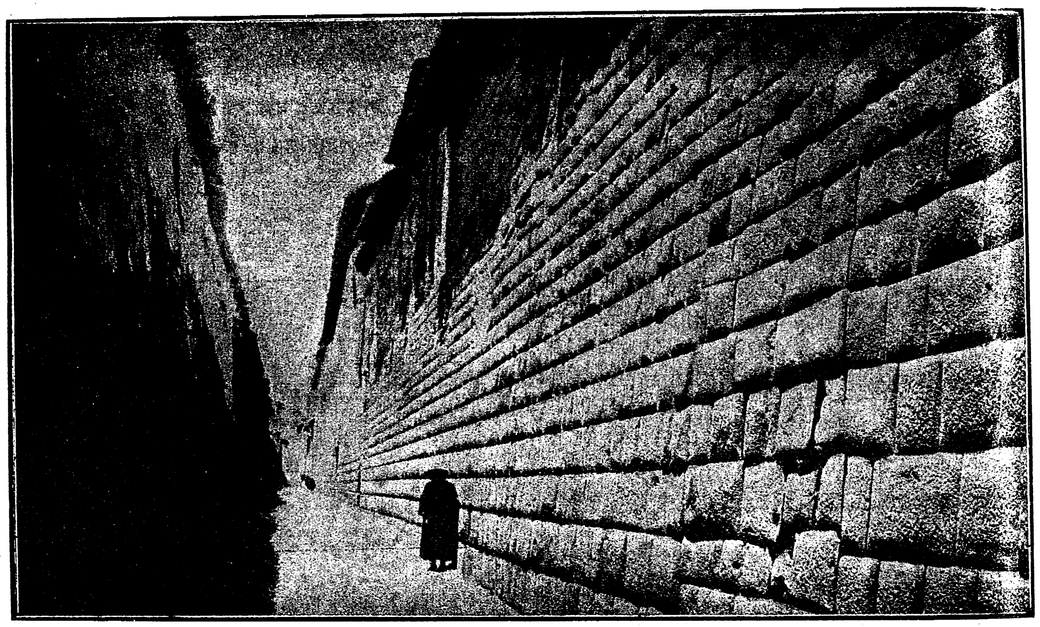

তিন কালের প্রাচীর ('কুজকো' দক্ষিণ আমেরিকার প্রাচীনতম শহর। এ শহরের নানা স্থানে অতীতের বহু নিদর্শন আজও চোখে পড়ে। বিশেষ করে একটি রাস্তার দুধারে যে সব বাড়ী আছে তার প্রত্যেকটির প্রাচীর গাত্রে ত্রিকালের চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। মূলদেশে নানা আকারের পাথরে গড়া সুদূর প্রাক্-ইঙ্কা স্থাপত্য, তার পর প্রায় কুড়ি ফুট পর্য্যন্ত সমান মাপের চৌকোণা পাথরে গাঁথা অক্ষয় ইঙ্কা স্থাপত্য, তার উপর আছে একালের তৈরী ভঙ্গুর ভবন। এমন তিন কালের স্থাপত্য একসঙ্গে আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না)

পাথরের কাজ চলতে পারে না, পাথরের ছেনি দিয়েই তাঁদের পাথর কাটতে হয়েছিল। কিন্তু সে যাই হোক পাথরের কাজের যে নমুনা তাঁরা রেখে গেছেন, বর্ত্তমান যুগের কঠিন ইস্পাত নির্ম্মিত সুতীক্ষ্ণ যন্ত্রপাতির সাহায্যেও হালের স্থাপত্য শিল্প তার পাশে ছেলেখেলা বলে মনে হবে। দ্বিতীয় কথা মনে রাখতে হবে যে সেই আদিম যুগের স্থাপত্য শিল্পীরা খিলান নির্ম্মাণ ক'রতে জানতেন না। তাঁরা ছাদ নির্ম্মাণের জন্য পাথরের কড়ি ব্যবহার করতেন অথবা পাথরের কিনারার উপর পাথর চাপিয়ে গিয়ে ক্রমশঃ ঘরের মাথাটি ঢেকে ফেলতেন। বড় বড় বাড়ীতে এ ভাবে ছাদ সন্ধান পায়নি, কাজেই যা কিছু গঠনের কাজ তা প্রস্তরের অস্ত্র সাহায্যেই তাদের গড়তে হয়েছিল। ঐতিহাসিকেরা বলেন বটে যে পেরুভীয়ানরা এ সময় তাম্র-নির্ম্মিত যন্ত্রপাতি ব্যবহার ক'রতেন, কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলেন তামার যন্ত্র দিয়ে তৈরী করা সম্ভব হ'ত না ব'লে বেশ পুরু ক'রে মোটা চাল ছাওয়া হ'ত।

পরবর্ত্তী যুগের ইঙ্কা স্থাপত্য দেখে বেশ বোঝা যায় যে তাঁরা ক্রমশঃ নানা আকারের বহু কোণযুক্ত বড় বড় বিশাল পাথর

ব্যবহারের পরিবর্ত্তে একই আকারের মাঝারি রকম পাথর দিয়ে গৃহনির্ম্মাণ ক'রতে সুরু করেছিলেন। যে গৃহের জন্য যে আকারের পাথর ঠিক মানানসই হ'তে পারে, পরবর্ত্তী যুগে তাঁরা পাথর সেই আকারে বেশ গঠনোপযোগী চতুষ্কোণ

প্রবেশদ্বার (ইঙ্কা স্থাপত্যে প্রবেশদ্বারগুলি অবিকল মিশরীয় তোরণের অনুরূপ। এটি ইঙ্কাদের একটি প্রাচীন দুর্গ-তোরণ। এ তোরণের বিশেষত্ব হ'চ্ছে মূলদেশ প্রসারিত ও শীর্ষদেশ সঙ্কীর্ণ। প্রত্যেক পাথরখানি প্রায় সমান আকারে চৌকোণা ক'রে কেটে নিয়ে গাঁথা হয়েছে। এই সাদৃশ্য দেখে অনেকে মনে করেন প্রাক্ইঙ্কারা হয়ত' মিশরীয় ছিলেন)

ক'রে কেটে নিয়ে ব্যবহার ক'রতেন। গৃহ নির্ম্মাণে তাঁরা চূণ সুরকী বালি সিমেণ্ট্ বা গোবর মাটি প্রভৃতি কোনো রকম মশ্‌লা ব্যবহার ক'রতেন না। তাঁরা পাথরের গায়ে আল কেটে পাথরের সঙ্গে পাথর এমন সমান ভাবে জোড় লাগাতেন যে সে একেবারে বজ্রের মত কঠিন ও চিরস্থায়ী হ'ত। গোলকুঠি বা অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি গৃহ নির্ম্মাণই ইঙ্কা স্থাপত্যের একটা প্রধান বিশেষত্ব! কুজ্‌কোর প্রাচীন

কোলঙ্গা (প্রাক্-ইঙ্কা স্থাপত্যকলার বিশেষত্ব এর মধ্যে সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। নানা আকারের ও নানা মাপের পাথর একত্রে জুড়ে এর প্রাচীর গাঁথা হয়েছে। বিরাট প্রাচীর গাত্রে বৃহৎ সব কোলঙ্গা রাখা হয়েছে—যার মধ্যে একজন মানুষ বেশ সহজে ঢুকে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। এ কোলঙ্গাগুলিও মিশরীয় ধরণে প্রসারিত-মূল ও শীর্ণ-শির)

সূর্য্যমন্দির যা বর্ত্তমানে স্যাণ্টো ডোমিঙ্গো গির্জ্জার অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে গেছে,—ইঙ্কা স্থাপত্য শিল্পের অপূর্ব্ব নিদর্শন রূপে একদিন সে মন্দির প্রসিদ্ধ ছিল। এই মন্দিরেই ছিল

সূর্য্যের প্রতীক্ স্বরূপ এক বিরাট স্বর্ণচক্র যা স্পেনের আক্রমণের সময় ইঙ্কারা লুকিয়ে ফেলেছিল। বহু অনুসন্ধানেও আজও সে সুবর্ণ সৌরচক্র আবিষ্কার ক'রতে পারা যায় নি। এই মন্দিরাভ্যন্তরেই সযত্নে সংরক্ষিত ছিল প্রাচীন ইঙ্কা নৃপতিগণের শুষ্ক শবদেহ। বহু মূল্যবান রাজবেশ ও মণিমাণিক্যের রত্ন আভরণে সুসজ্জিত ক'রে স্বর্ণ সিংহাসনে তাদের মৃতদেহ সমাসীন ছিল।

কুজ্‌কোর নিকটবর্ত্তী পাইসাক্ নগরে আর একটি প্রসিদ্ধ প্রাচীন গোলকুঠির কিয়দংশ ইঙ্কা-স্থাপত্য-কলা ও

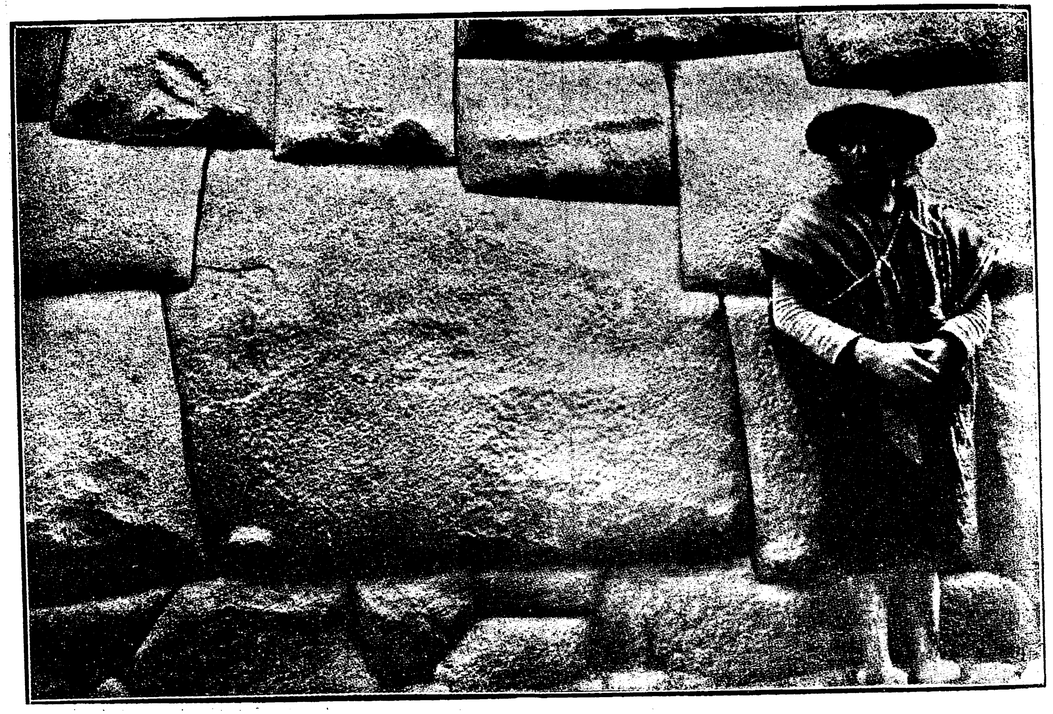

বারো কোণা পাথর (এই প্রাচীর গাঁথবার সময় প্রাক্-ইঙ্কা স্থপতিরা যে কোনো আকারের পাথর নিয়েই অবলীলাক্রমে গেঁথেছিলেন! এর মাঝখানে একখানি বৃহৎ পাথর তাঁরা গেঁথেছেন যার দ্বাদশটি কোণ তাঁদের মেলাতে হ'য়েছিল)

অতীত সভ্যতার নিদর্শন মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এটি ছিল ইঙ্কাদের মানমন্দির। এই সুদৃশ্য সুন্দর ও সুগঠিত সুগোল মানমন্দিরের চারিদিকে ছিল এক স্তম্ভ মণ্ডল। রৌদ্রপাতে প্রতিফলিত এই স্তম্ভরাজির ছায়ার পরিমাপ দর্শনে ইঙ্কারা সময়ের অঙ্ক নির্ণয় ক'রতে পারতো, সূর্য্যের গতিবিধি অবগত হ'ত এবং বর্ষ পঞ্জিকার কাল অনুমান ক'রতো। এই মানমন্দিরের নাম ছিল "ইন্তিহোতানা"!

ইঙ্কা স্থাপত্য কলার আর একটা বিশেষত্ব হচ্ছে তাদের শিল্পীরা নিজেদের সৃষ্টিকে শাশ্বত ক'রে তোলবার উদ্দেশ্যে বড় বড় পাথর জুড়ে বিপুলাকার গৃহ নির্ম্মাণ ক'রলেও তাঁর মধ্যে সৌন্দর্য্য ও বৈচিত্র্য আনবারও চেষ্টা করতেন। বড় বড় পাথরের দেওয়ালের গায়ে তাঁরা দীর্ঘ কোলঙ্গা রেখে যেতেন। কোলঙ্গাগুলির আকারেও বৈচিত্র্য থাকতো। সেগুলির মূলদেশ প্রসারিত কিন্তু শীর্ষদের সঙ্কীর্ণ। এই ধরণের কোলঙ্গাকে একেবারে ইঙ্কা স্থাপত্যের বিশিষ্ট পরিচয়-জ্ঞাপক বলা চলে! ইঙ্কারা দ্বারদেশ নির্ম্মাণ করতেন মিশরীয় স্থাপত্যের অনুরূপ। কোথায় মিশর এবং কোথায় দক্ষিণ আমেরিকা! সুদূরস্থিত এই উভয় প্রদেশের স্থাপত্য-কলার সাদৃশ্য কিন্তু বিস্ময়কর!

ইঙ্কাদের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের স্থাপত্যকলা আরও অপূর্ব্ব। পর্ব্বতপ্রায় পাথর নিয়ে এমন অবলীলাক্রমে খেলা ক'রতে একমাত্র ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীর আর কোনো প্রদেশের মানুষকে বড় একটা দেখা যায় না! খৃঃ পূর্ব্ব প্রথম বা দ্বিতীয় শতকে এখানকার স্থপতিরা যে কোনো আকারের এবং যে কোনো মাপের পাথর নিয়ে এমন সুকৌশলে জোড়া লাগিয়ে বিশাল আয়তনের সব প্রাচীর গেঁথে গিয়েছেন যে আজও তা' বিশ্বের বিস্ময় হয়ে রয়েছে। পাথরগুলিকে জোড়া লাগাবার জন্য মশলার অভাবে তাঁদের প্রত্যেক পাথরখানিকে কেটে অপর পাথরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে আঁটতে হয়েছে। এই ভাবে পাথর কেটে প্রাচীর গাঁথা যে কত শ্রমসাধ্য ব্যাপার তা' সহজেই অনুমান করা যায়। বিশেষ, যেখানে প্রত্যেক পাথরখানির আকার ও পরিমাপ পরস্পর বিভিন্ন। এক্ষেত্রে তাঁদের প্রত্যেক পাথরখানিকে গাঁথবার সময় পরের পাথরখানির আকার ও পরিমাপ অনুসারে রকমারি ক'রে কেটে নিতে হয়েছিল। কিন্তু, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে—এমন কঠিন কাজও তাঁরা অনায়াসে সুসম্পন্ন ক'রে গেছেন মাইলের পর মাইল জুড়ে! আর, হাজার হাজার বছর পরেও কত ভূমিকম্প ঝঞ্ঝাবাত ও শত্রুর আক্রমণ সহ্য ক'রেও সে প্রাচীর আজ পর্য্যন্ত অক্ষত অটুট দাঁড়িয়ে আছে।

খিলান নির্ম্মাণ ক'রতে না জানায় সে যুগের শক্তিশালী স্থপতিদের অনেক অসুবিধাই ভোগ করতে হ'য়েছিল।

সোপানশ্রেণী ('কলসাশয়' প্রাসাদে পৌছবার এই প্রশস্ত পাষাণ-সোপান ইঙ্কা স্থাপত্যকলার বিস্ময়কর পরিচয় মেলে ধরেছে। এক একখানি বৃহৎ পাথর কুঁদে জোড়া জোড়া ধাপ তৈরী হয়েছিল। সিঁড়ির দুধারে ছিল দুটি চতুষ্কোণ বিরাট স্তম্ভ)

বিশেষ, যেখানে দ্বিতল প্রাসাদ নির্ম্মাণ ক'রতে হ'য়েছে সেখানে তাঁরা স্বাধীনভাবে কাজ করবার সুযোগ পাননি! দ্বিতল গৃহের জন্য নীচের তলটিকে তাঁদের অতিরিক্ত মজবুদ ক'রে নির্ম্মাণ ক'রতে হ'য়েছে, এবং গৃহের ভারকেন্দ্র ঠিক রাখবার জন্য নীচের তল অপেক্ষা উপরতলের অংশ

অনেক পরিমাণে ছোট ক'রে গড়তে হ'য়েছে। কাজেই প্রত্যেক দ্বিতল বাটীর উপরতলে একটি ক'রে প্রশস্ত বারান্দা চারিদিক বেষ্টন করে আছে। এই ধরণের একাধিক দ্বিতল বাটী বলিভিয়ার টিটিকাকা হ্রদের মধ্যস্থ দ্বীপের উপর ছিল দেখা গেছে। এগুলি সূর্য্য দেবতার মন্দিরের অন্তর্ভুক্ত। এখানে মন্দির ও তৎসংলগ্ন পূজারী প্রভৃতির বাসগৃহ, ব্রহ্মচারিণীদের আশ্রম ও সন্ন্যাসীদের মঠ ছিল। দূর দূরান্তর হ'তে তীর্থ যাত্রীরা এসে এখানে মিলিত হ'তেন। উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নে প্রতি বৎসর

মন্দির ও মন্দির সংলগ্ন বাসগৃহ এবং রাজপ্রাসাদ প্রভৃতি ছাড়া ইঙ্কা সাম্রাজ্যের অধিকার সুরক্ষিত করবার জন্য প্রত্যেক শত্রু সমাগম সম্ভাবনার পথে সমস্ত প্রদেশ জুড়ে অসংখ্য দুর্গ নির্ম্মিত হয়েছিল। এ দুর্গগুলির অধিকাংশই আবার ইঙ্কাদের পরবর্ত্তীগণের নির্ম্মিত দুর্গের ধ্বংসাবশেষের উপর পুনর্গঠিত হ'য়েছিল। এই প্রাক্ ইঙ্কা স্থাপত্য সম্বন্ধে স্পেনের বিশেষজ্ঞেরা বলেন যে সে যুগের স্থপতিগণ এমন কোনো রাসায়নিক দ্রাবকের সন্ধান অবগত ছিলেন যার সাহায্যে তাঁরা বড় বড় পাথরের অংশ বিশেষ সিক্ত করে তার

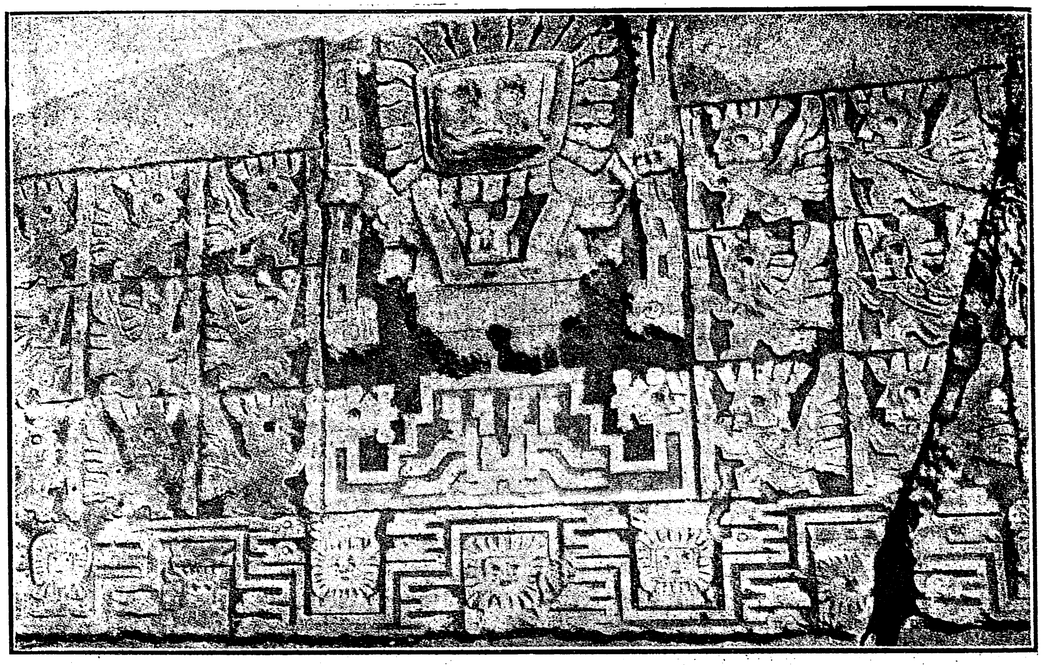

দ্বার-চিত্র (বিরাট তোরণ দ্বার শীর্ষে যে উদ্গত শিলাচিত্র তার মধ্যস্থলে পর্জ্জন্য দেব বা ইন্দ্রের মূর্ত্তি। ইনি বজ্র বিদ্যুৎ ও বৃষ্টি ধারার অধিপতি। তাঁকে বেষ্টন ক'রে চতুর্দ্দিকে অসংখ্য দেববৃন্দ নৃত্য করছে তাঁর সম্মানের জন্য। পদতলে দ্বাদশ চন্দ্র সূর্য্য বিরাজ করছে। এই শিলা চিত্র দেখে অনুমান হয় এ ছিল কোনো দেবমন্দিরের তোরণ দ্বার)

এখানে অরুণোৎসব ও আদিত্য-মেলার অনুষ্ঠান হ'ত। এখানকার বাড়ীগুলির সবই প্রায় ভগ্নাবস্থা! কেবল একটি-মাত্র গৃহ এখনও অক্ষত আছে। এটি মহাবলশালী দেবতা 'বীর কোষে'র মন্দির। ইঙ্কারা দিগ্বিজয় সম্পূর্ণ করে সাম্রাজ্য স্থাপন করবার দিন এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিল। দেব

কাঠিন্যকে কর্দ্দমের মত নরম ক'রে নিতে পারতেন এবং পরে ইচ্ছামত ও প্রয়োজন অনুসারে সে অংশটুকু অনায়াসে কেটে ফেলতেন। এ ছাড়া এত বড় বড় বিরাট পাথরের প্রত্যেকটি কেটে কেটে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত করে এমন বিশাল প্রাচীর গেঁথে তোলা মানুষের পক্ষে সম্ভবপর হ'তে পারে না!

পাহাড়ের বুকে পাথরপুর (শাকসাহোমান পর্ব্বতের কোলে পাথরে গড়া এই বিরাট নগরই ছিল ইঙ্কাদের প্রথম আবাসভূমি।)

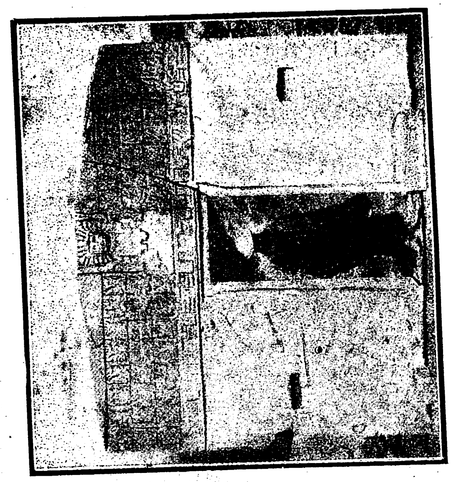

তোরণ দ্বার (বলিভিয়ার 'তায়াহোনাকো' নগরে পাওয়া গেছে এই পাষাণ তোরণ দ্বার। একখানি বিরাট পাথর কেটে এই তোরণ দ্বার নির্ম্মিত হয়েছিল। পুরাতত্ত্ববিদেরা বলেন এটি পশ্চিম জগতের প্রাচীনতম স্থাপত্যকলার একমাত্র নিদর্শন। দ্বার শীর্ষে যে উদ্গত শিলা চিত্রের পরিচয় রয়েছে তা' প্রাক্-ইঙ্কা যুগের বলেই তাঁরা স্থির করেছেন।)

ইঙ্কা সাম্রাজ্যের বর্ত্তমান রূপান্তর

প্রাক্-ইঙ্কা স্থাপত্যের বিরাট পরিচয় সাক্‌শাহোমান পর্ব্বতের উপর যেমনটি দেখ্‌তে পাওয়া যায় তেমন আর কোথাও নেই। এখানে যে দুর্গ ছিল তা' ধ্বংস হ'য়ে গিয়েছে কিন্তু তার ত্রিবলী প্রাকার এখনো নির্ম্মূল হয়নি। এই তিন থাক বিশাল প্রাকার বিপুলায়তনের অসংখ্য প্রস্তর খণ্ড জুড়ে তৈরী হয়েছিল। তা' থেকে যে যা পেরেছে খুলে নিয়ে গিয়ে বর্ত্তমান শহরের অধিবাসীরা নিজেদের গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্যে ব্যবহার করেছে। তবু এখনো যা' অবশিষ্ট আছে তা প্রচুর। লুণ্ঠনকারীদের সকল প্রয়াস ব্যর্থ করে তারা সেই পুরাতন দুর্গ প্রাকার আঁকড়ে পড়ে আছে। তার কারণ আর কিছুই নয়, বর্ত্তমান যুগের ক্ষীণবীর্য্য মানুষের পক্ষে সেই সব বিরাট প্রস্তর খণ্ড বহন ক'রে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। অথচ একদিন অতীত যুগের মহাশক্তিমান মানুষেরা সেই পাথরগুলিই অনায়াসে নাড়া-চাড়া ক'রে বৃহৎ প্রাচীর নির্ম্মাণ ক'রে গেছেন।

সমস্ত পাহাড়ের চারিদিকে প্রাক্-ইঙ্কা শিল্পীদের বিবিধ নৈপুণ্যের পরিচয় ছড়ানো রয়েছে। কোথাও পাহাড়ের বুক চিরে সোপান শ্রেণী নির্ম্মাণ করা হয়েছে। কোথাও পাহাড়ের চূড়া কেটে কেটে সিংহাসন তৈরী করা হয়েছে। কোথাও জল নিকাশের জন্য সুদীর্ঘ পয়ঃপ্রণালী কাটা রয়েছে। পর্ব্বতমূলে বহু সমাধি-মন্দির দেখতে পাওয়া গেছে। পেরুর চতুর্দ্দিকে প্রাক্-ইঙ্কা স্থাপত্য চোখে পড়ে। এসব দেখে মনে হয় ইঙ্কারা এ দেশ জয় ক'রে তাদের পূর্ব্ববর্ত্তী বিজয়ীগণের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রেই চলেছিল।

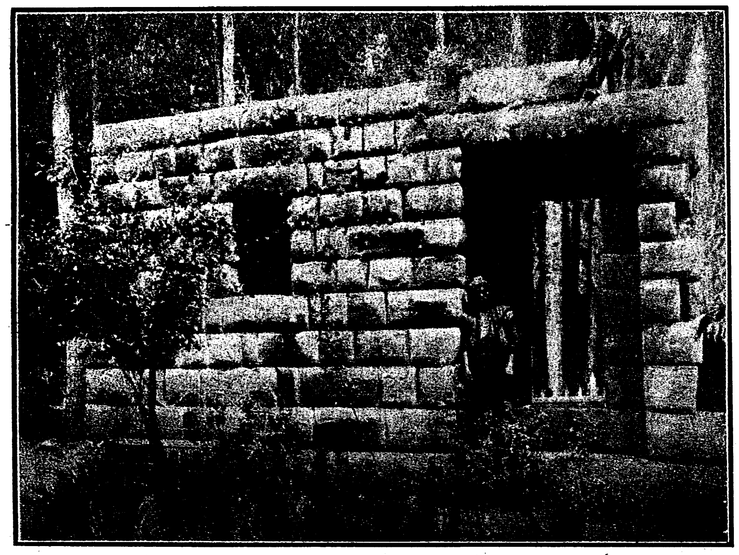

প্রাসাদ-দ্বার ও বাতায়ন (ইঙ্কা রাজপ্রাসাদ গুলি সবই ছিল 'পাষাণ পুরী'। কিন্তু, পরবর্ত্তীকালে বিজয়ী বিজাতি স্পেনের প্রয়োজনে রাজপ্রাসাদ ভেঙ্গে সেই পাথরে অফিস গুদাম ও সেনানিবাস তৈরী হয়েছে, পরে সাধারণ অধিবাসীরাও সেখানকার পাথর খুলে এনে নিজেদের কাজে লাগিয়েছে। কাজেই ইঙ্কা রাজপ্রাসাদগুলির অস্তিত্ব এখন বিরল হয়ে পড়েছে। 'কলকাঞ্চায়' এই একটিমাত্র প্রাসাদের কিয়দংশ পাওয়া গেছে। এর দ্বার ও বাতায়ন কিন্তু মিশরীয় ধরণের নয়)

পেরু ও বলিভিয়ার মত পার্ব্বত্য দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের উপযোগী বড় বড় পাথরের বাসগৃহ নির্ম্মাণ ক'রে প্রাচীন পেরুভিয়ান স্থপতিরা তাদের স্থাপ্যত্য শিল্প নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন ক'রে গেছেন। পর্ব্বতের ক্রোড়দেশ হ'তে চূড়াগ্র পর্য্যন্ত থাকে থাকে পাষাণ-গৃহ-শ্রেণী নির্ম্মিত হয়েছিল। তাতে যে সকল বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড ব্যবহার করা হয়েছিল তার মধ্যে এক একখানি দৈর্ঘ্যে ১৩ ফুট প্রস্থে ৭ ফুট এবং পাঁচ ফুট পর্য্যন্ত পুরু! গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্যে এরূপ বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডের ব্যবহার পেরুতেও যেমন আবার বলিভিয়াতেও তদ্রূপ! বলিভিয়াতেও সাগরের সমতল ক্ষেত্র হ'তে প্রায় ১৩০০০ ফুট উচ্চ এক পর্ব্বত আছে। এই দুরারোহ পর্ব্বতের উপর তায়াহুয়েনেকো নামে শহর গড়ে উঠেছিল। পুরাতত্ত্ব-বিদেরা অনুমান করেন, তায়াহুয়েনেকোবাসীরাও দিগ্বিজয়ে প্রলুব্ধ হ'য়েছিল। আশে পাশের অনেকে দেশই জয় ক'রে তাদের

সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার অভিলাষ জেগে উঠেছিল মনে। কিন্তু, সমুদ্রতীরবাসীরা তাতে প্রতিবন্ধক হওয়ায়—সে আশা আর পূর্ণ হয়নি। এই সাগর কূলের অধিবাসীরাও স্থাপত্য শিল্পে তাদের অসাধারণ শক্তির পরিচয় রেখে গেছে। পাথর তারা পায়নি বটে, কিন্তু, মাটির ইট তৈরি ক'রে তারা এমন চমৎকার ঘরবাড়ী ও শহর নির্ম্মাণ ক'রে গেছে যার তুলনা হয় না! পচকামক শহর এর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এখানে সে যুগের প্রধান দেবতা পচকামক—যিনি স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা ও জগদীশ্বর—তাঁর বিরাট মন্দির ছিল। দেবতার নামেই নগরের নামকরণ হয়েছিল পচকামক। পচকামক ছিল সেদিন

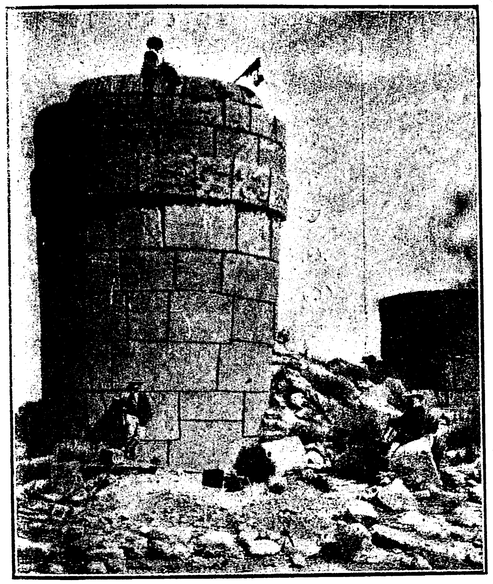

সমাধি-মন্দির (বলিভিয়া ও পেরুর চতুর্দ্দিকে ইঙ্কাদের এই গোলাকার সমাধি-মন্দির বা মঠ ছিল। মৃত আত্মীয় বন্ধুর শব স্থাপনের জন্য ইঙ্কারা এই অপূর্ব্ব সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করতেন)

দক্ষিণ আমেরিকাবাসীদের এক মহাতীর্থ! ইঙ্কারা এ নগর অধিকার করে এখানে এক সূর্য্যমন্দির প্রতিষ্ঠা করবার প্রয়াস পেয়েছিল, কারণ সূর্য্যই ছিলেন ইঙ্কাদের প্রধান ইষ্টদেবতা! কিন্তু, পচকামকের প্রভাব এখানে এত বেশী যে সূর্য্যমন্দিরের আর স্থান হ'ল না। ইষ্টক নির্ম্মিত

অমর দেব (প্রাক্-ইঙ্কা যুগের এই দেবমূর্ত্তির চোখে মুখে বেশ একটা দেবভাব ফুটে উঠেছে। প্রাচীনতম ভাস্কর্য্যের মধ্যে এমন ভাবপ্রকাশ অতি অল্পই আছে)

পিরামিড আকারের উচ্চ বেদীর উপর ছিল এই পচকামক দেবতার মন্দির। সমুদ্রতীরবাসীদের মন্দির-স্থাপত্যের বিশেষত্বই হ'চ্ছে এই পিরামিডের মত উচ্চ বেদীর উপর দেবতার মন্দির স্থাপনা করা। এঁরা তাঁদের গৃহ ও দেব-মন্দিরের প্রাচীর-গাত্রে নানা উদ্গত-চিত্র উৎকীর্ণ ক'রে গৃহশোভা বর্দ্ধন ক'রতেন। ধ্বংসাবশেষ কাঞ্চন নগরের আবর্জ্জনার ভিতর হ'তে যে সব মৃৎ-শিল্পের নমুনা পাওয়া গেছে তা শুধু সুন্দর নয়, অতি সুগঠিতও বটে! ইঙ্কারা

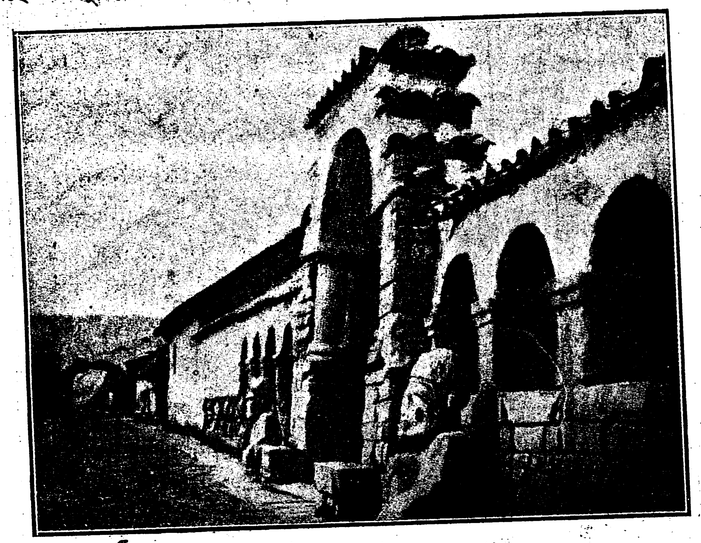

লুণ্ঠনের পরে (ইঙ্কার দেবমন্দির ভেঙে স্পেন তার গীর্জ্জা নির্ম্মাণ করেছে। গীর্জ্জার প্রবেশ দ্বারে দ্বারপাল রূপে তারা সাজিয়ে রেখেছে ইঙ্কার দুই দেব বিগ্রহ)

এদের কাছে মৃৎশিল্প শিক্ষা ক'রে সাগর-কূলে ইটের সাহায্যেই গৃহ নির্ম্মাণ করেছিল, কিন্তু, স্থাপত্য ভঙ্গীতে নিজেদের বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ বজায় রেখেছিল! সেই পাথরের কেল্লার মত বড় বড় বাড়ী—কঠিন ও সুদৃঢ় আকৃতি! কোথাও কারুকার্য্যের বাহুল্য নেই! বড় বড় দেওয়ালের নিরেট একঘেয়েমী বন্ধ করবার জন্য সারি সারি সেই বৃহৎ কোলঙ্গা রাখা—সবই ইটের বাড়ীতেও বজায় রেখেছিল।

পাহাড়ের গায়ে ঢালু শহর গড়ে তোলায় পেরুভিয়ানরা যে কৌশল ও নৈপুণ্য দেখিয়েছে তা যথার্থই বিস্ময়কর! পাহাড়ের গড়ানে পিঠের উপর থাকে থাকে গৃহ নির্ম্মাণ করেছিল তারা একেবারে পাহাড়ের চূড়া পর্য্যন্ত। সামনের নীচু থাকের বাড়ীগুলি থেকে পিছনের উঁচু থাকের বাড়ীতে পৌঁছবার জন্য সামনের লাইনের বাড়ীগুলির ছাদের উপর দিয়ে সিঁড়ি করেছিলেন তাঁরা পিছনের লাইনের দ্বারদেশ পর্য্যন্ত। এমনি ক'রে সারা পাহাড় ঘিরে তাঁরা শহর তৈরী ক'রে এসেছিলেন। তার জল নিকাশের ব্যবস্থা, পানীয় জলের প্রণালী প্রভৃতি দেখে মনে হয় সেই সুদূর অতীতে এই পেরুভিয়ানরা স্থাপত্য বিজ্ঞানে যেরূপ অভিজ্ঞ ছিলেন আজকের উচ্চ শিক্ষিত ও সভ্যতা দৃপ্ত আমেরিকান ইঞ্জিনিয়ার রা এখনো সেখানে পৌঁছতে পারে নি! এই প্রাচীন পার্ব্বত্য শহরের গঠন সংস্থান হ'তে এ তথ্যটুকুও অনায়াসে বোঝা যায় যে সেকালে পেরুভিয়ানদের মধ্যে একটা বেশ উদার ও অন্তরঙ্গ সমাজ বন্ধন ছিল। তাঁরা যে পরস্পরের সঙ্গে একান্ত সদ্ভাব ও সৌহার্দ্দ্যে আবদ্ধ হ'য়ে বসবাস ক'রতেন, সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। তাঁরা চাষবাস ক'রে খেতেন। কঠিন পরিশ্রম ক'রে পাহাড়ের বুকে শস্য ফলাতেন! এই পাথুরে ক্ষেতে ফসল ফলাবার জন্য তাঁরা যে জল ধরে রাখবার বাঁধ নির্ম্মাণ ক'রেছিলেন প্রাচীন পেরুর স্থাপত্য কলার সে এক বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য! সেই বাঁধ থেকে আবার অসংখ্য সরু সরু খাল কেটে বহু দূর দুরান্তরের ক্ষেতেও জল সরবরাহের যে ব্যবস্থা তাঁরা করেছিলেন সে আরও চমৎকার! ইঙ্কার স্থাপত্য শিল্পীরা এঁদের কাছে অনেক কিছু শিখে-ছিলেন।

"বিলেত দেশটা মাটীর—"

শ্রীজ্যোতির্ম্মালা দেবী বি-এ

ঘরের এক পাশে জন দুই ছেলে বিলিয়ার্ড খেলছে, অন্য পাশে আর দু'জন খেলছে পিঙ্‌পঙ্‌। সুধীর বোস আর চারু দত্ত সিগারেট মুখে, ট্রাউজারের দু'পকেটে দু'হাত ঢুকিয়ে দিয়ে কায়দা ক'রে জান্‌লায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে কখনো বা খেলা দেখ ছে, কখনো বা জানালার কাচের ভিতর দিয়ে বাইরের সূর্য্যালোকিত রাস্তার দিকে চেয়ে চেয়ে কি-সব বল্‌ছে। মাঝে মাঝে দু'একটা মন্তব্য যা কর্‌ছে তা শুধু ওদের মধ্যেই চল্‌তে পারে। মহিলা দূরের কথা, তৃতীয় কোন পুরুষ বন্ধুও সেসব শুন্‌লে একটু লাল না হ'য়ে, অন্ততঃ তার কাণের পাশটা একটু গরম না হ'য়ে, থাকতে পার্‌ত না—এ আমি হলফ্‌ ক'রে বল্‌তে পারি। কিন্তু সুধীর আর চারুর দোষ কি? দু'টি ঘনিষ্ঠ বন্ধু একত্র হ'লে —বিশেষতঃ এমন সুন্দর আলোকোদ্ভাসিত দিনে,—রাস্তায়-ঘাটে যখন রং-বেরঙের ফুলের ছড়াছড়ি, মাথার উপরে নীল আকাশ সুন্দরীর চোখের মত স্নিগ্ধ কমনীয়, সহরের মাঠে মাঠে, পাহাড়ে, দোকানে—যেখানেই যাও সুরূপা সুবেশার মনোরম কটাক্ষ, যার হাত থেকে কোথাও গিয়ে উদ্ধার পাবার উপায় নেই—তেমন দিনে, এত হাসি, গান, রূপের, রঙের সমাবেশের মধ্যে—মনটা হাল্‌কা না হ'য়ে থাকতে পারে কখনো,—একটি দু'টি হাল্‌কা কথা না বলে থাক্‌তে কি পারে কেউ? বিশেষতঃ যাদের কোনো ভাবনা-চিন্তা নেই, খাওয়া-দাওয়ার হাঙ্গাম নেই, বাড়ী থেকে যাদের দিব্যি মাসের পর মাস গুণ্‌তি টাকা এসে হাজির হয়—তা হোক্‌ না সে টাকা বাপের, বড়-ভাইয়ের—এবং শ্বশুরের হ'লে তো কথাই নেই—বুকের রক্ত জল-করা ধন! এমন নিশ্চিন্ত মুক্ত দায়িত্বশূন্য নরম স্কন্ধ নিয়ে চারু আর সুধীর যে মিনিটে মিনিটে রাস্তার দিকে তাকিয়ে মেরী, ডলি, লিলি আর রেবেকার দলকে দেখে একটু-আধটু আমোদ কর্‌বে এবং তা-ও নিছক কথায় মাত্র—সত্যিই তো কেউ আর রাস্তায় নেমে গিয়ে "প্রেয়সী, এস" ব'লে ওদের বাহু আগিয়ে দিচ্ছে না—শুদ্ধ কথায়, নিরামিষ কথায় যে একটু আমোদ কর্‌বে, তাতে এত আশ্চর্য্য হ'বার আছে কি? এই ছুটিতে, ভাগ্যবান যারা, তারা তো বেরিয়েই গিয়েছে—কেউ দিয়েছে কন্টিনেণ্টে পাড়ি; কেউ আইল্‌ অব্‌ ওয়াইটে, কেউ বা বেশি দূর না পারুক, অন্ততঃ লণ্ডনে। যে হতভাগ্যের দল পরীক্ষা অথবা বাইরে যাবার যথেষ্ট টাকার অভাব ইত্যাদি কোন-না-কোন অনিবার্য্য কারণে বাধ্য হ'য়ে এই সুন্দর গ্রীষ্মটাকে মাঠে মারা যেতে দিচ্ছে, তারা এটুকুও যদি কর্‌তে না পারে, তবে এত বড় রাত ও দিন কাটে কি করে এই উত্তুরে দেশে যেখানে পারীর মত না আছে সত্যিকার 'ফ্রিডম্‌', না লণ্ডনের জাঁকজমক! এ রকম নীরস জায়গায় পড়্‌তে আসাই ঝক্‌মারী।—সুধীর হাতের সিগারেটটায় আর একটা লম্বা টান দিয়ে আর একবার বাইরের দিকটায় মুখ ফিরিয়েই—"হ্যালো, এ যে সন্দীপ! আরে, আই সে—(I say)—সন্দীপ! সন্দীপ!" ব'লে জানালায় দু'বার টোকা দিয়ে পথচারী বন্ধুর মনোযোগ আকর্ষণ ক'রে তাড়াতাড়ি জানালার কাচটা তুলে ধর্‌লে এবং ঘাড়টা বের ক'রে দেখে আশ্বস্ত হ'ল যে সন্দীপ এখানেই আস্‌ছে।

—"তার পর, কি মনে করে? হঠাৎ যে পথ ভুল হ'ল? যা ঘাড় গুঁজে পড়ছ তুমি, ভাবিনি যে একটু আলো থাক্‌তেও বই ছেড়ে উঠ্‌বে। ভাগ্যিস্‌ ডাক্তার রাত্তিরে পড়াটা বারণ করেছে—নইলে একটা কাণ্ডই ক'রে বস্‌তে তুমি। তার পর, খবর কি বলো?"

—"আর ভাই, কেন মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা মারো? তিন তিনটে সাব্‌জেক্ট বাকি পড়ে আছে জানই তো। এবার পাশ কর্‌তে না পার্‌লে আর কোন্‌ ভরসায় টাকা চাইব দাদার কাছে? তোমাদের মত তো নয়—কত কষ্ট ক'রে এসেছি এ দেশে,—তাও একটা বছর মাটি হ'ল অসুখে প'ড়ে। গরীবের সবই উল্টো—"

চারু সুধীরকে টিপে দিলে।

—"যাক্‌ গে সে সব কথা। এখন হঠাৎ এলে যে এসোসিয়েশানে?"

—"এলুম এখানে তোমাদের দেখা পাব জানি ব'লে—"

—"কেন রে, আমরা হঠাৎ কবে এমন ডুমুর-ফুল হ'য়ে উঠ্‌লুম তোর কাছে? ব্যাপার কি?" বল্‌তে বল্‌তে শ্যাম-বর্ণ দীর্ঘদেহ একটি ছেলে এক কোণের টেবিল থেকে উঠে এল। সে এতক্ষণ এদের কথাবার্ত্তা মন দিয়ে শুন্‌ছিল।

—"এই যে রাজেন, তুমিও আছ। ভালই হ'ল সবাইকে একসাথে পাওয়া গেছে। ভাই, দেখ দিকি, সুকুমার আমাকে কি বিপদে ফেলেছে—বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ এক পোষ্টকার্ড—ওর বোন আস্‌ছে, ঘর ঠিক কর্‌তে হ'বে এবং তা-ও যতটা সম্ভব শীগ্‌গির—অর্থাৎ আজই।"

—"হুঁ, সুকুমারটা চিরদিনই ও-রকম—"

—"দেখি কি লিখেছে"—চারু পোষ্টকার্ডটা হাত থেকে টেনে নিল।—"ও বাবা, বোন নয়, একেবারে 'ভগ্নী-মহোদয়া আস্‌ছেন'—"

রাজেন থামিয়ে দিল—"যা, যা, সুকুর লেখার ধরণই ও-ই। ফাজ্‌লামো ছেড়ে দিয়ে এখন বরং চল্ রুম দেখ্‌তে বেরিয়ে পড়া যাক। কাল সকালেই তো এসে পড়্‌বে দু'জনে। সুকুর ঘর তো ঠিক আছেই তোর ওখানে, না রে সন্দীপ?"

সন্দীপ মাথা নেড়ে জানালে—"হ্যাঁ।"

—"তবে আর কি, আর একটা ঘর কি পাওয়া যাবে না এই এত বড় এডিনবরা সহরে?"

—"ঘর পাওয়া যাবে না কেন? একটার জায়গায় চারটে দেখিয়ে দিতে পারি। কিন্তু এ তো তোমার আমার জন্যে নয় হে, এ যে লেডি নিয়ে ব্যাপার—"

—"এই সিজ্‌ন্-এ লণ্ডনের মত সহর ছেড়ে হঠাৎ এই পাড়াগাঁয় কেন আসা বাপু? কি হে সন্দীপ, সুকুমার লিখেছে না কি কিছু?" সুধীর জিজ্ঞেসা কর্‌লে।

সন্দীপ বল্‌লে—"না, সুকুমার রহস্য ভালোবাসে, জান না? নিজে এখান থেকে গিয়েছে মাত্র দিন-পনের, এরই মধ্যে ফিরে আস্‌ছে—সঙ্গে আবার বোনকে নিয়ে—কেন, কি বৃত্তান্ত কিছুই লেখেনি।"

—"এলেই জানা যাবে রে, এখন চল্ একটু পা চালিয়ে, ঘর একখানা ঠিক ক'রে এসে যত পারিস্ জল্পনা কল্পনা করিস্ সুকুর বোনকে নিয়ে।"

সকলে হেসে উঠ্‌ল।

(২)

অনেক খুঁজে-পেতে বাড়ী পাওয়া গেছে—মার্চ্চমণ্ট রোডে। ঘরটা বেশ ভালই, রাস্তার উপরে, কাচ-দেওয়া বড় বড় জানালা, আস্‌বাব-পত্র মন্দ নয়। ফ্ল্যাটখানি দোতলায়। সন্দীপ খুসি হ'য়ে বল্‌ল—"সুকুমার বল্‌তে পার্‌বে না যে এডিনবরায় ওর 'ভগ্নী মহোদয়ার' অভ্যর্থনা যথোপযুক্ত হয়নি এবং তাও এত শর্ট্ নোটিশে।"

—"নাঃ—ঘর মন্দ হয়নি। এখন বুড়ী বাড়ীওয়ালী—"

—"ধ্যেৎ, বুড়ী নয়রে, মাত্র একটি খুকীর মা এবং খুকীটি এই"—একটি বছর-সাতেকের লাল-ফ্রক পরা মেয়েকে দেখিয়ে চারু বল্‌লে।

—"ও একই কথা, বাড়ীওয়ালী হ'লেই বুড়ী—ওটা আমাদের আদরের ডাক—"

—"তাই না কি? তবে যে বড়—"

—"চারু, রাখ্‌বি তোদের ফাজ্‌লামি খানিকক্ষণ? কাজের কথা হোক—ডাক্ বুড়ীকে। ওগো—ও খুকী, কি নাম তোমার?—এ্যালিস? বা, দিব্যি মিষ্টি নামটি তো।—এ্যালিস্, লক্ষ্মী মেয়ে, যাও তোমার মাকে ডেকে নিয়ে এস তো আর একবার।—কোথায় গেলেন তিনি ঘরটা দেখিয়ে দিয়েই।—সন্দীপ, বুড়ী সব টায়্‌ম্‌স্-এ রাজি না হ'লে আবার ঘুর্‌তে হ'বে অন্য রাস্তায়। কাগজ-খানা দে দেখি, এখানেই কাছে আর বাড়ী আছে কি না দেখা যাক্!"

সুধীর বল্‌লে, "জানিস্ চারু, ওটা হ'চ্ছে কায়দা—কাগজখানা হাতে নিয়ে বাড়ীওয়ালীকে দেখানো যে তোমার এখানে না হ'লেও কুছ্ পরোয়া নেই, আমরা মাঠে মারা যাবো না। দেখ্ আর শেখ্, তুই তো একটা হাবা, ল্যাণ্ড্‌লেডি যখন যে দর হাঁকে দিয়ে দিস্ কথাটি না ব'লে। এত বছর রইলি, 'ফক্সট্রট্', 'জাজ্' কিছুই শিখ্‌তে বাকি রাখ্‌লি না—কেবল কারবারী-চালটুকু এদের এখনও নিতে পার্‌লি না?"

রাজেন হেসে বল্‌লে—"নেবে কি করে? মিসেস্ ব্রাউনের কাছে ও' যা আরামে আছে। পাছে তাড়িয়ে দেয় ব'লে ভয়েই মরে। লুইসা ব্রাউনকে কি তাহ'লে—"

—"যাও, যাও—বাজে কথা বলো না। মিসেস্ ব্রাউনরা

ভদ্দরলোক, তা জান? ওঁর স্বামী সলিসিটর ছিলেন। নেহাত অসময়ে মারা গিয়েই না বেচারী মিসেস্‌কে এই বিপদে ফেলে গেছেন?—ও-বাড়ী ছাড়্‌তে ভয় পাই তেমন ভাল লোকের বাড়ী আর পাব না ব'লে। তোদের মতন মাসের মধ্যে বারচারেক ল্যাণ্ড্‌লেডি বদ্‌লাতে পারি না—জানিস্, a rolling stone gathers no moss, তাই তো তোদের কপালে—"

—"লুইসের মতন বন্ধুনী জোটে না, না রে চারু?"

—"সুধীরটা এক নম্বর—অঃ, এই যে মিসেস্—ইয়ে—"

—"ম্যাক্‌ফার্‌লেন, স্যার, মিসেস্ ডি, ম্যাক্‌ফারলেন। তা, ঘর পছন্দ হ'য়েছে তো আপনাদের? যদি বলেন আরো কিছু ফার্ণিচার—"

রাজেন ঘরের গাঁদা গাঁদা প্রাচীন আমলের চেয়ার, টেবিল, সোফার দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভয় পেয়ে বল্‌লে—"না, না, এই বেশ আছে মিসেস্ ম্যাক্‌ফারলেন, এই বেশ দেখাচ্ছে। ঘরটি আপনার চমৎকার—"

মিসেস ডি, ম্যাক্‌ফার্‌লেন দুই হাত দুই কোমরে রেখে বুট-পরা পা-দুখানি আর একটু শক্ত ক'রে ভূমিতে চেপে বসিয়ে ঘাড়টি পেছন দিকে ফেলে গর্ব্বিত সুরে বল্‌লে—"এই ব'লে দিলুম আপনাদের এবং মনে রাখ্‌বেন—ডি, ম্যাক্‌ফারলেন কখনো মিথ্যে কথা বলে না—এমন বাড়ী, এ রকম রুম কোথাও আর একখানা পাবেন না, তা সে যতই খুঁজে বেড়ান না কেন। মশায়, কাগজে বিজ্ঞাপনে অমন সবাই নিজেরটা ভাল বলে। ওসব বিশ্বাস ক'রে ঘুরে ঘুরে বাড়ী দেখ্‌তে যাওয়া মানে মিথ্যে হায়রাণ হওয়া—"

সন্দীপ কষ্টে হাসি চেপে রেখেছে। সুধীর কায়দা ক'রে সাম্‌নে ঝুঁকে অভিবাদন ক'রে বল্‌লে—"নিশ্চয়, নিশ্চয়, একশোবার। তাই তো বলি, কাগজে যখন পড়্‌লুম আপনার বিজ্ঞাপনখানা—"

মিসেস ম্যাক্‌ফারলেন একটু নড়ে-চড়ে বল্‌লে—"কি জানেন, ওরা ও-রকম সাত-পাঁচখানা বানিয়ে লেখে ব'লেই বাধ্য হ'য়ে—মিঃ ম্যাক্‌ফারলেন আমায় বল্‌লেন কি না—বুঝেছেন—"

রাজেন তাড়াতাড়ি বল্‌লে—"তা বই কি, এ তো সহজেই বুঝ্‌তে পারা যায়"—গোপনে সুধীরের প্রতি সরোষ কটাক্ষ ক'রে—"এখন ম্যাডাম যদি অনুগ্রহ ক'রে—ভাড়া-টাড়া কত—আমাদের আবার সন্ধ্যে হ'য়ে গেলে আজে-বাজে বাড়ী দেখে বেড়াতে কষ্ট হ'বে কি না—তাই—"

—"ভাড়া—আর কত? আমি কখনই বিদেশীকে ঠকাই না—এ জন্যে ওই পাশের রাস্তার ম্যাক্‌ডোনাল্ডরা আমায় কত বোকা বলে। বলে, বিদেশীর ওপর আবার অত দরদ কিসের? ওদের এখানে পড়্‌তে আসা তো নয়; আমাদেরই পকেট ভর্ত্তি হওয়া; তা নইলে গবর্ণমেণ্ট ঐ ব্ল্যাকি-গুলোকে দলে দলে এ দেশে আস্‌তে প্রশ্রয় দিত? —আমি বলি, নাঃ—যা দর, যতটা খরচ পড়ে, তার থেকে এক ফার্দ্দিং বেশি আমি নেব না—ওরা আমাদেরই লোক, ভারত তো আর আলাদা একটা রাজ্যি নয়, কি বলেন মশায়? সত্যি বলিনি?"

সন্দীপের মুখখানা ক্রমশঃই লাল হ'য়ে উঠ্‌ছে, এসব ব্যাপারে এদের মধ্যে সবচেয়ে আনাড়ি ও-ই। হাত দিয়ে পাশের টেবিলে রক্ষিত টুপিটা নিতে যায়—রাজেন কোন্ এক ফাঁকে ল্যাণ্ড্‌লেডির চোখ এড়িয়ে আবার ওকে ইসারা করে। মুখে বিনয়ের হাসি টেনে এনে—কারণ গরজ বড় বালাই—মিসেস্ ম্যাক্‌ফারলেনকে বলে—"তা তো বটেই, তা তো বটেই—তা, এখন কত হ'লে—"

"ভেবে দেখুন, মশাই, এই এত বড় ঘর, রোজ তাকে ঝাড়া-মোছা পরিষ্কার করা—একটা চাকরাণীর কর্ম্ম তো নয়, আমাকেই দেখ্‌তে শুন্‌তে হ'বে সব। বড় মেয়ে নেই যে সাহায্য কর্‌বে, তাই বাধ্য হ'য়ে একটা মেড্ রাখতেই হ'বে কিছুক্ষণের জন্যে অন্ততঃ—তার পর ধোপা, ইলেকট্রিক লাইট্—এ রকম সুবিধার বাড়ী আর কোথায় যে—"

সুধীর ততক্ষণে অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছে। যথাসাধ্য বিরক্তি গোপন ক'রে নিম্নস্বরে, যেন দরদস্তুর সংক্রান্ত কথা বল্‌ছে এমনিভাবে বল্‌লে—"গোল্লায় যেতে দাও তোমার বাড়ী আর তার সুবিধাকে। ওহে রাজেন, এতক্ষণে সাতটা বাড়ী দেখা হ'য়ে যেত—"

রাজেন আবার বল্‌লে—"কতর কমে আপনার চল্‌বে না? ঘর আমাদের জন্যে নয়, আমাদের একটি বন্ধু—বন্ধুনীর জন্যে। কাল সকালে আস্‌ছেন তিনি।"

মিসেস্ ম্যাক্‌ফারলেন আকাশ থেকে প'ড়ে বল্‌লে—তাই না কি? তা সেটা বল্‌তে হয় এতক্ষণ। মেয়ে নিয়ে আবার হাঙ্গামা যথেষ্ট—"

রাজেন অবাক হ'য়ে বল্‌লে—"কেন? বরং ওঁরা চুপচাপ থাকেন বেশি—কষ্ট কম হবার কথা—"

ম্যাক্‌ফারলেন ঠোঁট উল্টিয়ে বল্‌লে—"তারি তো জানেন মশায় আপনারা। ছেলে হ'লে প্রায় সারাদিনই তো বাইরে বাইরে থাকে—আমাদের তাতে সুবিধা কত! মেয়েরা যতটা সম্ভব ঘরে থাক্‌বে, সারাদিন এ আস্‌বে ও আস্‌বে, এটা দাও, সেটা দাও। আমাকে তা হ'লে আবার ভাবতে হ'ল মশায়, রেট্ নিয়ে—আমি তো জান্‌তাম না যে মেয়ে আস্‌বে এ-বাড়ীতে—"

সন্দীপ, সুধীর ও চারু হতাশ হ'য়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলে। রাজেন কেসে গলাটা পরিষ্কার ক'রে বল্‌লে—"আমরা তবে আর দু'একখানা বাড়ী দেখি গে, একেবারে সময় নেই কি না—"

—"তা আপনাদের ইচ্ছে হ'লে যেতে পারেন, কিন্তু আমি তো বলিনি যে ভাড়াটে বা অতিথি নেব না। কেবল বল্‌ছি এই যে মেয়ে হ'লে আর একটু বেশি খরচ পড়্‌বে—"

—"খরচের কথা আপনি এখনো কিছুই তো বলেননি—"

—"তা মিষ্টার, খুব টেনেটুনে না হয় আমি তিন গিনিতে খরচ সেরে নেব—আপনারা তো আর আমাদের পর নন—বল্‌বো আমার স্বামীকে বুঝিয়ে—"

—"তিন গিনি? সপ্তায়?—"

—"বেশি বলিনি মশায়, আমি বোকাসোকা মেয়েমানুষ—কাজ কারবার ভালো বুঝি না—ম্যাক্‌ফারলেন বলে যে যেখানে যাই সেখানে রাতদিন ঠ'কে আসি—"

—"ঠ'কে আস, না, ঠকিয়ে আস"—চারু মৃদুস্বরে বাঙলায় বল্‌লে—"গাল টিপ্‌লে দুধ বেরয় এমনি ইনোসেণ্ট! চল্‌রে সন্দীপ, অন্য বাড়ী দেখি গে। শা—"

—"ছি ছি, অভদ্র হোস্‌নে চারু।—না মিসেস্, আমাদের মাপ কর্‌তে হ'বে—অন্ধকার হ'য়ে আস্‌ছে। কিছু মনে কর্‌বেন না, আপনাকে অনেক কষ্ট দিলাম—গুড্-বাই—"

—"গুড্-বাই মিষ্টার" মিসেস্ ম্যাক্‌ফারলেন দোর খুলে দিলে, "আড়াই-গিনি হ'লে যদি পারেন - তবে না হয়- আমার বড্ড কষ্ট হ'বে, মেড্ আর রাখ্‌তে পার্‌ব না, তবে আপনাদের খাতিরে না হয় ওতেই দেখ্‌ব রাজি করতে পারি কি না আমার স্বামীকে—"

—"কিন্তু আমাদের যে অতক্ষণ অপেক্ষা করবার সময় নেই, মিসেস্ ম্যাক্‌ফারলেন। আর আমার বন্ধুনীও ততটাও দিতে রাজি না হ'তে পারেন। তাঁরা হ'লেন লণ্ডনের লোক, সেখানেই থাকেন দু'গিনি আড়াই গিনি দিয়ে এর চাইতে ঢের ভালো পাড়ার ঢের ভালো বাড়ীতে। এডিনবরার সবই তাঁদের চোখে অপেক্ষাকৃত খেলো ঠেক্‌বে কি না। শেষে কি আপনাকে কথা দিয়ে মুস্কিলে পড়্‌ব—তাঁর বাড়ী পছন্দ না হ'লে?"

রাজেন বন্ধুদের নিয়ে সিঁড়ির দু'এক ধাপ নেমে গেল।

—"তা হ'লে কত হ'লে আপনার বন্ধু রাজি হ'তে পারেন, মিষ্টার?"

—"এই ৩০।৩৫ শিলিং, যা রেট্ এখানকার।—তার কম কি আমরা বল্‌তে পারি?"

ওরা আরো খানিকটা নেমে গেল।

—"৩০।৩৫ শিলিং? না, না—ম্যাক্‌ফারলেন তাহ'লে আমায় আস্ত রাখ্‌বে না—"

—"ভারি দুঃখিত, আচ্ছা গুড্-বাই—" ওরা তড়্‌তড়্ ক'রে এবার অনেকখানি নেমে গেল।

—"আমি বলি কি, মিষ্টার"—ল্যাণ্ডলেডি দু'পা এগিয়ে রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়াল।

যেতে যেতে রাজেন বল্‌লে—"কি বল্‌ছেন?"

—"দু' গিনিতে হ'তে পারে, আমার স্বামী—"

—"এখানকার রেট্—"

—"আচ্ছা বেশ, দু' গিনি—সমস্ত খাবার, আলোর খরচ, স্নানের গরম জল—সব নিয়ে।"

রাজেন সুধীরকে বল্‌লে—"কি রে, কি বলিস্?—এর কমে রাজি হ'বে বলে তো মনে হয় না, বাগে পেয়েছে—বুঝ্‌তে পেরেছে আমাদের গরজটা—"

—"এডিনবরায়—একটা সাধারণ রুমের জন্যে দু' গিনি?"

—"কিন্তু সব খাবার দেবে বল্‌ছে—"

—"সব খাবার উনি বাড়ীতে খেলে তো?"

—"কোথায় খাবেন, তা না হ'লে? তোদের মত তো আর ফট্‌ফট্ ক'রে রেস্তোরাঁয় যেতে পার্‌বেন না ভদ্রমহিলা? —আমি বলি কি, এতেই রাজি হওয়া যাক্—এর চাইতে ভালো আর পাওয়া না গেলে মুস্কিল হ'বে শেষটা।"

সন্দীপ বল্‌লে—"কিন্তু বুড়ীটা বড্ড ইয়ে—একেবারে ছিনে-জোঁক—"

—"আরে, ওরা সবাই ও রকম,—ভালমন্দ নেই ওর মধ্যে।—মিসেস্ ম্যাক্‌ফারলেন, কাল আসব তা হ'লে আমরা—"

—"বেশ, রুম তৈরী থাকবে। একটা কথা, মিষ্টার, আপনার বন্ধু বেশ কিছু দিন থাক্‌বেন তো?"

সুধীর চট্ করে ব'লে ফেল্‌লে—"মাস-দুই তো বটেই, বেশীও হ'তে পারে।"

বাইরে এসে সন্দীপ বল্‌লে—"অমন ক'রে বল্‌লি কেন, সুধীর? উনি যদি অতদিন না থাকেন?"

—"বল্‌লাম—তা নইলে বুড়ী আবার আর একটা ফ্যাসাদ বের কর্‌ত, দেখেছে কি না আমরা একটু নরম হ'য়ে এসেছি।—হ'য়েছে কি তাতে? সপ্তাহিসেবে বন্দোবস্ত, সপ্তাখানেকের নোটিশ দিয়ে চ'লে যাবেন। আইনতঃ বুড়ী কিছু বল্‌তে পারে না তাতে।"

চারু বল্‌লে—"একটা রুম দেখ্‌তেই গলদ্‌ঘর্ম্ম, বোঝ এখন মিসেস্ ব্রাউনের একটু আধটু আব্দার কেন সহ্য করি। পাপী মন তোমাদের, তাই সোজা কথা বিশ্বাস কর্‌তে চাও না—"

সুধীর মুচ্‌কে হাস্‌ল। সন্দীপের চোখ রাস্তার দু'ধারে এটা ওটা দেখ্‌ছিল। হঠাৎ সাম্‌নের একটা বাড়ী দেখিয়ে বল্‌লে—"ঐ দেখ্ ঘর খালি আছে। চল্ না একবার দেখা যাক্।"

চারু বল্‌ল—"এক জায়গায় কথা দিয়ে ফেলে?"—

সুধীর প্রতিবাদ কর্‌লে—"তাতে হ'য়েছে কি? আরো ভালো আর সস্তা যদি পাই আমরা—কি বল রাজেন?"

—"মন্দ কি, দেখ্‌তে ক্ষতি নেই। সুবিধামতন হ'লে, সকালে উঠেই বুড়ীকে একটা খবর দেওয়া যাবে।"

বাড়ীর সাম্‌নে বাগান। বাগানের বাইরে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে বাড়ীটা একবার দেখে নিলে ওরা। বেশ পছন্দ হ'ল—মার্চ্চমণ্ট রোডের বাড়ীর মত ব্যবসাদার ল্যাণ্ডলেডির নয়, আর একটু ভদ্রগোছের, মধ্যবিত্ত পরিবারের ব'লে বোধ হ'ল।

ভিতরে ঢুকে দরজার কাছে এসে বেল্ টিপ্‌ল রাজেন। বেশিক্ষণ না যেতেই একটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মেড্ এসে দোর খুলে জিজ্ঞেস কর্‌লে—"কি চাই আপনার?" অন্ধকারে ঠাহর কর্‌তে পারেনি রাজেন কোন্ দেশী। বন্ধুরা দাঁড়িয়ে আছে বাইরে, রাস্তার উপর।

—"কর্ত্রীকে ডেকে দাও একবার।"

—"রুমের জন্যে কি, স্যার্? কি বল্‌ব তাঁকে?"

—"হ্যাঁ, রুমের জন্যে।"

মেড্‌টি আড়চোখে চট্ ক'রে একবার রাজেনের ওভার-কোট আর বুটজোড়া দেখে নিল। নিয়ে—বোধ হয় ধারণা ভালই হ'ল—খবর দিতে চল্‌ল।

মিনিটখানেক পরে আগাগোড়া কালো-পোষাক পরা একটি বৃদ্ধা মহিলা বেরিয়ে এলেন পাশের বস্‌বার ঘর থেকে।—"গ্যাসটা একটু বাড়িয়ে দাও, আইভি।—কাকে চান আপনি—" ব'লে উজ্জ্বল আলোকে ঠাহর ক'রে দেখে দু' পা পিছু স'রে গিয়ে তখন-তখনই একেবারে রাজেনের মুখের উপর সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। ভিতর থেকে ঠাকুরাণী আর চাকরাণীর বাদ-প্রতিবাদ শোনা গেল একটুখানি। মেয়েটি বোধ হয় জবাবদিহি কর্‌ছে দোর খুলে দেওয়ার অপরাধের।

রাস্তায় আস্‌তেই সন্দীপ বল্‌লে—"কি হ'ল?"

রাজেন টুপি খুলে' চুলগুলো নেড়ে-চেড়ে মাথাটা ঠাণ্ডা ক'রে নিয়ে নীরস স্বরে উত্তর দিলে—"আবার কি? কালা আদ্‌মী!!"

—"হুঁ"।—

অপমান হজম ক'রে নিঃশব্দে চারজনে বাড়ী ফিরে চল্‌ল।

পরদিন সকালে সন্দীপ আর রাজেন সুকুমার ও তার বোনকে ষ্টেশনে রিসিভ্ করতে গেল। সন্দীপ মেয়েদের সঙ্গে কখনো বেশি মেলামেশা করেনি, তাই একটু নার্ভাস্ হ'য়ে পড়েছে। কি জানি কেমন মেয়ে, ঘর তাঁর মনোমত হ'বে কি না, হয়ত লণ্ডনের 'ফ্যাশানেব্‌ল্ লেডি', এই আধ-পাড়াগাঁ সহরে তাঁর জন্যে এত অল্প সময়ের মধ্যে আর কি-ই বা কর্‌তে পার্‌ত ওরা, এসব বুঝ্‌বেন কি না তিনি। নিজের মনের ভয়টার আভাস রাজেনকে একটু দিতেই সে কাঁধটা একটুখানি উপরে তুলে বল্‌লে—"উপায় নেই, আমাদের যথাসাধ্য করেছি।"

সুজাতার সঙ্গে আলাপ হ'য়ে কিন্তু পথেই ওদের ভয় ভেঙে গেল। নিতান্ত সাদাসিদা মেয়ে, এখনও যেন স্কুলের ছাত্রী—ফ্যাশানের ধার-পাশ দিয়েও যায় না। এডিনবরার রাস্তাঘাট দেখে ভারি খুসী, উচ্ছ্বসিত হ'য়ে বল্‌লে—"কি চুপচাপ! লণ্ডনের হট্টগোল থেকে এসে মনটা যেন জুড়িয়ে গেল। আমায় কিন্তু মেজদা, সব দেখিয়ে বেড়াতে হ'বে গ্লাসগো যাবার আগে—হট্ ক'রে যেতে পারবে না তা ব'লে রাখ্‌ছি।"

রাজেন ও সন্দীপ প্রায় একসঙ্গে ব'লে উঠ্‌ল—"সে কি, গ্লাসগো যাচ্ছ না কি সুকুমার?"

—"কেন, মেজদা, তুমি ওঁদের লেখনি সব কথা?"

সুকুমার দুষ্টুমির হাসি হাস্‌তে লাগ্‌ল। "আগে থাক্‌তে বল্‌লে সন্দীপকে সঙ্গে নেয় কার সাধ্যি? এখন তোর কথা ঠেল্‌তে পারবেন না।—রাজেন, লেক্‌স্ দেখ্‌তে যাচ্ছি হে—গ্লাসগো হ'য়ে। প্রতুল লিখেছে ওরা অনেকে যাবে, সুজাতার বন্ধুনীও কারা আছেন। তাই তো ফিরে এলাম, নইলে ছুটি না ফুরোতে এ দিক মাড়াই আমি?"

ট্যাক্সি মার্চ্চমণ্ট রোডে ম্যাক্‌ফারলেনের বাড়ীর সামনে এসে থাম্‌ল। রাজেন কি বল্‌তে যাচ্ছিল, সুজাতা নাম্‌বার উদ্যোগ কর্‌তে সে আগেই টপ্ ক'রে নেমে পড়ে দরজা খুলে দিয়ে স'রে দাঁড়াল। ট্যাক্সির আওয়াজ পেয়ে মিসেস্ ম্যাক্‌ফারলেন উপর থেকে হ্যাণ্ড্‌ল্ ঘুরিয়ে সদর দরজা খুলে দিয়েছে।

উপরে যেতে যেতে সুজাতা বল্‌লে—"চমৎকার চওড়া সিঁড়ি তো! পথে আস্‌তে রাস্তাও দেখ্‌লাম খুব চওড়া আর পরিষ্কার। লোকজন কম ব'লেই কি এত বড় দেখাচ্ছিল?"

রাজেনই উত্তর দিল—"না, সত্যিই এখানকার রাস্তা-ঘাট সুন্দর। কত বড় বড় পাথর দিয়ে তৈরী দেখ্‌লেন না?"

—"আমি থাকি লণ্ডনের গোল্ডার্স্ গ্রীণে, ছোট ছোট বাড়ী সব ওদিককার, ছবির মত সুন্দর আর ঝক্‌ঝকে। এখানে সব নতুন লাগ্‌ছে। এডিনবরা যে পাহাড়ে দেশের রাজধানী, তা ওর বড় বড় পাথরে তৈরী রাস্তা আর বাড়ী দেখেই বুঝ্‌তে পারা যায়।—ব্রেকফাষ্টের পরেই বেরিয়ে পড়্‌ব, মেজদা।"

রাজেন ল্যাণ্ডলেডিকে ডেকে সুজাতার জন্যে ভাজা ডিম আর চায়ের অর্ডার দিল। পরে ওকে খেয়ে দেয়ে একটু সুস্থ হ'য়ে নেবার জন্যে একলা রেখে তিন বন্ধুতে মাঠের দিকে ঘুরে আস্‌তে চল্‌ল।—"সুকু, তুইও এই পাশের দোকানটায় ঢুকে কিছু খেয়ে নে।"

—"মন্দ কি। তোমরাও কিছু খাও।"

—"আপত্তি নেই, চলো এই সাম্‌নের টেবিলটায় বসা যাক্।"

ওয়েট্রেস্‌কে খাবার আন্‌বার হুকুম ক'রে আরাম ক'রে ব'সে রাজেন বল্‌লে—"এদিকে কিন্তু এক ফ্যাসাদ হ'য়েছে, সুকুমার। ল্যাণ্ডলেডিকে বলা হ'য়েছিল তোর বোন অনেক দিন থাক্‌বে।"

—"কেন বল্‌তে গেলে ও-রকম? একেবারে কিছু না বল্‌লেই ঠিক হ'ত।"

—"তোমার যেমন বুদ্ধি! এত কথা লিখ্‌তে পারলে, আর, ক'দিন থাক্‌বেন এটুকু লিখ্‌তে কি হ'য়েছিল?" সন্দীপ বেশ একটু রাগ ক'রে বল্‌লে।

—"আরে, অত খেয়াল হয়নি আমার। প্রথমে কথা ছিল তোদের কারো ওখানে উঠে একটু বিশ্রাম ক'রেই চ'লে যাওয়া যাবে। গ্লাসগোর ট্রেণের তো অভাব নেই—"

—"সেইটেই ভালো হ'ত—একটা রুম আমরা একবেলার জন্যে স্বচ্ছন্দে ছেড়ে দিতে পারতাম, বিশেষতঃ বস্‌বার ঘর যখন রয়েছেই—"

—"হ্যাঁ, কিন্তু ও' ধ'রে বস্‌ল যাবার আগে এখানে কি কি সব দেখ্‌বে—এই দুর্গ টুর্গ। ইতিহাস নিয়েছে কি না—এডিনবরা সম্বন্ধে ওর ভারি কৌতূহল। সামান্য কিছু দেখ্‌তে গেলেও অন্ততঃ দিন দু'তিন লাগে তো—"

—"সে দু'তিন দিনের জন্যে স্বচ্ছন্দে রাণীদিদের ওখানে ঠিক ক'রে দিতে পারতাম। আসলে সুকু, তোমার সব কাজই ও-রকম—সবেতে ছেলেমানুষী—"

রাজেন থামিয়ে দিয়ে বল্‌লে—"থাক্, থাক্, বুড়ীকে বুঝিয়ে বলা যাবে এখন। যা হ'য়ে গেছে, তার আর কি।"

* * * *

সারাদিন ওরা সুজাতাকে সহরের প্রসিদ্ধ জায়গাগুলো দেখিয়ে বেড়ালে। এমন ক'রে বেড়াতে হ'লে লাঞ্চ্ বা চা খাবার জন্যে বাড়ীতে ফিরে যাওয়া চলে না, কাজেই খাওয়া দাওয়াও ওদের বাইরে সার্‌তে হ'ল। কিন্তু সুজাতার দুর্গ ও প্রাসাদ এত ভালো লাগ্‌ল যে ও' কেবল ঐ দু'টো

দেখ্‌তেই অনেকটা সময় কাটিয়ে দিল। হলিরুড্ প্যালেস্ দেখা শেষ ক'রে বিকালের দিকে আর্থাস্ সীটের শিখরে উঠে, দূরে সমুদ্রের পানে চেয়ে চেয়ে হঠাৎ ওর খেয়াল হ'ল সমুদ্র দেখ্‌তে যাবে এবং যে কথা সেই কাজ। মেজদাদা ওর চিরদিনই ভালোমানুষ, সন্দীপ সাথে সাথে ঘুর্‌ছে মাত্র এবং রাজেন তো ওদের দু'দিন বেশি ধরে রাখ্‌তে পার্‌লেই খুসী হয়। উধাও হয় তাই সবাই মিলে পোর্টোবেলো। ট্রামের দোতলায় চড়ে সন্ধ্যার ম্লান আলোতে দু'ধারের বাড়ীঘর, বাগান, খোলা মাঠ দেখে দেখে সুজাতার মনে হয় এডিনবরা এক অপূর্ব্ব রহস্যময় জায়গা। একসঙ্গে প্রাকৃতিক দৃশ্যের এত সমারোহ বৃটেনের আর কোনো সহরে আছে কি না সন্দেহ। বেড়াবার উপযোগী কি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলাদা পাহাড়ে, কি দূর হ'তে দৃষ্ট শ্রেণীবদ্ধ ধূসর শৈলমালায়, বিস্তীর্ণা নদী, শষ্পপূর্ণ শ্যামল মাঠ, ছোটখাট লেক্ এবং সর্ব্বোপরি এই উত্তাল-তরঙ্গময় সমুদ্রে এডিনবরা নগরী সকল রকমে সম্পদময়ী। স্কটের উপন্যাস এবং সহরের নিজস্ব ঐতিহাসিক গৌরব সুজাতার মনের সম্ভ্রম আরো বাড়িয়ে তোলে। প্রিন্সেস্ ষ্ট্রীটে ঘুর্‌বার সময় একদল হাইল্যাণ্ডার দেয় দেখা—ব্যাগ্-পাইপ বাজিয়ে যাচ্ছে। ওদের সেই হাঁটুর উপরে পরা পুরোনো ধরণের পোষাক, একটুখানি পালক গোঁজা মাথার টুপির মধ্যে, ব্যাগপাইপের বিচিত্র সুর—সব মিলে সুজাতার তরুণ মনে স্কচ্‌দের সম্বন্ধে ভারি একটা রোমাণ্টিক ছায়াপাত হয়।

পোর্টোবেলোর পথে যেতে যেতে ও' চুপ ক'রে এ-সব ভাবছে, রাজেন বল্‌লে—"আপনার দেখ্‌ছি এডিনবরা খুব ভালো লেগেছে।"

—"হ্যাঁ"—

—"ফিরবার পথে আবার আস্‌বেন তাহ'লে—"

সুকুমার তাড়াতাড়ি হাতের কাগজখানা রাজেনের চোখের সাম্‌নে ধরে বল্‌লে—"ভাল প্লে আছে আজ—চল, যেতেই হ'বে। আমি এমন জিনিস না দেখে নড়ছি না এখান থেকে। বুলু, আজ আর নেমে কাজ নেই, সমুদ্র আর একদিন দেখো। চল, ফেরা যাক।"

রাজেন ঘড়িটা দেখে মনে মনে হিসাব করে বললে—"কিন্তু ঢের সময় আছে, সুকুমার, এত ব্যস্ত হ'য়ো না।"

সন্দীপ এতক্ষণ একটা কথাও বলেনি, এবার অপ্রসন্ন সুরে বল্‌ল—"কিন্তু বুড়ীকে যে বলা হয়নি, তার কি হ'বে? ও' হয়ত খাবার নিয়ে বসে থাক্‌বে।"

—"কোন্ বুড়ী?"

—"ম্যাক্‌ফারলেন—"

—"ওঃ—ওকে তো সেই সকালেই বলেছি যে আজ আমরা বাইরে খাবো। ওর ভারি গরজ পড়েছে কি না খাবার নিয়ে ব'সে থাক্‌বার—বরং পয়সা বাঁচ্‌লে দু'হাত তুলে আশীর্ব্বাদ কর্‌বে তোমায় এবং যাতে বুলুকে রোজই বেড়াতে নিয়ে যাও সেই উপদেশ দেবে—"

সন্দীপের মুখটা লাল হ'য়ে উঠ্‌ল। হাজার চেষ্টা করেও বেচারী এ পর্য্যন্ত একবারও মেয়েদের সঙ্গে সহজ ভাবে মিশতে পারেনি। সুকুমার প্রমুখ বন্ধুরা তাই সুবিধা পেলেই ওকে চিম্‌টি কাট্‌তে ছাড়ে না।

পোর্টোবেলো থেকে ফিরে বেশ ভালো মত ডিনার খেয়ে থিয়েটারে যেতে ওদের একটু দেরী হ'য়ে গেল। সুকুমার কিন্তু নাছোড়বান্দা, বেশি দাম্ দিয়ে হ'লেও ও' টিকিট কিন্‌বে—অর্থাৎ আজ ও প্লে না দেখে ছাড়বেই না। দলে পড়ে সন্দীপের পড়াশুনা ঘুচে গিয়েছে, দু'একবার শেষ চেষ্টা ক'রে সেও হাল ছেড়ে দিল।

প্রায় রাত এগারোটায় হল থেকে বেরিয়ে আস্‌বার সময় রাজেন ঠাহর ক'রে দেখ্‌ল সুজাতার চোখের কোল ভিজে আছে। "এ কি, আপনি এত ছেলেমানুষ? ছি, ছি। থিয়েটার দেখে কেঁদে ভাসিয়ে দিলেন?"

সুকুমার ফিরে চেয়ে বল্‌লে—"কে, বুলু? ও ঐ রকম, —থিয়েটার দেখে কাঁদে, ছবি দেখে কাঁদে। কোনো ট্রাজেডি হ'লে ওকে কোথাও নিয়ে যেতে ইচ্ছা করে না—অথচ ট্রাজেডি দেখ্‌তেই ওর লোভ বেশি।—না, না, চলো ওকে দিয়ে আসি আগে, একসঙ্গে যাওয়া যাবে।" সন্দীপকে ফিরিয়ে মার্চ্চমণ্ট রোডের রাস্তা ধরল সবাই।

বাড়ীর সাম্‌নে এসে ওরা দু'জনে দাঁড়িয়ে রইল, সুকুমার সিঁড়ির কয়েক ধাপ উঠে সুজাতাকে ম্যাকফারলেনদের দরজাটা দেখিয়ে দিয়েই নেমে গেল। সারাদিন হৈ চৈ করা গেছে, এখন সকলেই বাড়ী ফির্‌তে পারলে বাঁচে।

একটি ছেলে এসে সুজাতাকেদোর খুলে দিয়ে গেল। নিজের ঘরে গিয়ে সুজাতা দেয়াল হাত্‌ড়ে সুইচ্‌ টিপে আলো জ্বালালে। পরে সোফায় বসে জুতোটা খুল্‌তে খুল্‌তে কত কি ভাবতে লাগ্‌ল। চোখে ওর তখনো স্বপ্নের মায়া—মনের উপর আবেশ জড়িয়ে আছে। আর্থার্‌স্‌ সীট্‌, হলিরুড্‌, হাইল্যাণ্ডার—হাম্‌লেট প্লে—সুন্দরী এডিনবরা, স্কটের—

টক্‌—টক্‌। দরজায় টোকা পড়্‌ল। সুজাতা একটু চম্‌কে উঠ্‌ল। টক্‌—টক্‌। আর একটু জোরে। ও উঠে দরজাটা খুলে দিল।

—"কে? ও, মিসেস্‌—কি চাই?"

মিসেস্‌ সোজা ঘরে ঢুকে সুজাতার দিকে কট্‌মট্‌ ক'রে তাকিয়ে বল্‌লে—"বিল্‌—আমার ঘরের ভাড়া দাও।"

—"সে কি, এত রাত্তিরে?"

—"হুঁ, এত রাত্তিরে বলেই তো।" তার পর গলাটা আর একটু চড়িয়ে—"কেমন মেয়ে গা তুমি? এসেছো সেই সাত সকালে—সারাদিন টিকিটার দর্শন পাওয়া গেল না,—কোথায় আমার ভাড়া দেওয়া, কোথায় কি!"

সুজাতা নরম সুরে বল্‌লে—"বেশ তো, আমি কি রাত্তিরেই পালিয়ে যাচ্ছি, মিসেস্‌—ইয়ে—"

মিসেস্‌ কিন্তু ওকে একটুও সাহায্য কর্‌লে না। বরং রুখে বল্‌ল—"অগ্রিম দিতে হবে—তুমি সুবিধার লোক নও, সে আমি টের পেয়েছি। নইলে এত রাত্তিরে বাড়ী আস ছেলে সঙ্গে ক'রে?"

—"কী?"—নিমেষে স্বপ্ন ভেঙে গেল। হায় সার ওয়াল্টার স্কট!

—"বড় যে তেজ দেখাও আবার? দাও আমার টাকা। টাকা না দিয়ে ও-সব—আমার বাড়ীতে চল্‌বে না—"

—"চুপ!"—সুজাতার মাথাটা চন্‌ ক'রে উঠ্‌ল। "জান তুমি কি বল্‌ছ? সকালে আমার ভাইকে দেখনি?"

—"ও, ভারি আমার ভাই রে! অমন ভাই গণ্ডায় গণ্ডায়—"

ব্যস্‌—আর সুজাতা সহ্য কর্‌তে পারে না। কম্পিত আঙুল তুলে দরজা দেখিয়ে বল্‌লে—"যাও, এখনি।"

ল্যাণ্ডলেডি কোমরে হাত দিয়ে মেজেতে পা চেপে দাঁড়িয়ে বল্‌লে—"ঘর তোমার যে যাব?"

—"আমি যখন ভাড়া নিয়েছি তখন আমার—এখনই বেরিয়ে যাও। আমি ঘুমাব।"

—"ভাড়া দিয়েছ কি যে ঘর ভাড়া নিয়েছ বল্‌ছ?"

"কাল সকালে পাবে—এখন আমায় বিরক্ত করো না।" সুজাতা শাড়ী খুলে ড্রেসিং-গাউন পর্‌ল।

—"কাল সকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর্‌তে পার্‌ব না, এখ্‌খনি চাই টাকা—নইলে কেমন ঘুমাও তুমি দেখ্‌ব।"

—"কি? আচ্ছা, এই আমি ঘুমাতে চল্‌লাম।" খাটের দিকে অগ্রসর হ'ল। মিসেস্‌ ম্যাকফারলেন দ্রুত এসে জোরে ওর বাহু টিপে ধর্‌ল। একবার সেদিকে তাকিয়ে সুজাতা দাঁতে দাঁত চেপে বল্‌লে—"অসম্ভব। এর পরে একটা পেনিও না—যতক্ষণ ক্ষমা না চাও।"

—"বটে?—ড্যাডি, ড্যাডি!"

—"কি গো?" রান্নাঘর থেকে ভারি গলায় আওয়াজ এলো।

—"এস তো একবার এদিকে। শোন কথা ব্ল্যাকির—বল্‌ছে ভাড়ার টাকা দেবে না। কম বুকের পাটা নয়—এতটুকু মেয়ে, সাহস কত!" মিঃ ম্যাকফারলেন পাইপ-হাতে উঠে আসে—"হুম্‌, লোক চেননি এখনো? ভাল চাও তো টাকা বের কর।"

যতই বাড়াবাড়ি করছে ওরা, ততই সুজাতার মাথাটা আশ্চর্য্য রকম ঠাণ্ডা হ'য়ে আস্‌ছে। ধীরে ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বল্‌লে—"পৌনে বারোটা। মিসেস্‌ যেই-হও-না-কেন-তুমি, শোন—দুপুর রাতে পুরুষ ডাকিয়ে জুলুম কর্‌ছ বিদেশী মেয়ের ওপর—টাকার জন্যে। আমার ভাই থাক্‌তে বলনি—ভয়ে, আর বেশি পাবে না বলে—"

কথা না ফুরোতে মিসেস্‌ ম্যাক্‌ফারলেন কর্ত্তার দিকে তাকিয়ে টিপে বল্‌লে—"ওঁর ভাই—"

সুজাতা ঘাড় বাঁকিয়ে দীপ্ত ভঙ্গীতে একবার তাকিয়ে ধীরে ধীরে জানালার কাছে গিয়ে কাচটা তুলে ধর্‌ল।

মিসেস্‌ ম্যাক্‌ফারলেন পিছন পিছন এসে জিজ্ঞেস কর্‌লে—"কি কর্‌ছ?"

—"পুলিস ডাক্‌ব—ঘর চড়াও হ'য়ে শাসাচ্ছে তোমার স্বামী—"

—"পুলিস ডাক্‌বে? খবরদার!" মিসেস্‌ ওর হাত চেপে ধর্‌ল। সুজাতা এক ঝট্‌কায় হাত ছাড়িয়ে সোফার ওধারে সরে গেল। "বেরিয়ে যাও, তা না হ'লে—"

—"ড্যাডি, এ যে বিষম মেয়ে। দাও হুতা জানালাটায় খিল লাগিয়ে—"

—"ভাল চাও তো টাকা বা'র কর, শুন্‌ছ গা মেয়ে? শেষ ক'রে দিতে পারি তোমায়, এ সহজ জায়গা পাওনি। পুলিস ডাক্‌বে? পুলিস ডাক্‌বে—হা—হাঃ। পুলিস কোন্‌ দেশী, সে খেয়াল আছে? ব্ল্যাকির হ'য়ে কথা বল্‌বে না কি সে? হা—হাঃ!"

—"বেশ তো, খুন কর্‌তে পার, কিন্তু টাকা পাবে না। আগে মাপ চাইবে—তার পর অন্য কথা। এই দেখ, পার্সে আমার কয়েক শিলিং বই নাই। আমি চেক্‌ না লিখ্‌লে তোমাদের সাধ্যও নেই টাকা বা'র কর্‌বে জোর ক'রে। এই আমি বস্‌লুম এখানে—যা পার কর এখন তোমরা।"

—"কী চ্যাটা মেয়ে রে! এতটা বয়স হ'ল, এ রকম তো আর দেখিনি!"

কিন্তু যে—খুন কর্‌তে চাইলে খুন কর্‌তে বল্‌ছে, তাকে নিয়ে আর কত পারা যায়? সুজাতা চুপ ক'রে ব'সে আছে—বাইরে থেকে দেখ্‌লে মনে হয় ওর এতটুকু ভয় নেই। ভিতরে ভিতরে কি চল্‌ছে তা ও-ই জানে। মনে মনে ঠিক বুঝেছে এ-বাড়ীতে আজ আর ঘুমানো চল্‌বে না। খুন টুন বাজে কথা—ওর একমাত্র ভয়, বাড়ীতে একাধিক পুরুষ। নিতান্ত নিম্নশ্রেণীর লোক ব'লে মনে হ'চ্ছে এদের। যা-তা কর্‌তে পারে।—নাঃ, ঘুম কপালে নেই আজ। উঠে সুট্‌কেসটা খু'লে একটা বই নিয়ে বস্‌ল—রাতটা কাটিয়ে দেওয়া যাক্‌ কোন মতে। সবে বইটা খুলে ধরেছে, বুড়ী হাঁ—হাঁ ক'রে ছুটে এসে পট্‌ ক'রে বাতিটা নিবিয়ে দিলে।

দোরটা খু'লে রেখে রান্নাঘরে গিয়ে সবাই কি পরামর্শ কর্‌তে লাগ্‌ল।

খানিক পরে ম্যাক্‌ফারলেন এসে—"কই, দাও তোমার লাভারের—"

—"সাবধান!"

—"তোমার ভাই, না প্রিয় কার ঠিকানা—"

একটুখানি চুপ ক'রে থেকে—"কই, দাও না গা—"

—"কেন?"

—"কেন?" ম্যাক্‌ফারলেন কুৎসিত হাসল। "ডেকে আন্‌ব তাকে- দেখি সে পয়সা দেয় কি না।"

সুজাতা একটু ভেবে দেখ্‌লে। না—মেজ্‌দার আসাই ভালো। সারারাত এ মদ্যপের ঘরে থাকা—মাত্র সাড়ে বারোটা বেজেছে। উঠে গিয়ে একটুক্‌রা কাগজে সুকুমারের ঠিকানা লিখে দিলে।

—"তুমি ব'সে থাকো যেমন আছ তেমনি, বুঝেছ?—খবরদার, দোর বন্ধ কর্‌তে পার্‌বে না।"

* * * *

রাতকাপড়ের উপর কোনমতে দিনের ওভারকোটটা জড়িয়ে সুকুমার এবং ওর পিছন পিছন সন্দীপ এসে দাঁড়াল। সুকুমার ঘরে ঢুকে বললে—"কি রে বুল্‌, ব্যাপার কি?"

সমস্ত শুনে বল্‌লে—"ম্যাক্‌ফারলেন গিয়ে আমায় বলেছে যে তোমার বোন আমাদের একটা পেনিও ভাড়া দেবে না বলেছে। আমি তো শুনে অবাক। তার পর মনে হ'ল নিশ্চয় কোন গোলমাল হ'য়েছে।" ফিরে ম্যাক্‌ফারলেনের দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে বল্‌লে—"আজ রাত্রে একটি পয়সাও পাবে না। কাল হিসেব হ'বে।—বিলু, তোর এখানে শুতে ভয় কর্‌ছে?"

—"বড্ড, মেজ্‌দা; এ রকম লোক আমি জীবনে দেখিনি, শুধু বইয়েই পড়েছি—"

—"বইয়ে কি আর শুধু শুধু লেখে রে? সত্যিকার জীবন কত কুৎসিত,—কত ভয়ানক-ভয়ানক ক্যারেক্‌টার আছে সব—দেখ্‌—দেখে শেখ। শিখতেই তো এসেছিস্‌ এখানে।"

সন্দীপ বল্‌লে—"এসব দেখতে বা শিখতে যে হ'বেই তার কি মানে আছে, সুকুমার? সবাইকার এ রকম অভিজ্ঞতা হয়ও না—কি ক'রে ভয়ানক খারাপ লোকের হাতে প'ড়ে গিয়েছে, তাই তো—"

ওরা চল্‌তে উদ্যত হ'তে ল্যাণ্ডলেডি এসে পথ জুড়ে দাঁড়াল। "কোথায় যাচ্ছ ভাঁড়া না দিয়ে?"

সন্দীপ এগিয়ে এসে বল্‌লে—"তোমার সঙ্গে কি চুক্তি হ'য়েছিল যে অগ্রিম দিতে হ'বে?"

—"তুমি কেন কথা বল্‌তে এসেছ? তুমি ওর ভাইও নও, তোমার সঙ্গে কোনো কথাও হয়নি।"

—"কিন্তু কাল বাড়ী ঠিক কর্‌বার সময় আমিও ছিলাম। সাক্ষী আছি সব কথাবার্ত্তার। মিসেস্ ম্যাক্‌ফারলেন, তোমাদের ব্যবহার চূড়ান্ত খারাপ হ'য়েছে। তুমি জান কার সঙ্গে কি বলেছ? বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গ্র্যাজুয়েট্—"

—সুজাতা ছাতা নেবার অছিলায় পিছন ফিরে দাঁড়াল। সুকুমার কেসে গলাটা পরিষ্কার ক'রে নিল। মনে মনে সন্দীপের মুণ্ডপাত ক'রে ভাবলে—"সন্দীপটা এখনও আনাড়ি রয়ে গেল! কোথায় কার সঙ্গে কি বল্‌ছে দেখ।"

মিসেস্ ম্যাক্‌ফারলেন গলা সপ্তমে চড়িয়ে বল্‌লে—"ভারি কেয়ার করি তোমার বিশ্ববিদ্যালয় আর তার গ্র্যাজুয়েট্‌কে। এখন যাচ্ছ যাও, কিন্তু একটা জিনিসও নিতে পার্‌বে না। কাল টাকা দেবে, তবে জিনিস ছাড়্‌ব।"

* * * *

সকালে সব শুনে রাজেন বল্‌লে—"আমায় যদি রাত্রে একবার ডাক্‌তিস্ বুদ্ধি ক'রে! কাছেই তো ছিলাম, ভাই। হায়রে হায়, দু'টো গিনি নাহক্ দিয়ে দিলি?"

—"কেন হে?"

—"সে চালই ওদের যদি বুঝবে তোমরা, তবে আর বোকামি কর্‌বে কেন?—সুকু, বোনকে ওরা সত্যিই কিছু কর্‌তে সাহস কর্‌ত না। এখানেও আইন আদালত আছে, সেটা ওরা ভালো ক'রেই জানে। কেবল ফাঁকতালে টাকাটা মেরে নিলে। ঘরভাড়াও দিতে হ'ল না, খাবারও না, না লাইট্-খরচ—না কিছু। ভয় দেখিয়ে, অপমান ক'রে রাত্রে বে'র ক'রে দিল ইচ্ছে ক'রেই। কিন্তু জিনিস-পত্র ধ'রে রেখে দিলে। জানে যে সুজাতা কিছুতেই আর ওখানে যাবেন না, কিন্তু ঘর-ভাড়াটা—চুক্তির সব টাকাটা, তাও সারা সপ্তার অর্থাৎ পূরো দু'টো গিনি—বাধ্য হ'য়েই দিতে হ'বে। তুখোড় লোক, পাকা চালিয়াত আর ভারি লো-ক্লাস। শেয়ালের মতন বুদ্ধি। ষ্টুডেণ্টরা যে এই সামান্য টাকা নিয়ে হাঙ্গামা কর্‌তে চাইবে না, তা বেশ জানে।—কিন্তু তুই কি ব'লে কল্‌কাতা ইউনিভারসিটির গ্র্যাজুয়েটসিপএর দোহাই দিতে গিয়েছিলি, হ্যাঁরে সন্দীপ?"

লজ্জায় সন্দীপের মাথাটা টেবিলের সঙ্গে প্রায় এক হ'য়ে যায় আর কি।

তার মনের মধ্যে গুনগুন ক'রে ওঠে স্বপ্নভাঙ্গা রাগিণীতে জাগরণী তালে: "বিলেত দেশটা মাটির, সেটা সোণার রূপোর নয়!"

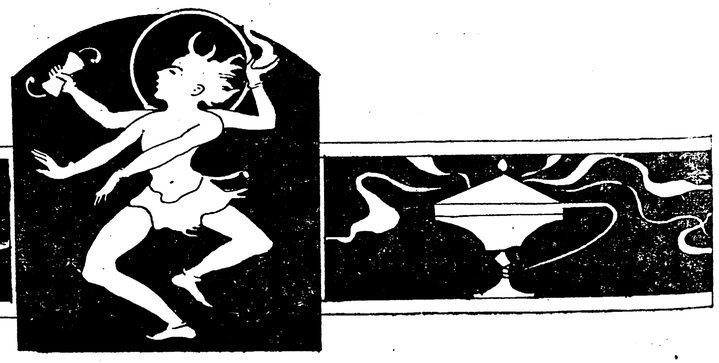

সাময়িকী

বিমানদুর্ঘটনা—

• গত ২৮শে এপ্রিল দমদমার বিমানাশ্রয়ে যে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা বাঙ্গালায় দুঃখের ছায়াপাত করিয়াছে। ঐ দিন প্রাতে ভূমি হইতে প্রায় ৬শত ফিট উচ্চে বিমানাশ্রয় হইতে প্রায় ১ মাইল উত্তরপূর্ব্বে দুইখানি বিমানে সংঘর্ষ হয়। বিমান দুইখানির একখানি দমদমার বিমান-সঙ্ঘের—অপরখানির অধিকারী হাওড়ার প্রসিদ্ধ বৈমানিক বিনয়কুমার দাস। উভয় বিমানই তখন পরিচালন শিক্ষায় ব্যাপৃত ছিল। বিনয়কুমারের বিমান তিনিই পরিচালিত করিতেছিলেন। তাহাতে একজন ইংরাজ যুবতী যাত্রী ছিলেন। অপর বিমান দেবকুমার রায় কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছিল এবং তাহাতেও একজন যাত্রী ছিলেন, তাঁহার নাম মিষ্টার পি গুপ্ত। সংঘর্ষে চারিজনেরই মৃত্যু হইয়াছে।

দেবকুমারের ভগ্ন বিমান। সঙ্গে যাত্রী ছিলেন মিঃ পি গুপ্ত। ফটো—তারক দাস

বিনয়কুমার হাওড়ার লোক এবং বিমান পরিচালনায় তিনি নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি গত ৮ বৎসর এই কার্য্য করিয়াছেন এবং করাচী হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত বিমান পরিচালন করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার বয়স ৪২ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার বিমান চালনার সচিত্র বিবরণ তিনি 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত করিয়াছিলেন।

বিনয়কুমারের ভগ্ন বিমান। এই বিমানে মিঃ বি কে দাস মারা গেছেন। এই বিমানে মেমসাহেব যাত্রিণী ছিলেন। বারাসতের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট টুপি হাতে দণ্ডায়মান। ফটো—তারক দাস

দেবকুমার ঢাকা জিলার অধিবাসী। তিনি প্রায় ৭ বৎসর পূর্ব্বে বিলাতে যাইয়া বিমান পরিচালন শিক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন এবং তথায় রাত্রিকালে পরিচালনায় একবার আহত হইয়াছিলেন। তিনি প্রায় ৯ মাস পূর্ব্বে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কলিকাতায় হাজরা রোডে বাস করিতেছিলেন। সরকারী চাকরী কমিশনের আহ্বানে তাঁহার সিমলায় যাইবার কথা ছিল। তিনি স্থির করিয়াছিলেন, বিমানে দিল্লী পর্য্যন্ত যাইয়া—তথা হইতে রেলে সিমলায় যাইবেন। মৃত্যুকালে দেবকুমারের বয়স ৩২ বৎসর হইয়াছিল।

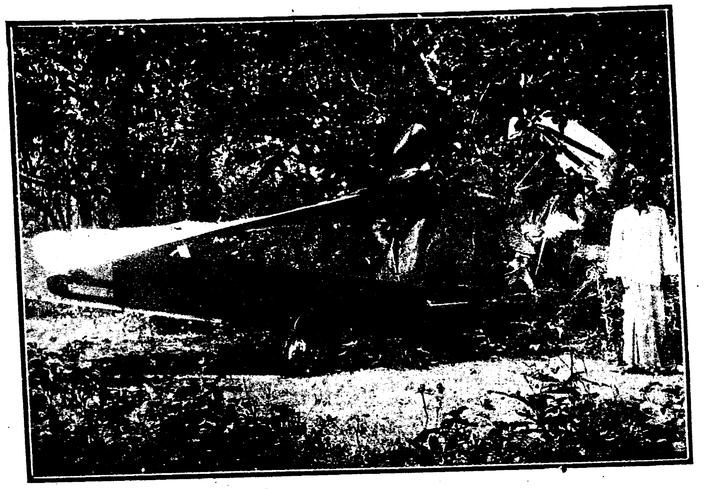

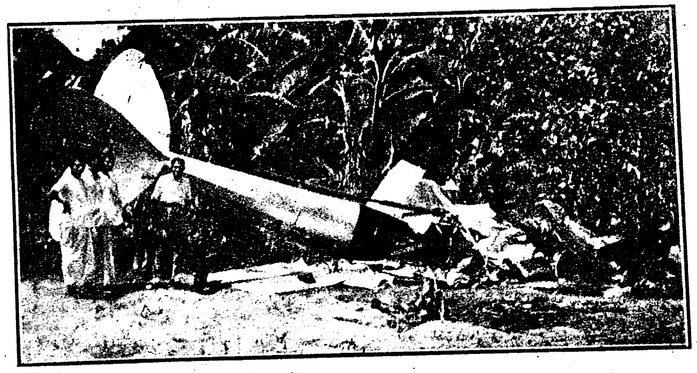

আরোহী গুপ্তের বয়স ৩০ বৎসর। তিনি শ্রীহট্টের

লোক। তিনি ষ্টার অব ইণ্ডিয়া বীমা কোম্পানীর কলিকাতার কার্য্যালয়ের সহকারী ম্যানেজারের কায করিতেন। গত অর্দ্ধোদয় যোগের সময় তিনি শ্রীহট্ট সেবাসঙ্ঘের স্বেচ্ছাসেবক দলের নায়ক ছিলেন এবং শ্রীহট্টের প্লাবন পীড়িত লোকদিগের সাহায্যার্থ উল্লেখযোগ্য কাযও করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত প্রভাত গুপ্ত বিশ্বভারতীর অধ্যাপক।

এই দুর্ঘটনা যে বিশেষ শোকের ও দুঃখের কারণ, তাহা বলাই বাহুল্য।

বিনয়কুমার দাস

আজ আর একজন বাঙ্গালী বৈমানিকের কথা আমাদিগের মনে পড়িতেছে। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালী বৈমানিক লেফটেনাণ্ট ইন্দ্রলাল রায় ফ্রান্সে জীবন হারান এবং ঐ বৎসর ১লা ডিসেম্বর বিলাতে তাঁহার জন্য প্রার্থনা হয়। তিনি রয়াল এয়ার ফোর্সে ৪০নং স্কোয়াড্রণে ছিলেন।

যাঁহারা দমদমায় বিমান দুর্ঘটনায় জীবন হারাইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স্ক। আমরা তাঁহাদিগের

ডি কে রায়

শোককাতর স্বজনগণকে তাঁহাদিগের এই আকস্মিক শোকে আমাদিগের সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

পরলোকে বিশ্বনাথ বসু—

আমাদের আবাল্য সুহৃদ প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের একমাত্র কৃতী পুত্র বিশ্বনাথ। যুবক বিশ্বনাথ বৃদ্ধ পিতা মাতার বুকে শেল হানিয়া, শিশু পুত্রের মায়া কাটাইয়া চলিয়া গেল।

১৩১৮ সালের ২০এ অগ্রহায়ণ বুধবার বিশ্বনাথের জন্ম হয়। 'বিশ্বকোষ' সম্পূর্ণ হওয়ার অব্যবহিত পরে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া নগেন্দ্রবাবু পুত্রের নাম রাখিলেন, বিশ্বনাথ। 'বিশ্বকোষ' সমাপ্তির একটা উৎসবের জন্য ধরিয়া বসিলাম। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব-সম্মত হইলেন,—কত আনন্দ! বিশ্বনাথের নামকরণে অন্নপ্রাশনে আনন্দ করিয়া আসিলাম। বিবাহে যাইতে পারি নাই বলিয়া কত দুঃখ। কাশীমবাজার রাজ প্রতিষ্ঠিত পলিটেক্‌নিক্ ইন্‌ষ্টিট্যুটে শিক্ষালাভ করিয়া বিশ্বনাথ

পিতার তত্ত্বাবধানে উপযুক্ত গৃহ-শিক্ষকের নিকট বাঙ্গালা, ইংরাজী, সংস্কৃত, হিন্দী প্রভৃতি বহু ভাষা শিক্ষা করে। সঙ্গীত, জ্যোতিষ, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতিতেও সে পারদর্শী হইয়া উঠিতেছিল। ছাপাখানার কাজে প্রত্যেক বিভাগে সে অভিজ্ঞ হইয়াছিল। নিজেদের জমিদারী সংক্রান্ত কাজে হিসাব নিকাশেও তাহাকে কেহ ঠকাইতে পারিত না। ইদানীং সে পিতার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ কায করিতেছিল। ১৩৪১ সাল শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গত ২৬এ চৈত্র বিশ্বনাথ পরলোকে চলিয়া গিয়াছে। যিনি এমন পুত্র হারাইয়াছেন, তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা নাই।

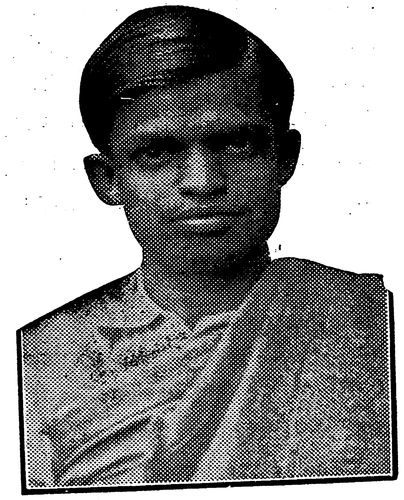

বিশ্বনাথ বসু

সুহৃদবর নগেন্দ্রনাথ আজীবন ঈশ্বরবিশ্বাসী। ভরসা করি, ভগবচ্চরণে তিনি শান্তির সন্ধান পাইবেন। কিন্তু মা'র প্রাণ কাহাকে অবলম্বন করিয়া শান্তিলাভ করিবে? তাহার পত্নীর হৃদয়ের অনির্ব্বাণ চিতার আগুন কিসে নির্ব্বাপিত হইবে? যিনি দান করিয়াছিলেন, তিনিই গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারই চরণে প্রার্থনা করি—অভাগিনী মহিলাদ্বয় যেন তাঁহার করুণাকণায় শান্তিলাভ করিতে পারেন।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলন—

এ বার দিনাজপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। প্রাদেশিক সম্মিলনের নামেই ইহার স্বরূপ সপ্রকাশ। লর্ড রিপণের শাসনকালে ইলবার্ট বিলে ভারতীয় বিচারকদিগকে য়ুরোপীয় অভিযুক্তের বিচারাধিকার প্রদান-প্রস্তাবে এ দেশে য়ুরোপীয়রা কিরূপ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহার কথা অনেকেই জানেন। য়ুরোপীয়রা লর্ড রিপণকে অপমানিত করিতেও ত্রুটি করেন নাই এবং শুনা যায়, তাঁহাকে ধরিয়া বিলাতগামী জাহাজে তুলিয়া চালান দিবার ষড়যন্ত্রও হইয়াছিল। সে সময়ের স্মৃতি হেমচন্দ্রের "নেভার—নেভার!!" ব্যঙ্গ কবিতায় রচিত রহিয়াছে

"গেল রাজ্য, গেল মান,
ডাকিল 'ইংলিশম্যান',
ডাক ছাড়ে ব্রানশন
কেশুয়িক, মিলার—
'নেটিভের' কাছে খাড়া—নেভার—নেভার!
"নেভার" সে অপমান
হতমান বিবিজান,
নেটিভে পাবে সন্ধান
আমাদের জানানা!"

সেই সময় ভারতবাসীর মনে যে জাতীয় রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার কল্পনা স্থান পাইয়াছিল—তাহাই কংগ্রেসে পরিণতি লাভ করিয়াছে—সে আজ ৫০ বৎসর পূর্ব্বের কথা।

তাহারও পূর্ব্বে বাঙ্গালায় প্রাদেশিক সম্মিলনের প্রতিষ্ঠা। অনেক বিষয় বিশেষভাবে প্রাদেশিক। সে সকলের আলোচনা কংগ্রেসে সম্ভব হয় না। প্রাদেশিক সম্মিলনই সে সকলের আলোচনার উপযুক্ত স্থান।

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর প্রথমে রাজনীতিকরা মনে করিয়াছিলেন, প্রাদেশিক সম্মিলনের উপযোগিতার অবসান হইয়াছে, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই বুঝিতে পারা যায়, তাহা যথার্থ নহে! পরন্তু বহু শাখা-নদী যেমন একটি নদীকে জলধারায় পুষ্ট ও বেগবতী করে প্রাদেশিক সম্মিলনগুলি তেমনই কংগ্রেসকে পুষ্ট ও তাহার শক্তি

বর্দ্ধিত করে। সেই জন্য বাঙ্গালায় ইহার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয় এবং সেই সময় হইতে ঐক্য এক বার এক এক সহরে ইহার অধিবেশন আরম্ভ হয়। ইহার নূতন আরম্ভে প্রথম অধিবেশন—বহরমপুরে। তখন সম্মিলন, কংগ্রেসের নীতি অনুসরণ করিলেও কংগ্রেসের অধীন ছিল না। তাহার স্বতন্ত্র সত্তা ছিল। তাহার পর ইহাকে কংগ্রেসের অধীন ও প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠান করা হইয়াছে।

এ বার অধিবেশনে দিনাজপুরের প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। সভাপতি পদের জন্য প্রার্থীদিগের মধ্যে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়কে পরাভূত করিয়া ডাক্তার ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত ঐ পদ লাভ করেন।

উভয়ের অভিভাষণেই বাঙ্গালার কথা ও ব্যথা বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছিল। বাঙ্গালার প্রবল সমস্যা—সন্ত্রাসবাদ ও সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি বলেন—

কংগ্রেসের সহিত যে সন্ত্রাসবাদের কোন সম্পর্ক নাই, কেবল তাহাই নহে, পরন্তু সন্ত্রাসবাদ কংগ্রেসের মূল নীতির বিরোধী। সন্ত্রাসবাদ ভারতে বিদেশাগত বলিয়া ইহা এ দেশে স্থায়ী হইতে পারে না এবং ইহা বিদেশী বলিয়াই এ দেশের মুক্তিকামীরা মুক্তিলাভের উপায়রূপে ইহা অবলম্বন করিতে পারেন না। যে সকল যুবকযুবতীর বিশ্বাস, দস্যুবৃত্তি ও হত্যার পথে মুক্তিলাভ করা যায়, তাহারা ভ্রান্ত।

যোগীন্দ্রবাবু বাঙ্গালার কংগ্রেসে দলাদলিতে বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করেন।

তিনি বলেন, প্রস্তাবিত শাসন-সংস্কারে দেশের লোকের ক্ষমতা সঙ্কোচই হইবে, এমন কি প্রস্তাবিত ব্যবস্থা বর্ত্তমান ব্যবস্থার তুলনায়ও নিন্দনীয়। এই শাসন-সংস্কার-প্রস্তাবের অনিষ্টকর ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। বিলাতের বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী মিষ্টার র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড পূর্ব্বে বহু বার বলিয়াছিলেন, সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন-ব্যবস্থা কোন সভ্য দেশের উপযোগী হইতে পারে না। কিন্তু মথুরার সিংহাসনে বসিয়া তিনি ব্রজের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। তিনিই রোয়েদাদের রচনাকারী। একান্ত পরিতাপের বিষয়, কংগ্রেসের নেতারাও এই অনিষ্টকর ব্যবস্থা সম্বন্ধে একমত হইতে পারেন নাই। কিন্তু যে সরকার এই রোয়েদাদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহা হিন্দু বা মুসলমান কোন সম্প্রদায়ের কল্যাণকর হইতে পারে না।

তাহার পর বিনাবিচারে বন্দীদিগের কথা। বাঙ্গালায় এখনও ২ হাজার ৭ শত লোক বিনাবিচারে বন্দিদশায় কালাতিপাত করিতেছেন। ইঁহারা আদালতের বিচারে দণ্ডিত হয়েন নাই। কেবল সন্দেহে লোকের স্বাধীনতা হরণ কখন সমর্থিত হইতে পারে না। এই প্রসঙ্গে তিনি বিশেষভাবে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর ও শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর কথা উল্লেখ করেন।

বাঙ্গালার আর্থিক দুর্দ্দশার কথায় যোগীন্দ্রবাবু বলেন—এই দুর্দ্দশাজনিত বেকার-সমস্যা কেবল যে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়েই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহা নহে; পরন্তু কৃষক ও শ্রমিকরাও দুরবস্থা ভোগ করিতেছে।

যোগীন্দ্রবাবুর এই উক্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কারণ, আমরা দেখিতেছি, এ দেশে অল্পসংখ্যক মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে বেকার-সমস্যা সরকারের দৃষ্টি যত আকর্ষণ করিয়াছে, বিশাল কৃষক ও শ্রমিক সম্প্রদায়ের মধ্যে বেকার-সমস্যা তত মনোযোগ আকৃষ্ট করে নাই। ইহার রাজনীতিক কারণ অবশ্যই থাকিতে পারে, কিন্তু কৃষক ও শ্রমিক সম্প্রদায়ের মধ্যে বেকার-সমস্যার প্রাবল্যে বিপদের সম্ভাবনা ও লোকের দুর্গতি অল্প নহে। এ বিষয়ে কেবল সরকারের উপর নির্ভর করাই কি জাতির কর্ত্তব্য?

সভাপতি শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত সম্মিলনের পূর্ব্ববর্ত্তী অধিবেশন হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত বাঙ্গালার রাজনীতিক ইতিহাসের আলোচনা করিয়া প্রকৃত অবস্থা দেখাইয়া দেন। তিনিও যোগীন্দ্রবাবুর মত সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের নিন্দা করেন।

ইন্দ্রনারায়ণবাবুর একটি কথা বিশেষ বিবেচ্য। তিনি বলেন—খদ্দরের উন্নতিসাধন ও প্রচলন, "অনুন্নত" সম্প্রদায়ের উন্নতিসাধন, গ্রাম্য শিল্পের পুনরুদ্ধার—এই সকল কার্য্যে কংগ্রেসের কর্ম্মিগণের উত্তম-বিভাগ অনিবার্য্য; সুতরাং সমগ্র প্রদেশে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠানগুলি সুগঠিত

করিতে হইবে এবং শ্রমিক ও কৃষকদিগের আন্দোলন সমর্থন করিতে হইবে। তিনি যে সব কার্য্যের উল্লেখ করিয়াছেন সে সকল কংগ্রেসের গঠন-কার্য্যের তালিকাভুক্ত। কংগ্রেস যত দিন কেবল রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান ছিল, তত দিন এ দিকে কংগ্রেসের দৃষ্টি পতিত হয় নাই। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলন কংগ্রেসের কার্য্য-পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত করিবার পূর্ব্বেই গঠন-কার্য্যের প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল এবং কংগ্রেসের সঙ্গে শিল্প-প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠায় সেই অনুভূতি আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। তাহার পর যখন অসহযোগ নীতি কংগ্রেস কর্ত্তৃক গৃহীত হয়, তখন রাজনীতিক কার্য্য—ব্যবস্থাপক সভাদির কায—ত্যাগ করিয়া কংগ্রেস গঠন-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করে। তখন খদ্দর উৎপাদন, সালিশে মামলা মিটান প্রভৃতি নানা কায আরম্ভ হয় এবং দেশের অজ্ঞ জনসাধারণের মনে দেশাত্মবোধ উদ্দীপন সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়। অনেকে বলেন, সেই সময়ে কংগ্রেস যে কায করিয়াছিল, তাহা অতুলনীয়। কিন্তু তাহার পর স্বরাজ্য দলের উদ্ভব ও আবার ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ। কংগ্রেস আবার রাজনীতির গোলক-ধাঁধায় প্রবেশ করে।

আজ ইন্দ্রনারায়ণবাবুর কথায় মনে হয়, বাঙ্গালায় কংগ্রেস-কর্ম্মীর সংখ্যা ও শক্তি এত অধিক নহে যে, রাজনীতিক ও গঠনমূলক কার্য্য একই সময়ে সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে। যদি তাহাই হয়, তবে আমরা গঠনমূলক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবার জন্যই কংগ্রেসকে অনুরোধ করিব। যত দিন দেশের জনসাধারণ জাতীয়ভাবে অনুপ্রাণিত না হইবে এবং যত দিন দেশের লোক মানুষের মত জীবন যাপনের সুযোগ লাভ না করিবে, তত দিন রাজনীতিক উন্নতিসাধনপ্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনাই অধিক।

রাজনীতিক অধিকারলাভের পক্ষে অন্তরায়সমূহের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার প্রসার যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার অনিষ্টকর প্রভাব দিনাজপুরে সম্মিলনের অধিবেশনেও বুঝা গিয়াছে। অধিবেশনে সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ, "জাতীয়তার বিরোধী ও গণতান্ত্রিক নীতিবিরুদ্ধ" বলিয়া, বর্জ্জনের যে প্রস্তাব হয়, তাহাতে "জাতীয়দলের" মুসলমানরাও আপত্তি করেন। কংগ্রেস হিন্দু মুসলমান মিলনের আশায় প্রলুব্ধ হইয়া মত প্রকাশ করিয়াছে—এই রোয়েদাদ গ্রহণ বা বর্জ্জন করা হইতেছে না! যাহাকে দ্বিধার পঙ্গুত্ব বলে, ইহাতে তাহাই সপ্রকাশ। সকল দেশেই দেখা গিয়াছে, গঠনমূলক কার্য্যের দ্বারাই সাম্প্রদায়িকতা দূর করা সম্ভব। যখন বিসূচিকা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া গ্রামে দেখা দেয়; যখন গ্রামে জলকষ্ট অনুভূত হয়; যখন বন্যায় লোক দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়—তখন এই সব উপদ্রবে হিন্দুমুসলমান ভেদ থাকে না, উভয় সম্প্রদায়ই সমভাবে পীড়িত হয় এবং উভয় সম্প্রদায়ের চেষ্টা ব্যতীত প্রতীকারের উপায়ও করা যায় না। সেই সমবেত চেষ্টাই সাম্প্রদায়িকতা দূর করে ও করিতে পারে। সেই জন্যও আমাদিগের পক্ষে গঠন-কার্য্যে অবহিত হওয়া অধিক প্রয়োজন।

বাঙ্গালায় কংগ্রেসকর্ম্মীদিগকে এ বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা করিতে ও বিশেষভাবে আত্মনির্ভরশীল হইতে হইবে। এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, বাঙ্গালা অন্যান্য প্রদেশের সহানুভূতি ও সাহায্য আশানুরূপ-ভাবে লাভ করিতেছে না। যখনই বাঙ্গালাকে অর্থ-সাহায্য প্রদানের প্রস্তাব হইয়াছে, তখনই ব্যবস্থা পরিষদে অন্যান্য প্রদেশের প্রতিনিধিরা তাহাতে আপত্তি জ্ঞাপন করিয়াছেন। এ বার কংগ্রেসের কার্য্যকরী কমিটীতে বাঙ্গালার কোন প্রতিনিধির স্থান হয় নাই। বাঙ্গালায় কাপড়ের কলের সংখ্যাবৃদ্ধিতে বোম্বাই বিরক্তি প্রকাশ করিতেছে। গোল টেবিল বৈঠকে অন্যান্য প্রদেশের প্রতিনিধিরা বাঙ্গালাকে বাদ দিয়া প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন লাভেও অনিচ্ছা প্রকাশ করেন নাই। আর সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদে বাঙ্গালাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

এই সকল কারণে আমরা আশা করিয়াছিলাম, এ বার প্রাদেশিক সম্মিলন বাঙ্গালার প্রাদেশিক প্রয়োজন বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিয়া কার্য্য-পদ্ধতি নির্দ্দেশের চেষ্টা করিবেন। আমাদিগের সে আশা পূর্ণ হয় নাই। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি বা সভাপতি কেহই কার্য্য-পদ্ধতি নির্দ্দেশ করেন নাই। আমরা ইহা দুঃখের বিষয় বলিয়া বিবেচনা করি।

কংগ্রেস ও প্রাদেশিক সম্মিলন যে গণ্ডীতে বদ্ধ, তাহার বাহিরে—বিশাল বাঙ্গালায় যে সব লোক আছেন,

তাঁহাদিগকে গঠনকার্য্যে সহযোগিতায় আকৃষ্ট করিবার কোন চেষ্টাও হইতেছে না। কংগ্রেসও আমলাতন্ত্রের সঙ্কীর্ণতায় প্রভাবিত হইতেছে এবং কংগ্রেসের মধ্যে দলাদলি ব্যবস্থাপক সভা ও কলিকাতা কর্পোরেশন হইতে আরম্ভ করিয়া বিদ্যালয় পর্য্যন্ত সকল প্রতিষ্ঠানে জাতীয়তার গতি প্রহত ও উন্নতির পথে বাধা স্থাপন করিতেছে। ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াও কি আমরা ইহার প্রতীকারোপায় চিন্তা করিব না?

এই সব সমস্যার সমাধান বাঙ্গালীকেই করিতে হইবে। বাঙ্গালার বয়ন শিল্পকে "খদ্দর" শিল্পের তুলনায় নিম্নস্থান দিলে চলিবে না; যে দেশে প্রাথমিক শিক্ষা আজও অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক নহে, সে দেশে বাঙ্গালীকে হিন্দী শিখিতে উপদেশ দিলে তাহাও সদুপদেশ হইবে না। বাঙ্গালাকে তাহার নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যবিষয়ে স্বাবলম্বী করিতে হইবে। এ সকল কাযের জন্য প্রাদেশিক সম্মিলন স্থায়ী ব্যবস্থা করিতে পারেন এবং তাহাতেই সম্মিলনের সার্থকতা থাকিবে।

এই সকল কারণে আমরা মনে করি, দিনাজপুরে সম্মিলনে বাঙ্গালী যাহা পাইবার আশা করিয়াছিল তাহা পায় নাই।

কলিকাতায় টেলিফোন—

কলিকাতায় টেলিফোন কোম্পানী টেলিফোনের জন্য যে টাকা আদায় করেন, তাহা অকারণ অধিক বলিয়া আন্দোলন হইতেছে। এই আন্দোলন যে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহার প্রমাণ—আন্দোলন আরম্ভ হইতেই কোম্পানীর কর্ত্তারা কলিকাতার সিটিজেন্স এসোসিয়েশনের সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদিগের লাভের অংশ হইতে বার্ষিক ২ লক্ষ টাকা ত্যাগ স্বীকার করিতে সম্মত হইয়াছেন। কিন্তু একচেটিয়া ব্যবসায়ী কোম্পানীর এই যে "ত্যাগ" ইহাকে ত্যাগই বলা যায় না। আর আন্দোলন যদি না হইত, তবে কোম্পানী "যথা পূর্ব্বং" এই ২ লক্ষ টাকাও আত্মসাৎ করিয়া চলিতেন।

কলিকাতায় টেলিফোন কোম্পানী সরকারকে একটা নির্দ্দিষ্ট টাকায় টেলিফোন ব্যবহারের অধিকার প্রদান করেন, কিন্তু সাধারণের পক্ষে অন্য ব্যবস্থা—মাসিক ভাড়া দিতে হয় ও প্রত্যেক বার "ডাকের" জন্য স্বতন্ত্র পার্ব্বণী আছে। এই ব্যবহার-বৈষম্যের কারণ কি? যদি সরকারকে নির্দ্দিষ্ট ভাড়া দিলে ক্ষতি না হয়, তবে—সাধারণকে তাহাতে বঞ্চিত করা হয় কেন?

এখন সরকার যে টেলিফোন ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে নির্দ্ধারিত টাকাই লওয়া হয় এবং সে টাকার পরিমাণ বার্ষিক ২ শতও নহে। আর কলিকাতা টেলিফোন কোম্পানীর বার্ষিক ভাড়াই ১ শত ৪৪ টাকা।

বোম্বাইয়েও "ডাক" অনুসারে টাকা লইবার ব্যবস্থা নাই এবং তথায় বার্ষিক দেয় কিস্তি হিসাবেও দেওয়া চলে। মাদ্রাজেও টেলিফোন কলিকাতার মত ব্যয়বহুল নহে। কলিকাতাবাসীরা যে কেবল অধিক টাকা দিতেই বাধ্য হয়, তাহা নহে; পরন্তু সহযোগী 'কমার্শাল গেজেট' দেখাইয়া দিয়াছেন, "ডাকের" সংখ্যা নির্দ্ধারণ নির্ভুল হইবেই, এমনও বলা যায় না। ইহা সত্য হইলে অবশ্যই মনে করা যাইতে পারে—যিনি যত বার টেলিফোন ব্যবহার করেন, তাঁহাকে তদপেক্ষা অধিক বার ব্যবহারের জন্য টাকা দিতে হইতেও পারে।

যে সব প্রতিষ্ঠানে জনসাধারণের প্রয়োজন সিদ্ধ হয় সে সকলকে ইংরাজীত public utility concern বলে। সে সকলে অতিরিক্ত ও অসঙ্গত লাভ করা নীতি-বিরুদ্ধ। কিন্তু কলিকাতা বিদ্যুৎ সরবরাহ কর্পোরেশনে ও কলিকাতায় টেলিফোন কোম্পানীতে এই নীতি যে অনায়াসে লঙ্ঘিত হইতেছে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। এই দুই কোম্পানীই বিলাতে গঠিত; সুতরাং ইহার লভ্যাংশ—প্রায় সবই—বিদেশে যায়। তদ্ভিন্ন এই কোম্পানী দুইটিতে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস হইতে অবসরপ্রাপ্ত লোক কর্তৃত্ব করেন। তাঁহাদিগের সহিত এ দেশে সরকারের কর্ম্মচারীদিগের ঘনিষ্ঠতার সুবিধা যে লোকের মনে সন্দেহের উদ্ভব করিতে পারে, ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

আজ আমরা কলিকাতায় টেলিফোন কোম্পানীর আদায়ের আধিক্যেরই আলোচনা করিলাম। আমরা এই কোম্পানীর আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করিয়া প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ লাভের অঙ্ক দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি। লাভ যদি public utility concernএর পক্ষে উপযুক্ত হয়, তবে যে টেলিফোন ব্যবহারকারীরা দেয় টাকার অন্ততঃ শতকরা ২৫ টাকা হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন, তাহাতে আমাদিগের সন্দেহ নাই।

সরকার যে ক্ষেত্রে কোন public utility concernকে একচেটিয়া ব্যবসার অধিকার প্রদান করেন, সে ক্ষেত্রে যাহাতে সেই প্রতিষ্ঠান অকারণ, অসঙ্গত লাভ করিতে না পারেন, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা সরকারেরও কর্ত্তব্য।

টেলিফোন কোম্পানীর ব্যবহার সম্বন্ধে যে আন্দোলন আরব্ধ হইয়াছে, তাহাতে সরকার লোকমতের মর্য্যাদা কিরূপ রক্ষা করেন, তাহা অবশ্যই দেখিবার বিষয়। আমরা আশা করি, সরকারকে এ বিষয়ে তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আর কোন কথা বলিবার প্রয়োজন হইবে না।

কলিকাতার মেয়র ও ডেপুটী মেয়র—

মৌলবী ফজলুক হক ও শ্রীযুক্ত সনৎকুমার রায় চৌধুরী যথাক্রমে কলিকাতার মেয়র ও ডেপুটী মেয়র নির্ব্বাচিত

মেয়র—মৌলবী ফজলুল হক

হইয়াছেন। আমরা তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিতেছি। কয় বৎসর কলিকাতার মেয়র নির্ব্বাচনে যে লজ্জাজনক ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহাতে এবার নির্ব্বিবাদে নির্ব্বাচনে সকলেই সন্তোষলাভ করিবেন।

হক সাহেব গতবার প্রথমে নির্ব্বাচিত হইলে মন্ত্রী সার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় সে নির্ব্বাচন বাতিল করিয়া

ডেপুটী মেয়র—শ্রীযুক্ত সনৎকুমার রায় চৌধুরী

দিয়াছিলেন। এবারেও তাঁহার নির্ব্বাচনের পর একজন ব্যতীত আর সব য়ুরোপীয় কাউন্সিলার সভাস্থল ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। সহযোগের, শিষ্টাচারের ও বহুমতের মর্য্যাদা রক্ষার এই বিস্ময়কর ব্যতিক্রম সত্য সত্যই লজ্জার বিষয়।

বাঙ্গালী অধ্যাপকের সম্মান—

আন্নামালাই ইউনিভার্সিটির রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক ডক্টর সত্যেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী সিণ্ডিকেট কর্ত্তৃক অস্থায়ী ভাইস-চ্যান্সেলার নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

ডক্টর চক্রবর্ত্তী লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে B. Sc. এবং M. Sc.তে ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট হন এবং U. P. গভর্ণমেণ্টের স্কলারশিপ লইয়া বিলাতে (অক্সফোর্ডে) গমন করেন এবং

তথা হইতে সসম্মানে ডক্টরেট উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯২৯ সালে আন্নামালাই ইউনিভার্সিটিতে রসায়ন শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। তিন বৎসর পূর্ব্বে তিনি সায়েন্স ফ্যাকালটির ডিন্ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি মাত্র একজন বাঙালী

সপরিবারে ডাঃ এস এন চক্রবর্ত্তী

অধ্যাপক। তাঁহার বয়স এখন মাত্র ৩১ বৎসর। আমরা তাঁহার দীর্ঘ জীবন ও উন্নতি কামনা করি।

ভারত সম্রাটের রজত-জুবিলী—

ভারতের সর্ব্বত্র—নগরে, সহরে, গ্রামে, এমন কি ক্ষুদ্র পল্লীতেও ভারত-সম্রাট মহামান্য শ্রীল শ্রীযুক্ত পঞ্চম জর্জ্জ মহোদয়ের রাজত্ব কাল ২৫ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় বিগত ৬ই ও ৭ই মে তারিখে আনন্দোৎসব হইয়া গেল। বাঙ্গালা দেশের জনসাধারণ ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিল। কলিকাতা সহরে ৬ই তারিখে পূর্ব্বাহ্ণে সহরের সমস্ত দেবস্থানে সম্রাটের মঙ্গলকামনায় যাগযজ্ঞ পূজা অনুষ্ঠিত হয়, অনেক সংকীর্ত্তনের দল নগর পরিভ্রমণ করেন, সমস্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে জলযোগ করান হয়। মধ্যাহ্নে গড়ের মাঠে পঞ্চাশ হাজারের উপর দুঃখী কাঙ্গালীকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করান হয়। সন্ধ্যার পর হইতে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত সমগ্র সহর আলোকমালায় সুসজ্জিত হয়; স্বয়ং গবর্ণর বাহাদুর এই উৎসবে যোগদান করিবার জন্য ৬ই তারিখে দারজিলিং হইতে কলিকাতায় আগমন করিয়াছিলেন। ৭ই তারিখেও সহরময় আলোক সজ্জা করা হয়, কুচকাওয়াজ হয় এবং সন্ধ্যার পর ময়দানে বাজি পোড়ানো হয়। এই উপলক্ষে সম্রাট মহোদয় নিম্নলিখিত বাণী ঘোষণা করিয়াছেন—"আমি আর যে কয় বৎসর বাঁচিয়া থাকিব সে কয় বৎসরের জন্য নূতন করিয়া তোমাদিগের (অর্থাৎ প্রজাদিগের) সেবায় আত্মনিয়োগ করিলাম।"

করাচী ও ফিরোজাবাদ—

অল্প দিনের ব্যবধানে করাচীতে ও ফিরোজাবাদে যে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহাতে বলিতে হয়—যত দিন সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থার শেষ চিহ্ন পর্য্যন্ত মুছিয়া ফেলা না হইবে, তত দিন ভারতে জাতীয়তার বিস্তারসাধনের আশা নাই।

নাথুরাম নামক এক ব্যক্তি তাহার লিখিত ইস-লামের ইতিহাসে মুসলমানদিগের ধর্ম্মবিশ্বাসের গ্লানিকর রচনা প্রকাশের অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া আদালতের

বিচারে দণ্ডিত হয়। নাথুরাম আপীল করে এবং যে সময় সে আপীল শুনানীর জন্য আদালতে উপস্থিত ছিল, তখন আবদুল কায়েম নামক এক জন মুসলমান তাহাকে হত্যা করে। বিচারে কায়েমের প্রাণদণ্ডাদেশ হইলে তাহার পক্ষ হইতে দণ্ডাদেশ রদ করিবার জন্য আপীল হয় ও তাহার প্রার্থনা না-মঞ্জুর হয়। তাহার প্রার্থনা পূর্ণ হয় নাই, এই সংবাদ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রাদিতে উত্তেজক আন্দোলন আরম্ভ হয়। গত ৪ঠা মার্চ্চ তাহার ফাঁসী হইবার কথা ছিল। হাঙ্গামার আশঙ্কায় সেই দিন ফাঁসী স্থগিত করা হয়। কিন্তু সেই দিন মুসলমানদিগের ব্যবহার দেখিয়া সরকার বুঝিতে পারেন—হাঙ্গামা ঘটিবার সম্ভাবনা প্রবল। শেষে ১৯শে মার্চ্চ প্রত্যূষে তাহার ফাঁসী হয় এবং পূর্ব্বস্থিরীকৃত ব্যবস্থানুসারে তাহার শব তাহার আত্মীয়দিগকে দেওয়া হয়। কথা ছিল, আত্মীয়রা তখনই শব কবরস্থ করিবে।

ইহার পর মুসলমান জনতা কবর হইতে শব তুলিয়া লইয়া সহরে প্রবেশ করে। তাহারা এমন উচ্ছৃঙ্খল হয় যে, সরকারী কর্ম্মচারীরা গুলী চালাইয়া জনতা ছত্রভঙ্গ করিতে বাধ্য হয়েন।

এরূপ ঘটনা নূতন নহে। কলিকাতাতেও যে মুসলমান অন্য প্রদেশ হইতে আসিয়া এক জন হিন্দু পুস্তকের দোকানের অধিকারীকে হত্যা করে—তাহাকেও কতকগুলি মুসলমান "ধর্ম্মবীর" বলিয়া প্রচার করে। এমন কি সেই ব্যক্তির প্রাণরক্ষার জন্য কতিপয় শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত মুসলমান গভর্ণরকে অনুরোধ করিতেও দ্বিধা বোধ করেন নাই। কিরূপে অন্য প্রদেশ হইতে এই মুসলমানকে কলিকাতায় আনা হইয়াছিল, তাহা প্রকাশ পায় নাই। কুলকাটীর গুলী চালান ব্যাপারে যেমন, এই মুসলমান হত্যাকারীর প্রাণদণ্ডেও তেমনই মুসলমানরা বিশেষ চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই তাঁহারা অপরাধী মুসলমানদিগের কার্য্যের নিন্দা করেন নাই। করাচীর ঘটনায় মুসলমান জনতার ব্যবহার যে শৃঙ্খলার বিরোধী, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অথচ মুসলমান-দিগের কাহারও কথায় তাহাতে দুঃখ প্রকাশ নাই! এই কলিকাতায় মুসলমানদিগের একখানি সংবাদপত্র আছে। বাঙ্গালা সরকারের শাসন পরিষদের এক জন সদস্যের সহিত তাহার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ এবং এক জন ইংরাজ তাহার সম্পাদক। এই পত্রে করাচীর ব্যাপার সম্পর্কে এক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে লিখিত হইয়াছে:—"মুসলমান, সাধারণ হিসাবে যত মন্দ বা যত কাপুরুষই কেন হউক না, সে পয়গম্বরকে আক্রমণ এক মুহূর্ত্তের জন্যও সহ্য করিবে না। সে নিন্দাকারীকে সংহার করিতে চাহিবে (He will want to kill the blasphemer)।"

অথচ বলা হয়, জীবনের পরিবর্ত্তে জীবননাশও বর্ব্বর যুগের মনোভাবের অভিব্যক্তি!

করাচীতে সরকারী কর্ম্মচারীরা যে বাধ্য হইয়া গুলী চালাইবার আদেশ দিয়াছিলেন, তাহার প্রতিবাদে মুসলমান-সমাজ মুখর হইয়া উঠিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা কেহই বলিতেছেন না—উগ্র জনতা অন্যায় করিয়াছিল। নিহত হিন্দুর জন্য তাঁহারা কোনরূপ সহানুভূতি প্রকাশ করেন নাই।

কোন ধর্ম্মের বা ধর্ম্মপ্রচারকের সম্বন্ধে অপ্রিয় কথা বলিয়া কাহারও মনে বেদনা দেওয়া সমর্থনযোগ্য নহে। কিন্তু যদি কেহ তাহা করেন, তবে তাঁহাকে হত্যা করিতে হইবে—এ কথাও কখন সমর্থন করা যায় না। কোন ধর্ম্মগুরুর সম্বন্ধে ঐতিহাসিক আলোচনায় যদি লেখক তাঁহার কোন ব্যবহারের ত্রুটি দেখান, তাহাতে ধর্ম্মগুরুর গৌরব নষ্ট হয় না। বিলাতে ঐতিহাসিক গিবন ও মিষ্টার ওয়েলস মুসলমানদিগের ধর্ম্মগুরুর সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা মুসলমানরা প্রত্যাহৃত করাইতে পারেন নাই এবং তাহাতে যে ধর্ম্মগুরুর সম্ভ্রম নষ্ট হইয়াছে, এমনও নহে। বাঙ্গালী কবি মহম্মদকে "আরবের মরুভূমে অমৃত-নির্ঝর"ও বলিয়াছেন। তিনি যে সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই সময়ের সামাজিক আদর্শেই তাঁহার কার্য্যের বিচার করিতে হয়।

কোন ধর্ম্ম বা ধর্ম্মগুরুর সম্বন্ধে সংযতভাবে মত প্রকাশের অধিকার যে লোকের আছে ও থাকা সঙ্গত, তাহা আমরা অবশ্যই বলিব।

স্ব স্ব ধর্ম্মানুষ্ঠানের অধিকারও সকলের আছে; কেবল কেহ যেন নিজ কর্ম্মানুষ্ঠানে অকারণে অপরের মনে ব্যথা বা ধর্ম্মাচরণে বাধা না দেন। কিন্তু মসজেদের সম্মুখে বাদ্য লইয়া একদল মুসলমান যে অপ্রীতিকর ভাবের উদ্ভব করিয়াছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই।

ফিরোজাবাদে গত রামনবমীর দিন মুসলমান জনতা হিন্দুদিগের উপর অকারণে অত্যাচার করিয়াছে। এক জন ডাক্তারের গৃহে অগ্নিযোগ করিয়া তাহারা ১১ জন লোককে অগ্নিদাহে সংহার করিয়াছে। এইরূপ পৈশাচিক নৃশংসতার পরিচয় সচরাচর পাওয়া যায় না।

উভয়ক্ষেত্রেই সরকারের কর্ম্মচারীদিগের ব্যবহার—বিশেষ, তাঁহাদিগের ব্যাপারের গুরুত্বানুভবে অক্ষমতার নিন্দা হইতেছে। আমরা সে সম্বন্ধে আজ কোন আলোচনা করিব না। তবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, সাম্প্রদায়িকতার উগ্র বিকাশ যখন দেশকে সসজ্জ শিবিরে পরিণত করে, তখন সতর্কতাবলম্বন অবশ্যকর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়ায়।

কিন্তু কেন এমন হয়? যে স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে এক দিন দিল্লীর মুসলমানরা সাহজাহানের জুম্মা মসজেদের বেদীতে আসন গ্রহণের অধিকার দিয়াছিল, মুসলমান আততায়ীর হস্তে তাঁহার মৃত্যু হইতে করাচীতে নাথুরামের হত্যা ও ফিরোজাবাদে ডাক্তার জীবরামের গৃহে একাদশ জন লোককে পুড়াইয়া মারা পর্য্যন্ত হিসাব করিলে ধর্ম্মান্ধ মুসলমানদিগের হস্তে হিন্দুর মৃত্যুতালিকা কিরূপ দাঁড়ায়?

এক দিকে সাম্প্রদায়িকতা বর্জ্জন করিয়া জাতীয়তার অনুশীলন করিবার কথা প্রচারিত হইতেছে, আর এক দিকে এইরূপে হিন্দুর মতপ্রকাশে ও ধর্ম্মাচরণে বাধা প্রদত্ত হইতেছে—ইহা যে একান্ত পরিতাপের বিষয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। মুসলমানরা যে সময় প্রথম স্বতন্ত্র অধিকার চাহিয়া লর্ড মিণ্টোর দরবারে প্রার্থনা পেশ করেন, তখন তাঁহারা বলিয়াছিলেন—এ দেশে মুসলমানদিগের গুরুত্ব যেন তাঁহাদিগের সংখ্যানুসারে স্থির না করিয়া তাঁহাদিগের রাজনীতিক প্রভাবানুসারে নির্দ্ধারিত হয়। এই রাজনীতিক প্রভাব বর্দ্ধিত করিবার জন্য যে চেষ্টা হইতেছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। যোগ্যতার স্থানে যখনই সাম্প্রদায়িকতার আদর করা হয়, তখনই জাতীয়তার স্থানে সাম্প্রদায়িকতার প্রতিষ্ঠা অনিবার্য্য। দুঃখের বিষয়, এ দেশে কংগ্রেসের মত প্রতিষ্ঠানও কৃত্রিম ঐক্য প্রদর্শন জন্য সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থার সমর্থন করিয়াছিলেন এবং তাহার পর হইতে ইংরাজ শাসক ও রাজনীতিকরা সেই পথের পথিক হইয়াছেন।

এখন সমস্যা এত প্রবল হইয়াছে যে, দেশের কল্যাণকামী মাত্রকেই এ বিষয়ে মনোযোগ দিতে হইবে। মুসলমানদিগের সাম্প্রদায়িক ভাব যে কংগ্রেসে হিন্দুদিগকেও বিলাতের প্রধান মন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ "গ্রহণও করি না—বর্জ্জনও করি না"—বলিতে প্ররোচিত করিয়াছে, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? যত দিন যাইতেছে এবং হিন্দুরা যত ত্যাগ স্বীকার করিতে সম্মত হইতেছেন, ততই মুসলমানদিগের সাম্প্রদায়িকতার বিকাশ প্রবল হইতেছে। করাচীতে ও ফিরোজাবাদে সাম্প্রদায়িকতার ও ধর্ম্মান্ধতার বিকট মূর্ত্তি দেখিয়াও কি এ দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা নির্ভীকভাবে এই শোচনীয় অবস্থার প্রতীকারচেষ্টা করিবেন না?

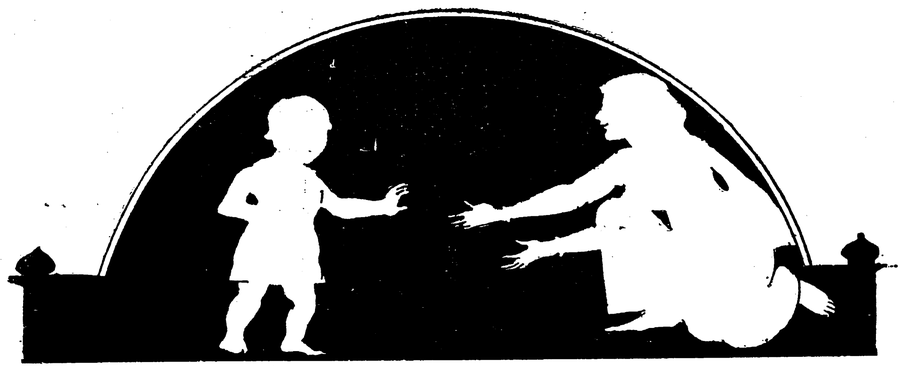

খেলাধূলা

অল্ ইণ্ডিয়া রিগাটা ঃ

বালীগঞ্জ লেকে তৃতীয় অল্ ইণ্ডিয়া রিগাটা হয়ে গেছে। এই প্রতিযোগিতার প্রথম অনুষ্ঠান পুনায় ১৯৩৩ সালে ও দ্বিতীয় অনুষ্ঠান মাদ্রাজে ১৯৩৪ সালে হয়। তৃতীয় অনুষ্ঠানে, কলিকাতা রোয়িং ক্লাব (ইয়োরোপীয়), লেক ক্লাব (ভারতীয়), মাদ্রাজ বোট ক্লাব (ইয়োরোপীয়) ও বেঙ্গল ইউনিভারসিটি বোট ক্লাব (ভারতীয়) যোগদান করেছিলেন।

ওয়েলিংডন ট্রপী—

কলিকাতা রোয়িং ক্লাব ৩ মিনিট ১৫ সেকেণ্ডে (রেকর্ড সময়) মাদ্রাজ বোট ক্লাবকে হারিয়ে জয়ী হয়েছে।

পরাজিত দলের মধ্যে একটি রেস হয়। তাতে লেক ক্লাব ৩ মিনিট ৩১ সেকেণ্ডে রেঙ্গুন ইউনিভারসিটি বোট ক্লাবকে হারিয়েছে।

সিঙ্গল রেস—(ম্যাক্‌লিন্ রূপার ছোট হাল)—

আর্ এইচ্ পি ডানকান্ (কলিকাতা রোয়িং ক্লাব) ৩ মিনিট ৩৪½ সেকেণ্ডে আর্ পি চন্দকে (লেক ক্লাব) হারিয়ে জিতেছেন।

ডবল রেস—(ভেনেবল্‌স্ 'বোল্' ট্রপী)—

এ লতিফ্ ও এ সেনগুপ্ত (লেক ক্লাব) আর্ জে এল্ ওকেলে ও ডি এফ্ ম্যাক্‌মিলনকে (কলিকাতা রোয়িং) ৩ মিনিট ৩২½ সেকেণ্ডে সিকি লেংথে হারিয়ে জয়ী হয়েছেন।

ডুমাইনি ট্রপী—এই প্রতিযোগিতা কলিকাতা রোয়িং ক্লাবের মধ্যেই হয়ে থাকে। ফাইনাল খেলা লুরিস্ ক্রু বনাম ব্লাণ্ডস্ ক্রুদের মধ্যে হয়েছিল। ব্লাণ্ডস্ দল অতি সহজে ৩ মিনিট ২৯½ সেকেণ্ডে জয়ী হয়েছে।

ওয়েলিংডন রোয়িং 'ট্রপী' বিজেতা—কলিকাতা রোয়িং ক্লাব। নাবিকগণ—ফ্রগ্‌লে, ফুচ্, ওক্‌লে, ম্যাক্‌মিলন ও হার্ডিং ছবি—ডি চট্টোপাধ্যায়

রেঙ্গুন ইউনিভারসিটি দল। ইঁহারা লেক ক্লাবের নিকট পরাজিত হয়েছেন ছবি—দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়

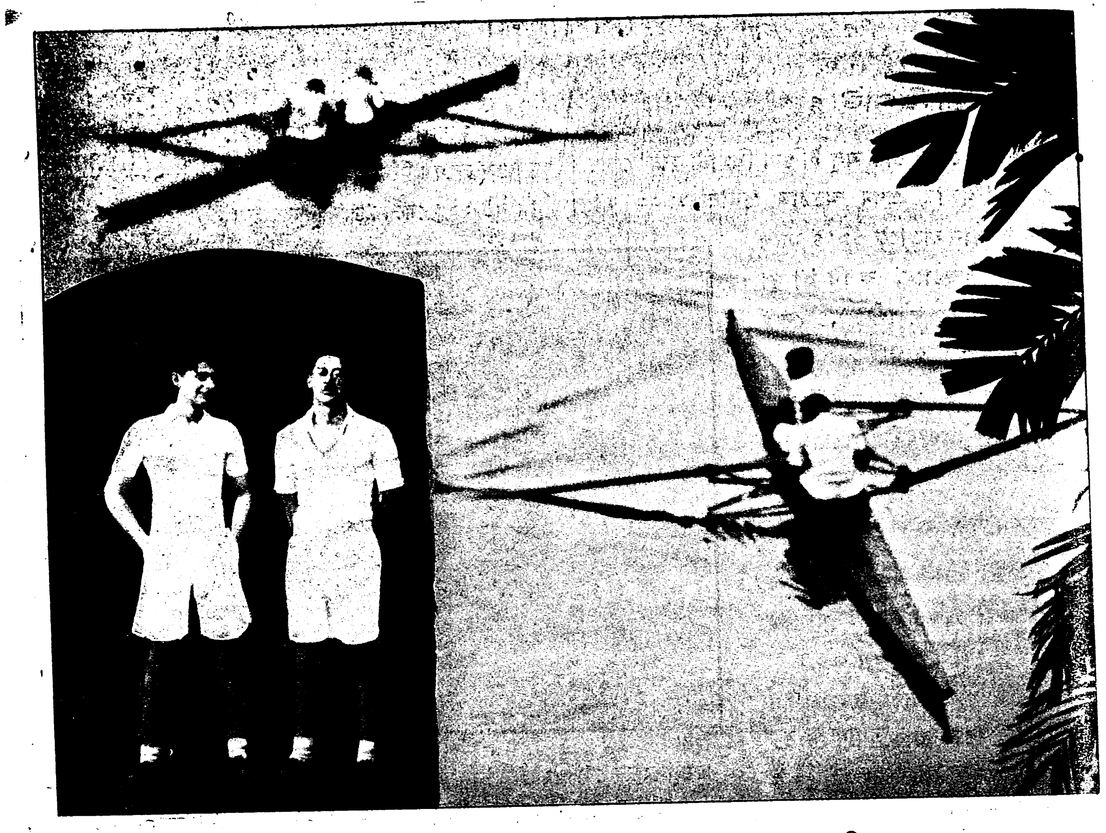

(বামে) এ সটিক, (ডাইনে) এ সেনগুপ্ত

লেক ক্লাব ডবল রেসে জয়ী হচ্ছেন

ছবি—দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়

ওয়েলিংডন রোয়িং ট্রপীর শেষ। অল্ ইণ্ডিয়া রিগাটায় কলিকাতা রোয়িং ক্লাব মাদ্রাজ বোট ক্লাবকে ৩ মিনিট ১৫½ সেকেণ্ডে হারিয়েছেন

ছবি—দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়

বাইটন্ কাপ্ ঃ

লীগে তৃতীয় স্থান অধিকারী কাষ্টম্স্ দল এবার বি এন আর রেজিমেণ্টের সঙ্গে প্রথম দিন বিনা গোলে ড্র করে দ্বিতীয় দিনে ২-১ গোলে হারিয়ে বাইটন্ কাপ্ বিজয়ী হয়েছেন। ইঁহারা এ পর্য্যন্ত পনেরবার ফাইনালে উঠেছেন, এবং দশবার বিজয়ী হয়েছেন।

কাষ্টম্স্ দল রাজপুতকে ৩-০, জামসেদপুরকে ৪-০, দিল্লী ইণ্ডিপেন্ডেণ্টের সঙ্গে ওয়াক্ ওভার পেয়ে, কম্বাইণ্ড টেলিগ্রাফকে ৩-০, ই আই আরকে ১-০ গোলে হারিয়ে ফাইনালে উঠেন।

বি এন আরও দ্বিতীয় রাউণ্ড থেকে খেল্‌তে আরম্ভ করে—সেণ্ট জোসেফকে ৩-০, কানপুরকে ৫-০, মান্দ্রাজকে ৪-০, দিল্লী ইয়ংস্‌কে ৩-২ গোলে হারিয়ে ফাইনালে পৌছান। ফাইনালে বি এন আর দুর্ভাগ্য বশতঃ হেরে গেছেন। তাঁরাই প্রথম গোল করেন এবং গোল করবার আরো কয়েকটি সুযোগ নষ্ট করেন। কাষ্টম্স্ দ্বিতীয়ার্দ্ধে দু' মিনিটে দু'টি গোল করে বিজয়ী হয়েছে। শেষের দিকে দু' পক্ষই অনেক গোলের সুযোগ নষ্ট করেছেন।

লীগ বিজয়ী মোহনবাগান চতুর্থ রাউণ্ডে ই আই আর দলের কাছে ৩-১ গোলে হেরে গেছেন। খাঁ ও দেব দু'জনে

মিসেস্ লে ব্রক্ বিজয়ী কাষ্টম্সের ক্যাপ্টেন্‌কে বাইটন্ কাপ্ প্রদান করছেন ছবি—ডি চট্টোপাধ্যায়

বাইটন্ কাপ্ বিজয়ী কাষ্টম্স্ দল

বাইটন্ কাপের চতুর্থ রাউণ্ডে মোহনবাগানের খাঁর 'সট্' ই আই আর গোলকিপার আশ্চর্য্যরূপে বাঁচাচ্ছে

ছবি—দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়

অন্ততঃ পক্ষে তিনটি অব্যর্থ গোল নষ্ট করেছিলেন। বিজিত পক্ষে সেণ্টার হাফ পি সেন খুব ভাল খেলেছেন। তার জন্যে আর কার বিশেষ সুবিধা করতে পারছিলেন না। মোহন-বাগানই প্রথম গোল করেন। দ্বিতীয়ার্দ্ধে রেল দল ঐ গোল শোধ করেন।

খাঁ ও দেব বহুবার বিপক্ষ ব্যূহ ভেদ করেও গোল করতে পারেন নি। গোলের সুমুখে এসে তাঁরা কাণার মতন সট্ করতে লাগলেন—কোনটা উপর দিয়ে কোনটা গোলপোষ্টের বাইরে দিয়ে চলে যেতে লাগলো—যে সটে অবধারিত গোল হওয়া উচিত ছিল। অতিরিক্ত সময়ে দু'টি গোল করে রেলওয়ে দল বিজয়ী হয়।

গতবারের বিজয়ী রেঞ্জার্স তৃতীয় রাউণ্ডে লক্ষ্ণৌ দলের সঙ্গে ২-০ গোলে হেরে গেছে। ঢাকা স্পোর্টিং তৃতীয় রাউণ্ডে কম্বাইণ্ড টেলিগ্রাফের কাছে হেরেছে। খেলা যেরূপ হয়েছিল তাতে ঢাকা দলেরই জয়ী হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তারাও চার পাঁচটি অব্যর্থ গোল করার সুযোগ নষ্ট করায় ভালো খেলেও অবশেষে দু'টি গোলে হেরে যেতে বাধ্য হয়েছে। তাদের মধ্যে এস ঘোষ—ব্যাকে, আর সেন—হাফ্ ব্যাকে ও এ দাশগুপ্ত—ফরওয়ার্ডে সুন্দর খেলেছিলেন।

পূর্ব্ব বিজয়ীগণ :—১৯২৯—ই আই আর স্পোর্টস্ ক্লাব; ১৯৩০-৩২—কাষ্টম্স্; ১৯৩৩—ঝাঁন্সি হিরোজ, ১৯৩৪—রেঞ্জার্স।

হকি আম্পায়ার লাঞ্ছিত :

দিল্লী ইয়ং মেন্সের সঙ্গে দ্বিতীয় দিনের খেলায় পুলিস দল এক গোলে হেরে যায়। খেলায় পুলিস দল বলের চেয়ে খেলোয়াড়দের উপর বেশী লক্ষ্য দিয়েছিল। খেলার শেষে পুলিস দলের সমর্থনকারী কেহ কেহ আম্পায়ার আসফ আলিকে লাঞ্ছিত করে। মোহনবাগান ক্লাবের কর্ত্তৃপক্ষ ও বি এইচ এর কোন সভ্য আম্পায়ারকে রক্ষা করতে গিয়ে অপমানিত হয়েছিলেন। সুখের বিষয়, পুলিস কর্ত্তৃপক্ষ এসোসিয়েশনকে জানিয়েছেন যে তাঁরা বিভাগীয় ভাবে অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে শাস্তি দিবেন।

লক্ষ্মীবিলাস কাপ :

দিল্লী ইয়ং মেন্স্ ১—০ গোলে ভবানীপুরকে হারিয়ে লক্ষ্মীবিলাস কাপ্ জয় করেছেন। ইহারা বাইটন্ কাপের সেমিফাইনাল পর্য্যন্ত উঠেছিলেন। ১৯৩৩-৩৪ সালে ঝান্সী হিরোজ্ বিজয়ী ছিল।

নিউজিলাণ্ডগামী ভারতীয় হকি দল :

যে ভারতীয় হকি দল নিউ জিলাণ্ডে খেলিতে গিয়াছেন, সে দলে নিম্নলিখিত খেলোয়াড়রা আছেন—

গোল :—এন, মুখার্জ্জি ও টি বি ব্লেক্। ব্যাক্ :—

মহম্মদ হোসেন, রসিদ আহমদ ও পি দাস। হাফ্ব্যাক্ :—নেষ্টর, মাসুদ, এম জে গোপালন্ ও মোহম্মদ নাসিম। ফরওয়ার্ড :—ফারনান্ডেজ্, হরবাল সিং, রূপ্ সিং, ধ্যানচাঁদ (ক্যাপ্টেন্), এফ্ সি ওয়েল্স্, এল্ এ ডেভিডসন্ ও সাহাবুদ্দিন। ম্যানেজার—মিঃ বেরাম ডক্তর। এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার—মিঃ পি গুপ্ত।

মাদ্রাজে পৌঁছে ভারতীয় দল মাদ্রাজ প্রদেশের সম্মিলিত দলের সঙ্গে তাঁদের প্রথম ম্যাচে ৫—২ গোলে জয়ী হয়েছেন। ভারতীয় পক্ষে—রূপ সিং ২, ওয়েল্স্ ২, ধ্যানচাঁদ ১ গোল করেন। মাদ্রাজ পক্ষে—ডি'কষ্টা ও সাতুর ১টি করে গোল দেন। বাঙ্গলার এন্ মুখার্জ্জি গোলে খেলেছিলেন।

কলম্বোয় তাঁরা সিলোন ইলেভন্সের সঙ্গে দু'টি ম্যাচ খেলেন। প্রথমটিতে তাঁরা ৭—১ গোলে ও দ্বিতীয়টিতে ২১—০ গোলে জয়ী হন। বাঙ্গলার নির্ব্বাচিত খেলোয়াড়দ্বয়ের কেহই খেল্তে পাননি।

দ্বিতীয় ম্যাচে বিজয়ী দলে খেলেছিলেন ;—ব্লেক ; রসিদ আহমদ ও মোহম্মদ হোসেন ; মোহম্মদ নাসিম, মাসুদ ও গোপালম্ ; সাহাবুদ্দিন, ওয়েল্স্, ধ্যানচাঁদ, রূপ সিং ও হরবাল সিং।

সিলোন ডেলিনিউজ এই ম্যাচ সম্বন্ধে নিম্ন মন্তব্যটি করেছেন ;—

"অতুলনীয় খেলোয়াড় ধ্যানচাঁদ ও তাঁর ভাই, এঁদের সঙ্গে ফরওয়ার্ড লাইনে যোগ দিয়েছেন ওয়েলস্। এই অনবদ্য ত্রয়ী সেকালের অজেয় "তিন মাস্কেটিয়ারের" ন্যায় সিংহলকে হারিয়েছেন। এঁদের মতন সুদক্ষ ইনার্ ফরওয়ার্ড সমগ্র পৃথিবী খুঁজলেও পাওয়া যাবে না। আবার, দুই উইঙ্গের এক দিকে লঘুগতি সাহাবুদ্দিন ও অপর দিকে দীর্ঘকায় জোয়ান শ্মশ্রুবহুল শিখ হরবাল সিং আশানুরূপ খেলেছিলেন।"

নবাব মানাওয়াডার অসুস্থ হয়ে যেতে না পারায় বিখ্যাত খেলোয়াড় ধ্যানচাঁদ তাঁর স্থানে ক্যাপ্টেন ও মাসুদ ভাইস্ ক্যাপ্টেন নির্ব্বাচিত হয়েছেন। ধ্যানচাঁদ ইণ্ডিয়ান আর্ম্মি দলে নিউ জিল্যাণ্ডে গিয়াছিলেন এবং অলিম্পিক খেলাতে ১৯২৮ সালে আমষ্টর্ডাম্ ও ১৯৩২ সালে লস্ এঞ্জেলেসে খেলেছিলেন।

ভারতীয় দল নিউ জিল্যাণ্ডে ২৬টি সাধারণ ম্যাচ ও ৩টি টেষ্টম্যাচ খেলবেন। ১৫ই জুন, ক্রাইষ্ট চার্চ্চে প্রথম টেষ্ট ; ২৯শে জুন, ওয়েলিংটনে দ্বিতীয় ; ২০শে জুলাই, অক্ল্যাণ্ডে তৃতীয় টেষ্ট খেলা হবে। ৩০শে জুলাই, তাঁরা সিড্নীতে পৌঁছে নিউ সাউথ ওয়েল্সে পনের দিন থাকবেন ও অষ্ট্রেলিয়ান দলের সঙ্গে ছ'টি ম্যাচ খেল্বেন।

লক্ষ্মীবিলাস কাপ্ বিজয়ী দিল্লী ইয়ং মেন্স্

ছবি—দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়

তার পরে সিড্নী থেকে ১৩ই আগষ্ট যাত্রা করে ২রা সেপ্টেম্বর কলোম্বোয় পৌঁছাবেন।

ভারতীয় দল সিলোন ইলেভন্সের বিপক্ষে যে ২১টা গোল করেন—তার সময় ও গোলদাতার নাম :—

প্রথমার্দ্ধে—

৫ম মিনিটে	—	ওয়েল্স্	— ১ গোল
৭ম "	—	ধ্যানচাঁদ	— ২ "

১২শ মিনিটে	—	রূপ সিং	—	৩ গোল
১৫শ ,,	—	রূপ সিং	—	৪ ,,
১৬শ ,,	—	ধ্যানচাঁদ	—	৫ ,,
১৯শ ,,	—	ধ্যানচাঁদ	—	৬ ,,
২৫ ,,	—	ধ্যানচাঁদ	—	৭ ,,
২৭ ,,	—	ওয়েল্‌স্‌	—	৮ ,,

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ হকি খেলোয়াড় ধ্যানচাঁদ—
নিউ জিল্যাণ্ড গামী ভারতীয় দলের ক্যাপ্‌টেন্‌
ছবি—ভক্তকুমার ঘোষ

দ্বিতীয়ার্দ্ধে—

১ম মিনিটে	—	রূপ সিং	—	৯ গোল
৩য় ,,	—	ওয়েলস্‌	—	১০ ,,
৩½ ,,	—	ওয়েল্‌স্‌	—	১১ ,,
৬ষ্ঠ ,,	—	ধ্যানচাঁদ	—	১২ ,,
৭ম ,,	—	ধ্যানচাঁদ	—	১৩ ,,
১০ম ,,	—	হরবাল সিং	—	১৪ ,,
১৩ ,,	—	রূপ সিং	—	১৫ ,,
১৫ ,,	—	ধ্যানচাঁদ	—	১৬ ,,
১৭ ,,	—	রূপ সিং	—	১৭ ,,
২৯ ,,	—	রূপ সিং	—	১৮ ,,
২৯½ ,,	—	ওয়েল্‌স্‌	—	১৯ ,,
২৯৬ ,,	—	ওয়েল্‌স্‌	—	২০ ,,
৩১ ,,	—	ধ্যানচাঁদ	—	২১ ,,

ফুটবল লীগ ঃ

প্রথম বিভাগের লীগ খেলা ২৯শে এপ্রিল থেকে আরম্ভ হয়েছে। এবার লীগ খেলা একজন রেফারির অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। খেলার সময়ও বর্দ্ধিত করে পঁচিশ মিনিটের স্থলে ত্রিশ মিনিট করে পুরো এক ঘণ্টা খেলা হচ্ছে। এরিয়ান্স প্রথম বিভাগ থেকে না নামায় লীগে এবার বারটি দল খেলছে।

মোহনবাগান ডেভন্‌সায়ারের সঙ্গে খেলায় ২-১ গোলে জয়ী হয়েছেন। এঁদের দলে কালীঘাটের গত বৎসরের খেলোয়াড় এ রায় চৌধুরী যোগদান করায় ফরওয়ার্ড লাইন শক্তিশালী হয়েছে। কিন্তু, বিখ্যাত সেণ্টার-হাফ্‌ হামিদের খেলা এবার অনেকাংশে পড়ে যাওয়ায় হাফ্‌ ব্যাক লাইন বিশেষ শক্তিহীন হয়ে পড়েছে। সতু চৌধুরীও পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট খেলছেন। ভবানীপুরের ভূতপূর্ব্ব খেলোয়াড় এস গুঁই রাইট আউটে বেশ ভাল খেলেছেন। ডেভন্‌সায়ার, এরিয়ান্স, ও কাষ্টমসের সঙ্গে মোহনবাগান জিতলেও খেলায় বেশ উৎকর্ষতা ও সকল বিভাগে যোগ্যতা দেখাতে পারেন নি। তাঁদের খেলা আরো উন্নত করতে হবে লীগে যদি তাঁরা প্রশংসনীয় স্থান অধিকার করতে চান। ডেভন্স ও মোহনবাগানের খেলায় রেফারি দু'পক্ষে দু'টী

পেনালটি দেয়। অথচ ডেভন্সের ব্যাকের হ্যাণ্ডবল হ'লে রেফারি অতি নিকটে থাকা সত্ত্বেও তা দেখেন নি। এস আমেদ রেফারি ছিলেন। সে দিন রেফারিংএ অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি লক্ষিত হয়েছিল।

ইষ্টবেঙ্গল দল তাঁদের চিরাচরিত প্রথানুসারে এবারও বাইরে থেকে খেলোয়াড় সংগ্রহ করেছেন। দক্ষিণ-আফ্রিকা-প্রত্যাগত তিন জন নামকরা খেলোয়াড়, লক্ষ্মীনারায়ণ, রামানা ও মীর হোসেনকে দলভুক্ত করায় তাঁরা বেশ শক্তিশালী হয়েছেন বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু প্রথম খেলায় কলিকাতার সঙ্গে ৩-১ গোলে হেরে গিয়ে সকলকে হতাশ করেছেন। প্রত্যাগত বিখ্যাত সেণ্টার-হাফ অখিল আমেদকে পেয়েছেন; কিন্তু সামাদ ও তাঁদের নামজাদা ব্যাক আনোয়ারকে হারিয়েছেন। কালীঘাটের সঙ্গে তাঁরা হারতে হারতে নিতান্ত বরাত জোরে কালীঘাটের গোলরক্ষকের কৃপা বা গাফিলতিতে শেষ সময়ে ড্র করতে সক্ষম হন। এরিয়ানের কাছে ৩-১ গোলে হেরে গিয়ে সমর্থনকারীদের মনস্তাপ দিয়েছেন। এরিয়ান খুব ভাল খেলেছিল, স্কোর ডবল করতে পারতো, তারা অনেক সুযোগ নষ্ট করেছে। এরিয়ান যদি এ রকম খেলা রাখ্‌তে পারে তবে এবার আর তাদের নাম্‌বার ভয় থাকবে না।

ব্লাক্‌ওয়াচের শক্তি সম্বন্ধে এখনও কিছু নিশ্চিত করে

জুবিলী আন্তর্জ্জাতিক খেলায় বিজয়ী ভারতীয় দল ছবি—দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়

বলা যায় না। তবে মনে হয় এই দলই এবার লীগ বিজয়ী হবে। জুবিলীর দিনে তারা ডালহৌসীকে ৭-১ গোলে পরাজিত করে তাদের শক্তির পরিচয় দিয়েছে। ডেভিসের মতো গোলরক্ষককে সাত সাতবার পরাজিত করা নিতান্ত তুচ্ছ ব্যাপার নয়। কিন্তু কাষ্টম্‌সের নিকট ১-০ গোলে হেরে যাওয়ায় তাদের উপরও বিশ্বাস করা যায় না।

অনেক সুযোগ পেয়েও বাঙ্গালোর ফরওয়ার্ডরা গোল করতে পারেন নি। মহমেডান স্পোর্টিংএর সঙ্গে খেলায় তাঁরা সত্য সত্যই মন্দভাগ্য ছিলেন। প্রায় পুরো সময় ভাল খেলেও অপ্রত্যাশিত ভাবে ২-০ গোলে হেরে গেলেন। এ দিনের খেলায় প্রকৃত পক্ষে তাঁদের জয়ী হওয়া উচিত ছিল। তাঁদের সেণ্টার হাফ্‌ নুর মহম্মদ চমৎকার খেলেছিলেন।

মহমেডান স্পোর্টিং কাষ্টমস্‌কে ৫-০ গোলে, ইষ্টবেঙ্গলকে ২-০ গোলে হারিয়েছেন। এবারও লীগ বিজয়ী হতে হলে তাঁদের আরো উৎকৃষ্ট খেলতে হবে। তাঁরা দক্ষিণ-আফ্রিকা-

জুবিলী ইণ্টার—ন্যাশনাল ফুটবল ঃ—

জুবিলী উৎসব ফণ্ডের সাহায্যার্থ ৪ঠা মে ইণ্ডিয়ান বনাম ইয়োরোপীয়ান আন্তর্জ্জাতিক খেলা হয়েছিল।

কিন্তু খেলায় তেমন জনসমাগম হয়নি। তিন দিকের গ্যালারীই খালি পড়ে ছিল। কিন্তু দুর্গপ্রাকারের উপর বহু লোক সমাগত হয়েছিল। বিশেষতঃ দুই টাকা মূল্যের রিজার্ভ আসনে অতি অল্পসংখ্যক ইয়োরোপীয়ানকে দেখা গিয়াছিল। রাজার জুবিলী ফণ্ডের সাহায্যে তাঁদের এরকম উদাসীনতা নিতান্তই আশ্চর্য্যের বিষয়। অন্যান্য বৎসর এই খেলায় বেশ জনাগম হয়ে থাকে এবং চ্যারিটি ফণ্ডে বেশ মোটা টাকা সংগৃহীত হয়।

ভারতীয় দল ৩-১ গোলে ইয়োরোপীয় দলকে পরাজিত করেছে। ভারতীয় দলের মধ্যে নুর মহম্মদ, নির্ম্মল ঘোষ ও রহমত সর্ব্বোৎকৃষ্ট খেলেছে। নুর মহম্মদের খেলার তুলনা হয় না। নির্ম্মল ঘোষের নির্ব্বাচনে নানা মতান্তর হয়েছিল, কিন্তু ভালো খেলে নির্ম্মল সকলের মুখই বন্ধ করে দিয়েছে। প্রথমেই সে পায়ে আঘাত পায়। আহত পায়েও যেরূপ সুন্দর খেলেছে পূর্ব্বের বহু নামকরা খেলোয়াড়রাও সে রকম খেলতে পারতেন না। নির্ম্মল অমন সুন্দর নিখুঁতভাবে প্রত্যেক বলটি সেণ্টারে ফরওয়ার্ডদের সামনে জুগিয়ে দিয়েছে যাতে অক্লেশে গোল হয়। ক্যাপ্‌টেন সামাদ একেবারেই খেলতে পারে নি। ব্যাকে এস মজুমদার বেশ খেলেছিল।

ইয়োরোপীয় দলে গোলরক্ষক আর্ম্মষ্ট্রংই সকলের চেয়ে ভালো খেলেছে। তার খেলার জন্যে অনেক গোল বেঁচে গেছে। লেফ্‌ট্ ইন্ ক্যান্‌টনি ফরোয়ার্ডদের মধ্যে ভালো খেলেছে। ব্রাউটন যদিও ঐ একমাত্র গোলটি করেছে, কিন্তু খেলায় তেমন দক্ষতা দেখাতে পারে নি।

রেফারিং বেশ মজার হয়েছে। রেফারির চাল-চলন হাব-ভাব বিশেষ উপভোগ্য হয়েছিল। প্রত্যেক বাঁশীর সঙ্গে অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা কি দোষের জন্যে ফাউল দিয়েছেন তা' দেখিয়ে দিচ্ছিলেন। তিনি বেশ যত্ন ও কষ্ট সহকারে খেলা পরিদর্শন করেছিলেন, তথাপি দু' একটি ত্রুটি হয়েছে। লক্ষ্মীনারায়ণের সুন্দর গোলটি যে কি

জুবিলী খেলায় বিজিত ইয়োরোপীয় দল ছবি—দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়

কারণে বাতিল হ'লো তা' তিনি ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারলে না। ভুল অফ্‌সাইড দিয়ে ভারতীয়দের একটি অব্যর্থ গোল নষ্ট করে দিয়েছিলেন, যদিও 'ড্রপ্' দিয়ে নিজের ভুল সংশোধন করেছিলেন। সান্ত্বনার বিষয় এইটুকু যে তাঁর ত্রুটি ছিল নির্দ্দোষ—ইচ্ছাকৃত নহে।

ভারতীয় দলঃ—পি ব্যানার্জ্জি (হাওড়া); এস্ দত্ত (মোহনবাগান) ও এস মজুমদার (এরিয়ান); নাসিম (ইষ্টবেঙ্গল), নুর মহম্মদ (ইষ্টবেঙ্গল), অখিল আহমদ (মহমেডান স্পোর্টিং); এন্ ঘোষ (স্পোর্টিং ইউনিয়ন), লক্ষ্মীনারায়ণ (ইষ্টবেঙ্গল), রসিদ (মহমেডান), রহমত (মহমেডান) ও সামাদ (ক্যাপ্‌টেন্—ই বি আর)

ইয়োরোপীয় দলঃ—আর্ম্মষ্ট্রং (ক্যালকাটা); পটস্ (ক্যালকাটা) ও ম্যাক্‌ফারলেন (ব্লাকওয়াচ); হায়্‌পার্ (ডেভন্স), গোল্ড (ক্যাপ্‌টেন্—ক্যালকাটা) ও হায়্‌সাল (ব্লাকওয়াচ); সি ব্রাউটন (ডালহৌসী), রিচি (ব্লাকওয়াচ), ডবসন্ (ডালহৌসী), ক্যান্‌টনি (ব্লাকওয়াচ) ও ষ্টুয়ার্ট (ব্লাকওয়াচ)

রেফারিঃ—কামিং।

লাইন্‌স্‌ম্যানঃ—জে চক্রবর্ত্তী ও এস আমেদ।

এফ্ এ কাপ্

বিলাতের বিখ্যাত এফ্ এ কাপ্ ফাইনাল খেলায় এবার শেফিল্ড ওয়েডনেস্‌ডে অত্যন্ত উত্তেজনামূলক খেলা খেলে ৪-২ গোলে ওয়েষ্টব্রোমউইচ এলবিয়ানকে হারিয়ে বিজয়ী হয়েছেন। গতবার এই কাপ্ ম্যানচেষ্টার সিটি পেয়েছিল। ১৫০টি স্পেশাল ট্রেণে সত্তর হাজার যাত্রী ওয়েম্‌ব্লীতে এসেছিল,—সকলে অবশ্য খেলা দেখতে যায় নি। সম্রাটের অনুপস্থিতিতে যুবরাজ উপস্থিত হ'য়ে সকল খেলোয়াড়দের সঙ্গে করমর্দ্দন করেন।

যেখানে খেলা হয়েছিল, সেই ওয়েম্‌ব্লী মাঠের অবস্থা এত ভালো ছিল যে একটি বৃহৎ বিলিয়ার্ড টেবিল বলে ভ্রম হচ্ছিল। গত বৎসরের কাপ্ ফাইনালের পরে এখানে কেবল একটি ম্যাচ খেলা হয়েছিল। ওয়েডনেস্‌ডে টসে জিতে মৃদু বাতাসের সুবিধা পেলে। কয়েক মিনিট উদ্দেশ্য বিহীন খেলার পরে শেফিল্ডের সার্প হুপারকে বলটা ঠেলে দিলে সে পেলেট্রপকে পাশ করলে পেলেট্রপ ধীরভাবে গোলরক্ষককে পরাজিত করে প্রথম গোল দেয়।

এর পরে খেলা আরো উত্তেজনাপূর্ণ ও অধিক দ্রুত হতে থাকে। এলবিয়ান এত জোর খেলতে লাগলো যে এক সময়ে তাদের গোলকিপার ছাড়া আর সবাই বিপক্ষের হাফে তাদের চেপে ধরেছিল। কার্টার বল নিয়ে এগিয়ে বাধা পেতে বয়েজকে পাশ দিলে, সে কাটিয়ে নিয়ে বাঁ পায়ে স্কোর করলে বার মিনিট খেলার পরে। বিরাম সময়ে স্কোর সমান সমান এক এক গোল। ওয়েডনেস্‌ডে তার পরে আরো জোর খেলতে লাগলো, অবশেষে পুরো সময়ে তারাই চার গোল দিয়ে জয়ী ঘোষিত হ'লো।

বিলাতের লীগ চ্যাম্পিয়ন

আর্সেনাল তাদের শেষ খেলায় মিডলবারোকে এক গোলে হারিয়ে উপর্য্যুপরি তিনবার প্রথম ডিভিশন লীগ চ্যাম্পিয়ন হলো। ইতিপূর্ব্বে কেবল হাডার্সফিল্ড দলই তিনবার উপর্য্যুপরি চ্যাম্পিয়ন হতে পেরেছিলো।

আর্ম্মি কাপ্

৪র্থ ব্যাটালিয়ন রয়েল ট্যাঙ্ক কর্পস্ আর্ম্মি কাপ্ ফাইনালে ২য় ব্যাটালিয়ন রয়েল আল্‌ষ্টারস্‌কে ৬—৩ গোলে হারিয়ে বিজয়ী হয়েছে।

ইণ্টার-ন্যাশনাল খেলা

আয়র্লাণ্ড এমেচার ইণ্টার-ন্যাশনাল ফুটবল খেলায় স্কটল্যাণ্ডকে ৩—২ গোলে পরাজিত করেছে।

ইংলণ্ড রাগবী লীগ ইণ্টার-ন্যাশনাল খেলায় ওয়েল্‌স্‌কে ২৪—১১ পয়েণ্টে হারিয়ে ফ্রান্সকে ১০—৩পয়েণ্টে হারিয়েছে।

বিলিয়ার্ড

অল্ ইণ্ডিয়া এমেচার বিলিয়ার্ড চ্যাম্পিয়ন প্রত্যুষ দেব ব্রিটিশ এম্পায়ার এমেচার বিলিয়ার্ড চ্যাম্পিয়নসিপ্ খেলায় প্রতিযোগিতা করতে বিলাতে গিয়াছেন।

এইচ্ এফ্ ই কোল্‌স্ (ইংলণ্ড), জি গোল্ড (স্কটল্যাণ্ড), আইভর্ জে এডওয়ার্ডস্ (ওয়েল্‌স্) ও এস্ ফেনিংস্ (আইরিস্ ষ্ট্রেট) এই প্রতিযোগিতায় খেলবেন। গতবারে সিড্‌নী লী চ্যাম্পিয়ন ছিলেন। তিনি এখন প্রফেসনাল খেলোয়াড় হয়েছেন।

দাবা খেলা

দক্ষিণ আফ্রিকার কেনিয়া সহরে একটি দাবা খেলার প্রতিযোগিতা হয়। ফাইনালে তরুণ পাঞ্জাবী খেলোয়াড় বরকৎ আলী ইয়োরোপের বিখ্যাত খেলোয়াড় মিডল ডিচ্‌কে পরাজিত করেছেন। বরকৎ আলীর বাড়ী পাঞ্জাবের গুজরাণওয়ালা সহরে। তিনি ১৯২৭ সালে সর্ব্বপ্রথম দাবা খেলা শিক্ষা করেন। কার্য্যোপলক্ষে এখন কেনিয়াতে এসেছেন।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী প্রণীত উপন্যাস "সর্ব্বাণী"—২৲

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "সাহসিকা"—২৲

শ্রীপ্রবোধকুমার মজুমদার প্রণীত নাটক "জন্মতিথি"—১৲

ডক্টর মুহম্মদ্ এনামুল্ হক্ এম-এ, পি-এইচডি এবং আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ প্রণীত "আরকান-রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য"—১৷৷০

সুভো ঠাকুর প্রণীত কাব্য "প্যান্‌সি ও পিকো"—১৲

শ্রীদিলীপকুমার রায় প্রণীত নাটক "আপদ ও জলাতঙ্ক"—১৷৷০

শ্রীসূর্য্যসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্য জ্যোতিরঞ্জন প্রণীত "হস্তরেখা বিচার"—১৷৷০

শ্রীমৎ স্বামী সমাধিপ্রকাশ আরণ্য প্রণীত "পরশমণি"—৵০

শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার প্রণীত ছোটদের "শেয়াল বন্ধু"—।০

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত "ছোটদের গল্প"—৷৷০

মহীউদ্দীন প্রণীত "মহামানবের মহাজাগরণ"—১৲

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল প্রণীত উপন্যাস "তরুণী-সঙ্ঘ"—১৲

শ্রীযতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ কাব্যসাংখ্যতীর্থ প্রণীত "এটিকেট বা শিষ্টাচার"—।০

শ্রীনিত্যহরি ভট্টাচার্য্য প্রণীত উপন্যাস "শেষের দাবী"—১৷৷০

শ্রীরাধেশচন্দ্র রায় প্রণীত "যন্ত্রযুগের নেপোলিয়ন হেনরী ফোর্ড"—১।০

শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত "চিন্তাধারা"—২৲

শ্রীশান্তি পাল প্রণীত "সন্তরণ পরিচয়"—৸০

শ্রীআশালতা দেবী রত্নপ্রভা, সাহিত্যভারতী প্রণীত উপন্যাস "মন নিয়ে খেলা"—১।০

শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী প্রণীত উপন্যাস "বসন্ত রজনী"—১।০

শ্রীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য প্রণীত উপন্যাস "যে ফুল না ফুটিতে"—১৲

ডাঃ রামভৃত্য ভট্টাচার্য্য প্রণীত "হোমিওপ্যাথিক বর্ণপরিচয়"—১৷৷০

নিবেদন

আগামী আষাঢ় মাসে 'ভারতবর্ষে'র ত্রয়োবিংশ বর্ষ আরম্ভ হইবে

ভারতবর্ষের মূল্য মণিঅর্ডারে বার্ষিক ৬৷৵০, ভি, পিতে ৬৷৶০, ষাণ্মাসিক ৩৶০ আনা, ভি, পিতে ৩৷৷০। এই জন্য ভি, পিতে ভারতবর্ষ লওয়া অপেক্ষা **মণিঅর্ডারে মূল্য প্রেরণ করাই সুবিধাজনক।** ভি, পির টাকা বিলম্বে পাওয়া যায়; সুতরাং পরবর্ত্তী সংখ্যার কাগজ পাইতে বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা। **২০শে জ্যৈষ্ঠের মধ্যে টাকা না পাওয়া গেলে আষাঢ় সংখ্যা ভি, পি, করা হইবে।** পুরাতন ও নূতন গ্রাহকগণ কুপনে কাগজ পাঠাইবার পূর্ণ নাম ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। পুরাতন গ্রাহকগণ কুপনে **গ্রাহক নম্বর** দিবেন। নূতন গ্রাহকগণ **নূতন** বলিয়া উল্লেখ করিবেন; নতুবা টাকা জমা করিবার বিশেষ অসুবিধা হয়।

দ্বাবিংশ বর্ষকাল "ভারতবর্ষে" সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের যে সকল শ্রেষ্ঠ গবেষণা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠক-পাঠিকা মহোদয়গণের অগোচর নাই। কেবল এক বৎসরের কথাই বলি, দ্বাবিংশ-বর্ষে—২০০০ পৃষ্ঠা পঠিতব্য বিষয়, ৬০ খানি বহুবর্ণ চিত্র ও ন্যূনাধিক ১৫০০ খানি একবর্ণ চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। বিশেষ আনন্দের কথা এই যে, গতবর্ষে বহু বিশেষজ্ঞ লেখক "ভারতবর্ষে" গবেষণামূলক নূতন নূতন বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। আগামী বর্ষে আরও নূতন নূতন বিষয়ের আলোচনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আমাদের সৌভাগ্য এই যে, প্রথম বর্ষ হইতে "ভারতবর্ষ" যে শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব লাভ করিয়াছিল, আজও তাহা একটুও ম্লান হয় নাই। ত্রয়োবিংশ বর্ষের জন্য "ভারতবর্ষ" কিরূপ আয়োজন করিয়াছে, আমরা নিজ মুখে সে সম্বন্ধে কোন কথাই বলিতে চাহি না—বিগত দ্বাবিংশ বর্ষের "ভারতবর্ষে"র পরিচালনার কথা আলোচনা করিলেই পাঠকগণ স্বয়ং তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

কর্ম্মকর্ত্তা

"ভারতবর্ষ"।

Printed & Published by Gobindapada Bhattacharjya for Messrs Gurudas Chatterjea & Sons,
at the Bharatvarsha Printing Works, 203-1-1, Cornwallis Street, Calcutta

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রতিষ্ঠিত

ভারতবর্ষ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
গ্রন্থাগার
সংখ্যা ঃ ২১৪১

সচিত্র মাসিক পত্র

ত্রয়োবিংশ বর্ষ

দ্বিতীয় খণ্ড

পৌষ ১৩৪২—জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩

সম্পাদক—রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর

প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
—২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—

ভারতবর্ষ

সূচিপত্র

ত্রয়োবিংশ বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড ; পৌষ ১৩৪২—জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩

লেখ সূচি (বর্ণানুক্রমিক)

অপত্য-স্নেহ (উপন্যাস) —শ্রীসৌরীন্দ্র মজুমদার
২১, ২১৬, ৩৪৭, ৫১৫, ৬৯৮, ৯১২
অসমাপ্ত (গল্প) —শ্রীরবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি-এ ৩৭
অভিজ্ঞতার মূল্য (উপন্যাস)—শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি-এল
২৬৫, ৩৩৫
অন্তর্যামী (কবিতা)—শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ ৩৬৮
অমৃত চায় নর (কবিতা)—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ ৪০৬
আজকে আমার প্রভাত হল (গান) শ্রীরামেন্দু দত্ত ৪৫২
অষ্ট প্রহর (গল্প)—শ্রীগৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত ৫৭৩
অর্ঘ্য (কবিতা)—শ্রীনীরদবরণ ৬০০
অকাল বৈশাখী (কবিতা)—শ্রীরামেন্দু দত্ত ৬৮৪
অষ্টপাদ বা অষ্টভুজ (প্রবন্ধ)—শ্রীনরেন্দ্র দেব ৭৪৬
অরুণ ও অনীতা (গল্প)—মনোজ গুপ্ত ৮৭৬
অব্যক্ত (গল্প)—শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র ৮৯১
আশ্রম ধর্ম্ম ও হিন্দু জীবন (ধর্ম্মতত্ত্ব)—অধ্যাপক শ্রীকালীপ্রসন্ন
কাব্যতীর্থ এম-এ ১
আমাদের রেশিও সমস্যা (অর্থনীতি)—অধ্যাপক শ্রীনলিনীরঞ্জন
চৌধুরী এম-এ ৫১২
ইতিহাসের স্মৃতি (কবিতা)—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ ৩৬
ইংরাজি শিক্ষার ধ্বনি সমস্যা (ভাষাতত্ত্ব)—
অধ্যাপক শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য ৫২৫
ঈশ্বর কোথায় (ধর্ম্ম-তত্ত্ব)—সাহিত্যরত্ন শ্রীসতীশচন্দ্র বৈদ্য ৯৮০
উড়িষ্যার চণ্ডীদাস ভণিতায় কয়েকটি নূতন পদ (পদ সংগ্রহ)—
শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন ৫৮৯
এস (কবিতা)—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ২-৫
এখনই চলিয়া যাবে (কবিতা)—শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ৩৯৭
কবি জয়দেবের বৈষ্ণবামৃত (প্রবন্ধ)—শ্রীহরেকৃষ্ণ
মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন ২৮৯
কাল ভ্রষ্ট (কবিতা)—শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য ২৯৪
কবি কীট্‌স (সাহিত্য)—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ ৫৮২
কার্পাস (ভ্রমণ)—অধ্যাপক শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় এম-এ ৬৩৬
কাশীধামে রামকৃষ্ণ শতাব্দী জয়ন্তী (প্রবন্ধ) ৭৬৩
কেদারনাথ দাস, ডাক্তার (মৃত্যুসংবাদ) —শ্রীপ্রভাত ঘোষ ৮০০
কামনা (কবিতা)—তরলিকা দেবী ৮৮০
কাগজ প্রস্তুত প্রণালী (বিজ্ঞান)—শ্রীমণীশচন্দ্র ভদ্র ৯৫৮
খেয়ালী (কবিতা)—শ্রীচিত্তরঞ্জন রায় চৌধুরী ১৪৯
খেলাধূলা ১৫০, ৩১২, ৪৭৫, ৬৪৯, ৮২৩, ৯৯৯,
গান (কবিতা)—শ্রীবীরেন্দ্রলাল রায় ৩৪২
গীতা মহাভারতের প্রক্ষিপ্ত কি না (গবেষণা)—
মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ৬১৫
চির নবীন (গল্প)—শ্রীমতী আশালতা সিংহ ২০৩
চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, মহামহোপাধ্যায় (জীবনী)
শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ ২৬৮
চক্ষু রোগ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা (প্রবন্ধ)—
ডাক্তার শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এম-বি ২৮৭
চলতি ভাষার সংস্কার (ভাষাতত্ত্ব)—শ্রীরাধারাণী দেবী ও শ্রীনরেন্দ্র দেব ৪৮৯
চিত্রগুপ্ত ও তাহার বৈজ্ঞানিক তথ্য (পুরাতত্ত্ব)—শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র ধর ৫২৫
চলিত বাঙ্গালা ভাষা ও তাহার বানান (সাহিত্য)—
অধ্যাপক শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য এম-এ ৬৫৭
জর থুশ্‌ত্র (ধর্ম্মতত্ত্ব)—শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য এম-এ ৮০
জৈমিনির ধর্ম্মমীমাংসা (দর্শন) —শ্রীসূর্য্যকুমার তর্কসরস্বতী ১৬১
জৈত্র যাত্রা (কবিতা)—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার ১৭৬
জীবনের লক্ষ্য (প্রবন্ধ)—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ ২৪১
জাতীয় মহাসমিতি (ইতিহাস)—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ২৮০
জোনাকীর জন্মকথা (প্রবন্ধ)—শ্রীনরেন্দ্র দেব ৪৩৩
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (জীবনী)—শ্রীফণীন্দ্রনাথ
মুখোপাধ্যায় এম এ ৪৩৭
জীবনানন্দ (কবিতা)—শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ৫৩৭
জীবন-বীমা কোম্পানীর দাদন প্রথা (অর্থনীতি) —
শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় বি-এ ৭৪২
জ্বলেনি আলো অন্ধকারে (গল্প)—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ গোষাল এম-এ ৮৬১
জীবন-বীমা তহবিলের দাদন (অর্থনীতি)—
শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় বি-এ ৮৮১
ঠাকুরমা (কবিতা)—শ্রীসুধীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৬০
ডাক্তারের আত্মকাহিনী (গল্প)—শ্রীদুলালচাঁদ মিত্র ৫৮৬
তাসের দেশ (পদার্থ বিজ্ঞান)—শ্রীকমলেশ রায় ৭৬
তুমি কি আসিয়াছিলে (কবিতা)—
শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় বি-এ ৭৫১
ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র (জীবনী) —শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম-এ ৭৭৬
দূরের বাউল ডাকে (কবিতা)—শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ১৬৬
দিব্য-প্রসঙ্গ (ইতিহাস)—শ্রীঅযোধ্যানাথ বিদ্যাবিনোদ ৬৬
দীপালি (কবিতা) - শ্রীমাণিকচন্দ্র ঘোষ ৮৯
দুর্গাচরণ নাগ (জীবনী)—
দেবতার স্বর্গ তাই মোর কাম্য নহে (কবিতা)—
শ্রীমৃণাল সর্ব্বাধিকারী এম-এ ১০২
ধরার দান (কবিতা)—শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী ২৬৪
ধন সঞ্চয়ে জীবন বীমা (অর্থনীতি)—শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ৩৩৪
ধরণীর প্রেম (কবিতা)—শ্রীনিত্যধন ভট্টাচার্য্য
এম-এ, কাব্যসাংখ্যতীর্থ ৪০৭
নাপোলী ও পম্পিয়াই (ভ্রমণ)—শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৯৭০
নরেন্দ্রনাথ বসু, ডাক্তার (মৃত্যুসংবাদ)—শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু বি-এ ২০৯
নৈনিতাল (ভ্রমণকাহিনী)—শ্রীবিনয় ভট্টাচার্য্য ২৯২
নোবেল পুরস্কার (বিজ্ঞান কথা)—কমলেশ রায় ৩৮২
নিবারণের মৃত্যু (গল্প)—শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী ৫২৩
নববরষে (কবিতা)—শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য ৭৫৭
নিরুদ্দেশ (গল্প)—একরামুদ্দীন ৮১৭
নদীয়া জেলার কয়েকজন সমন্বয় পন্থী সাধক (প্রবন্ধ)—
শ্রীতারাপদ দাশ এম-এ, বি-টি ৯২৮
প্রাচীন ভারতীয় অট্টালিকা (পুরাতত্ত্ব)—ডাক্তার শ্রীবিমলাচরণ
লাহা এম-এ, বি-এল, পি-এচ ডি ৯৭১
প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য (বিজ্ঞান কথা) —শ্রীনরেন্দ্র দেব ১৯
পাক চক্র (নাটিকা)—শ্রীবটকৃষ্ণ রায় ৮৩
প্রলয় তাণ্ডব (কবিতা)—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ৯-, ২৫২
প্রজাপতির মৃত্যু (কবিতা)—শ্রীরামেন্দু দত্ত ১০১
পৃথিবীর প্রতিবেশী (প্রবন্ধ)—শ্রীনরেন্দ্র দেব ১২০
পম্পেয়াই ও ভিসুভিয়স (ভ্রমণকাহিনী)—শ্রীনিত্যনারায়ণ ২৪৫
বন্দ্যোপাধ্যায়
পদ্মা (গল্প) —সমুদ্র গুপ্ত ৬৭৯
পাশ্চাত্য মতে বেদের আলোচনা (প্রবন্ধ)—শ্রীবসন্তকুমার
চট্টোপাধ্যায় এম-এ ৬৮৫
পুরাণ পরিচয় (সাহিত্য)—শ্রীকালীপদ চক্রবর্ত্তী বি-এ ৭৩৯
পাণ্ডুনগর (ইতিহাস)—শ্রীসরসীকুমার সরস্বতী এম-এ ৭৯২
প্রজ্ঞানের প্রগতি (বিজ্ঞান)—অধ্যাপক শ্রীক্ষেত্রমোহন
বসু ডি-এস সি ৮৩৩
প্রত্যাবর্ত্তন (ভ্রমণ)—শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৯৩
পাখীর বাসা (প্রবন্ধ)—শ্রীনরেন্দ্র দেব ৯৩২
ফুজি পর্ব্বতের উদ্দেশে (কবিতা)—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র ৩৭৮
বিয়ের অগ্নে-বিয়ে (গল্প)—শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল ৫৭
বিরহ মিলন কথা (উপন্যাস)—শ্রীহীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
৬৯, ২৩৫, ৩৯৮, ৫৬০, ৭২৯, ৯৩৯
বাচ্চু (গল্প)—শ্রীসুধীরকুমার মুখোপাধ্যায় ১৮
বৈজ্ঞানিক চাষ (গল্প)—শ্রীদিলবাহার রচিত, শ্রীবিচিত্র
শর্ম্মা চিত্রিত ২২৯
বাঙ্গালার প্রাচীন শব্দ সম্ভার (ভাষাতত্ত্ব)—শ্রীকালীপদ
চক্রবর্ত্তী বি-এ ৩২৭
বঙ্গ পঞ্জিকা সমন্বয় ও সূক্ষ্ম লগ্ন নিরূপণ (জ্যোতিষ)—
শ্রীসুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী ৪৪১
বথ্‌শীষ (গল্প)—মনোজ গুপ্ত ৪৪৯
বোহিমিয়ান (গল্প)—শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষ ৫৩৪
বড়দা (গল্প)—শ্রীসুরেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ৫৪৩
বরোদা ও গায়কোবাড় (ইতিহাস)—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ৫৯৬
বনের হরিণ (গল্প)—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ৬৬৭
বিহারের ভাউলী প্রথা ও বাঙ্গালার জমীদারী সমস্যা (প্রবন্ধ)—
শ্রীগোপালচন্দ্র বসু ৭৭১
বাঙ্গালা ভাষার রূপ সমস্যা (সাহিত্য)—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ৭৯০
বাঙ্গালার শাসন বিবরণ (রাজনীতি)— ৭৬৬
বাঙ্গালা ভাষার অঙ্গ সংস্কার (ভাষাতত্ত্ব)—
শ্রীঅনিলবরণ রায় এম-এ ৮৫৯
বৃহৎ বঙ্গ (আলোচনা)—ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার
এম-এ, পি-এচডি ৯৫৩
বৈদিক যুগের শিক্ষা পদ্ধতি (প্রবন্ধ)—অধ্যাপক শ্রীরাসমোহন
চক্রবর্ত্তী ৯৫৫
ভল্লু সর্দ্দার (গল্প)—শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৫
ভারতীয় বীমার সরকারী বিবরণ (প্রবন্ধ — ৫০
শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ২৬২
ভারতবর্ষের পর্ব্বত ও নদী (পৌরাণিক কথা)—
ডাক্তার শ্রীবিমলাচরণ লাহা এম-এ, বি-এল, পি-এচডি ৩৬২
ভারতীয় চিত্রকলার তৃতীয় বার্ষিক প্রদর্শনী (প্রবন্ধ)—
শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায় ৪২০
ভাস্কর্য্যে বাঙ্গালার তরুণ শিল্পীর অবদান (মৃৎশিল্প)—
শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ এম-এ, পি-আর এস ৫৩০
ভারতীয় ধর্ম্ম বৈচিত্র্য (আদম সুমারীর আলোচনা)—
শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বি-এসসি ৫৬৮
ভারতীয় গণিতে পাই (প্রবন্ধ)—শ্রীফণিভূষণ দত্ত ৬৭৫
ভারতীয় কুস্তী বিজ্ঞানের প্রচার (ব্যায়াম)—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত ৮৭১
মাটির দেবতা (উপন্যাস)—শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী ১০, ১৬৭, ৩৬৯, ৪৯৮

মাতৃজাতির শরীর চর্চ্চা (ব্যায়াম)—শ্রীনীলমণি দাশ ১৮৭
মুদীর দোকান (কবিতা)—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ২০০
মৃত্যুর পরে (গল্প)—শ্রীহেম চট্টোপাধ্যায় ২০০
মাটি, না মা-টি (ধর্ম্মতত্ত্ব)—অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ ৩২৯
মারণ রশ্মি (বিজ্ঞান)—শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষাল ৯৭৯
মনের অন্তরালে (গল্প)—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ভৌমিক এম-এ, বি-এল ৪০৯
মুন্সেফ আবিষ্কার (কবিতা)—৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ৫১০
মাংসাশী উদ্ভিদ (প্রবন্ধ)—শ্রীনরেন্দ্র দেব ৫৭৬
মায়ের শেষ চিঠি (কবিতা)—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ৭১৬
মাদ্রাজে শিল্পকলা প্রদর্শনী (প্রবন্ধ)—
মৌর্য্য শিল্প কলা (গবেষণা)—শ্রীঅচ্যুতকুমার মিত্র ৭৬৯
যুগল (কবিতা)—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র ২১৫
যাহা কাব্য নহে (গল্প)—শ্রীমতিলাল দাশ এম-এ, বি-এল ৪৩০
রাজগীর (ভ্রমণ-কাহিনী)—ডাক্তার শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল ১২১
রূপদক্ষ (কবিতা)—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ৫২৯
লক্ষ্মীর বিবাহ (উপন্যাস)—অধ্যাপক শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ এম-এ ৭৭৮, ৮৪২
শঙ্কর গড় বা গড়োয়া (ভ্রমণ-কাহিনী)—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ২৮
শ্রমশিল্পে সুইজারল্যাণ্ড (অর্থনীতি)—শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষ বি-এ ৪৭
শ্রীচৈতন্যদেব ও জাতিভেদ (প্রবন্ধ)—অধ্যাপক শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার ২২৬
ঐ (আলোচনা)—রায় বাহাদুর শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ ৪৪৪
ঐ (প্রতিবাদ)—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ ৬০৬
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শতাব্দী জয়ন্তী (জীবনী)—স্বামী বিবেকানন্দ ৬০১
শব্দরত্নাবলী ও মুসা খাঁ (গবেষণা)—শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত এম-এ ৬০৬
ঐ (প্রতিবাদ)—শ্রীসুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ ৯৩০
শোক সংবাদ ৬৩২, ৭৯৫, ৯৯৫
শ্রীগৌরাঙ্গ ও লীলা কীর্ত্তন (প্রবন্ধ)—রায় বাহাদুর শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ ৭১৭
শিক্ষা (প্রবন্ধ)—শ্রীদেবহরি দে ৮১৮
শিবপুরে তৃতীয় বার্ষিক শিল্প প্রদর্শনী (প্রবন্ধ)—শ্রীসুধাংশুকুমার রায় ৮৮৫
শম্ভুনাথ পণ্ডিত, বিচারপতি (জীবনী)—শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম এ ৯২৫
স্মৃতি-তর্পণ (পুরাতন প্রসঙ্গ)—শ্রীজলধর সেন ৪৩, ১৭৭, ৩৪৩, ৫৩৯, ৭৫২, ৯০৫
সংবাদপত্রে সেকালের কথা (আলোচনা)—সার যদুনাথ সরকার কে-টি ১১৬
সাময়িকী ১৩১, ২৯৫, ৪৬১, ৬২০, ৮০৫, ৯৮৬
সাহিত্য-সংবাদ ১৬০, ৩২৮, ৪৮৮, ৬৫৬, ৮৩২, ১০০৮
সহপাঠী (গল্প)—শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম এ ১৮৪
সঙ্গীত (১) কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীজগৎ ঘটক ৪০
(২) কথা ও সুর—কাজি নজরুল ইসলাম, স্বরলিপি—জগৎ ঘটক ২০১
(৩) সুর—দ্বিজেন্দ্রলাল, কথা ও স্বরলিপি—দিলীপকুমার ৩৬৯
(৪) কথা—শ্রীঅজয় ভট্টাচার্য্য এম-এ, সুর ও স্বরলিপি—শৈলেশ গুপ্ত ৫২১
(৫) কথা—শ্রীবিভূতিভূষণ রায়, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীব্রজগোপাল গোস্বামী ৭০৬
(৬) কথা ও সুর—কাজি নজরুল ইসলাম, স্বরলিপি—জগৎ ঘটক ৮৫৭
স্থানভ্রষ্ট (কবিতা)—শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য ৪৪০
সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ (জীবনী)—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ৪৫৩
সর্ব্বহারা (কবিতা)—শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী বি-এ ৫২০
সামাজিক হিতসাধনে জীবনবীমা (অর্থনীতি)—শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় বি-এ ৫৮৪
সুইজারল্যাণ্ডের আবহাওয়া (ভ্রমণ)—ডাক্তার শ্রীসুরেশচন্দ্র সান্ন্যাল এল-এম এফ ৬১৮
স্বদেশ হইতে সস্তায় বিদেশে মাল রপ্তানী (অর্থনীতি)—অধ্যাপক শ্রীযোগেশচন্দ্র মিত্র ৭০৭
সিলিকণের আত্মকথা (প্রবন্ধ)—অধ্যাপক শ্রীসুবর্ণকমল রায় এম এ ৮০১
সোণার তরী (কবিতা)—শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ৯৬০
হুডরু ও রাজরুপ্পা (ভ্রমণ)—শ্রীজনরঞ্জন রায় ৬৯২

চিত্র সূচি (মাসানুক্রমিক)

পৌষ, ১৩৪২

বৌদ্ধ বিহার ১৯
শৈলগুহা ২০
সূর্য্যমূর্ত্তি ৩২
ব্রহ্মামূর্ত্তি ৩৩
রুদ্রমূর্ত্তি ৩৩
পরশুরাম, বুদ্ধ ও নৃসিংহ ৩৪
বরাহ প্রভৃতি দশাবতারের মূর্ত্তি ৩৪
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ৩৫
চিপিলিসের জলযন্ত্র ৪৭
গো-পালক ৪৭
সিমেনথাল গরু ৪৭
কলঘর ৪৮
গুইডেল কুইভারের জলপ্রণালী ৪৮
রাসায়নিক কারখানা ৪৯
ঘড়ি প্রস্তুতের কারখানা ৪৯
কাপড়ের উপর সূক্ষ্মকাজ ৪৯
গমের কল ৪৯
গ্রিম সেলের বাঁধ ৫০
লৌহের কারখানা ৫১
কারুকার্য্যের কল ৫১
সেলাইয়ের কল ৫১
বারণীর সমুদ্রতট ৫১
ভারতবর্ষের জন্য এঞ্জিন ৫২
রেলগাড়ী ৫২
সূচের কাজের নমুনা ৫৩
যন্ত্রবিভাগ ৫৩
পনিরের ভাণ্ডার ৫৩
সূচের কাজের নমুনা ৫৩
কারখানার দৃশ্য ৫৪
আমষ্টেগের জলের পাইপ ৫৫
বাণির পার্লিয়ামেণ্ট ভবন ৫৫
জুরিসের টেকনলজি ভবন ৫৫
বারবেরাইনের বৈদ্যুতিক যন্ত্র ৫৬
কাপলান টারবাইনের চাকা ৫৬
হসন্তিকা (এই পলিসিষ্টিনার খোলের আকৃতি একটি সুন্দর অগ্নিপাত্রের মত) ৮৩
অগুরু পাত্র (এই পলিসিষ্টিনার খোলের আকৃতি একটি সুডোল অগুরু পাত্রের মত) ৮৩
বিন্দুরূপ (ধূলিকণার মত অতি ক্ষুদ্র এক বিন্দুতে পলিসিষ্টিনা গুচ্ছের এতগুলি প্রাণী বিদ্যমান) ৮৪
ত্রিমূর্ত্তি (পলিসিষ্টিনার তিন রকম খোলের অদ্ভুত আকৃতি) ৮৪
বহুচর্ম্মীর বিচিত্ররূপ (নং ১) (পলিসিষ্টিনার খোলের বিবিধ সুন্দর বিচিত্র রূপ) ৮৫
পুষ্পরূপ (এই খোলটি ফুলের মত) ৮৬
শৃঙ্গীরূপ ৮৬
কুসুমদানী ৮৬
জেলের ফাৎনা ৮৭
তাঁতির মা ৮৭
রাজদণ্ড ৮৮
বহুচর্ম্মীর বিচিত্ররূপ (নং ২) ৮৮
দৈব দুর্ব্বিপাকের একটি দৃশ্য ১২১
রাজগীর—মন্দির ও তৎসংলগ্ন সুপ্তধারা ১২২
পর্ব্বতারোহণরত মিসেস বোস্ ও মিসেস্ পাল ১২৩
পাহাড়ের উপর বিশ্রামরত মহিলাত্রয় ১২৫
পাহাড়ের উপর বিশ্রামরত পুরুষযাত্রিগণ ১২৭
কুমারী অঞ্জলি দাশ ১৩৩
কুমারী ইন্দুলেখা মৌলিক ১৩৩
রমা গুপ্তা ১৩৩
গোপালকৃষ্ণ দেবধর ১৩৩
গোপালকৃষ্ণ গোখলে ১৩৪
বৈষ্ণবাচার্য্য সন্তদাস ১৩৫
রমেশচন্দ্র দত্ত ১৩৭
কর্ণেল জেম্‌স টড ১৩৯
সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রাপ্ত বালিকাগণ ১৪২
শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন ঘোষ ১৪২
চ্যাম্পিয়নসিপ কাপ বিজয়ী ভট্টাচার্য্য পরিবার ১৪৩
কুমারী রেণুকা সাহা ১৪৩
স্বামী নিগমানন্দ পরমহংসদেব ১৪৪
শৌর্য্যেন্দ্রকুমার ১৪৪
ওয়াজির আলি ১৫০
সি কে নাইডু ১৫০
টি সি লংফিল্ড ১৫০
কে বোস ১৫১
ডি ডি হিন্দেরকার ১৫১
জয় ১৫১
ডাজিবদার ১৫১
রাইডার ১৫২
যুবরাজ পাতিয়ালা ১৫২
অমরনাথ ১৫৩
লাল সিং ১৫৩
নাজির আলি ১৫৩
এম এম নাইডু ১৫৪
ব্রায়াম ১৫৪
মরিসবি ১৫৪
বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫৫

বহুবর্ণ চিত্র

১। দুর্গাচরণ নাগ (নিচোল)
২। সাগর সঙ্গমে ৩। বাজার
৪। আবাহন ৫। আশীর্ব্বাদ

মাঘ, ১৩৪২

ব্যায়ামকারিণীর দেহের পরিচয় ১৮৭
ব্যায়াম ১ (ক) ১৮৭
ব্যায়াম ২ (ক) ১৮৮
ব্যায়াম ২ (খ) ১৮৮
ব্যায়াম ৩ (ক) ১৮৮
ঐ ৩ (খ) ১৮৯
ঐ ৪ (ক) ১৮৯
ঐ ৫ (ক) ১৯০
ঐ ৫ (খ) ১৯০
ঐ ৬ (ক) ১৯০
ঐ ৬ (খ) ১৯১
ব্যায়াম ৭ (ক) ১৯১
ঐ ৭ (খ) ১৯২
ঐ ৮ (ক) ১৯২
ঐ ৯ (ক) ১৯২
কুমারী নীলিমা চক্রবর্ত্তী লৌহপাটি বক্র করিতেছেন ১৯৩
ব্যায়াম ১০ (ক) ১৯৩
ব্যায়াম ১১ (ক) ১৯৩
ঐ ১১ (খ) ১৯৪
ঐ ১২ (ক) ১৯৪
ঐ ১৩ (ক) ১৯৪
ব্যায়াম বিদ্যাপীঠের মেয়েরা ১৩নং ব্যায়ামটি একসঙ্গে অভ্যাস করছেন ১৯৫
ব্যায়াম ১৪ (ক) ১৯৫
ঐ ১৪ (খ) ১৯৬
ঐ ১৫ (ক) ১৯৬
ঐ ১৫ (খ) ১৯৬
ঐ ১৬ (ক) ১৯৭
ঐ ১৭ (ক) ১৯৭
ঐ ১৭ (খ) ১৯৮
ঐ ১৮ (ক) ১৯৮
ঐ ১৮ (খ) ১৯৯
শ্রীমতী রেবা দাশ লৌহপাটি বক্র করিতেছেন ১৯৯
মল্ল যোদ্ধা ২০৯
নাপোলী যাদুঘরের ছু'টি ব্রোঞ্জ মূর্ত্তি ২০৯
বিষাক্ত বাষ্পে ও ছাই-এ রুদ্ধশ্বাস হতভাগ্য ২১০
ভাবমগ্ন কবি স্যাফো ২১০
ভেতির গৃহের একটি কক্ষের দেওয়াল ২১১
বংশীবাদক ২১২
পম্পিয়াই অধিবাসীদের অঙ্গসজ্জা ও সুন্দরীদের কেশবিন্যাস ২১৩
পম্পিয়াই-এর একটি দেওয়াল চিত্র ২১৪
অসমাপ্ত আহার ২১৫
নীহারিকাপুঞ্জের নক্সা ২৪৫

মঙ্গল গ্রহের চিত্র … ২৪৬
মঙ্গল গ্রহের নক্সা … ২৪৭
গ্রীষ্মকালে মঙ্গলের রূপ … ২৪৮
মঙ্গলের দক্ষিণ গোলার্দ্ধের মানচিত্র ২৪৯
মঙ্গলের উত্তর গোলার্দ্ধের মানচিত্র ২৪৯
মঙ্গলে মেঘোদয় … ২৫০
মঙ্গলে মেঘোদয় (রূপান্তর) … ২৫০
মঙ্গলে মেঘোদয় (আবার রূপান্তর) ২৫০
উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় … ২৮১
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় … ২৮৩
আনন্দমোহন বসু … ২৮৩
রমেশচন্দ্র দত্ত … ২৮৪
লালমোহন ঘোষ … ২৮৪
রাসবিহারী ঘোষ … ২৮৪
ভুপেন্দ্রনাথ বসু … ২৮৫
সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ … ২৮৫
অম্বিকাচরণ মজুমদার … ২৮৬
চিত্তরঞ্জন দাশ … ২৮৬
শেষ নিদ্রায় ডাক্তার নরেন্দ্রনাথ … ২৯২
বসন্তকুমার বসু … ২৯৫
দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী … ২৯৮
রায় বাহাদুর শ্যামাচরণ রায় … ২৯৯
বিশপ লেভবিটার … ৩০০
(শিল্পী শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি)
শ্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য … ৩০২
(মধ্যস্থলে উপবিষ্ট)
মাদ্রাজের গভর্ণর লর্ড আর্সকিন … ৩০২
কুমারী বাণী ঘোষ … ৩০৩
শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ … ৩০৩
কাশী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম তিনকড়ি স্মৃতি লেবরেটরী … ৩০৫
গুণনাথ সেন … ৩০৮
মিঃ বি, এম, সেন … ৩০৯
মিঃ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ … ৩০৯
ডাক্তার নরেন্দ্রনাথ বসু … ৩১১
এস, ব্যানার্জ্জি … ৩১২
জে, এস, রাইডার … ৩১২
(ক্যাপ্‌টেন অষ্ট্রেলিয়া)
অমরনাথ … ৩১২
সি, কে, নাইডু … ৩১৩
ইডেন গার্ডেনের ক্রিকেট খেলার মাঠের দৃশ্য … ৩১৩
ওয়াজির আলি ও মুস্তাক আলি … ৩১৪
ওয়েণ্ডেলবিল ও ব্র্যায়াণ … ৩১৪
সি, কে, নাইডু ভারতীয় দলকে ফিল্ড করতে মাঠে নামছেন … ৩১৫
জে, এস, রাইডার ব্যাট করতে যাচ্ছেন ৩১৬
গভর্ণর জেনারেল ম্যাকার্টন … ৩১৬
রাইডার তাঁর দলকে ফিল্ড করতে মাঠে নামছেন … ৩১৭
ফ্রাঙ্কটেরাণ্ট বাঙ্গালার লাট মহোদয়কে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন … ৩১৮
জি এরাটুন ও এস ব্যানার্জ্জী … ৩১৯
অষ্ট্রেলিয়া ও কুচবিহার … ৩২০
এ এল হোসী ফিল্ড করতে নামছেন ৩২১
অষ্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়গণ … ৩২২
কে ভট্টাচার্য্য … ৩২৩
ভারতীয় খেলোয়াড়গণ … ৩ ৩
পুরুষদের ডবল ফাইনালের খেলোয়াড়গণ ৩২৪
মিক্সড ডবল ফাইনালের খেলোয়াড়গণ ৩২৫
সাউথ ক্লাবের সেণ্ট াল খেলোয়াড়গণ ৩২৫
জি, ভন মেকট্রান … ৩২৭
ক্রীড়ারত আরমেঞ্জেল … ৩২৬
ক্রীড়ারত এল হেক্‌ট … ৩২৬
সাত মাইল দৌড় প্রতিযোগিতায় বিজয়ীত্রয়ী … ৩২৭

বহুবর্ণ চিত্র

১। মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার (নিচোল)
২। শ্রীকৃষ্ণের কপট নিদ্রা ৩। মা আমায় ঘুরাবি কত ?
৩। পাকা দেখা ৫। ধুনারী

ফাল্গুন, ১৩৪২

গঙ্গা (বারাণসী) … ৩৬২
যমুনা … ৩৬২
নর্ম্মদা নদী … ৩৬৩
কৃষ্ণা নদী … ৩৬৩
কাবেরী নদী … ৩৬৪
ব্রহ্মপুত্র নদী … ৩৬৪
চিনাব নদী … ৩৬৫
ঝেলম নদী … ৩৬৫
হিমালয় পর্ব্বত … ৩৬৬
বেভার পর্ব্বত … ৩৬৭
শ্রীদিলীপকুমার রায় … ৩৬৮
আমাদের দল—প্রফেসার অলোক সেন, ডাক্তার বি, সি, ঘোষ ও জগদিন্দ্র বসু ৩৮২
লক্ষ্ণৌ ষ্টেশনের একাংশ … ৩৮২
লক্ষ্ণৌ ইমাম বাড়ী … ৩৮৩
ইউ-কালিপ্‌টস্ গার্ডেন—লক্ষ্ণৌ … ৩৮৩
লক্ষ্ণৌ রেসিডেন্সি … ৩৮৪
কাঠগুদাম ব্রিজ—ষ্টেশনের পাশে … ৩৮৫
চীনা পিক ও সহর … ৩৮৫
লেকের উত্তর পশ্চিমের দৃশ্য—ডাণ্ডা হিলের একাংশ … ৩৮৬
লেক ও ডিওপাথ হিল … ৩৮৭
আয়ারপাথ হিল … ৩৮৭
ডাণ্ডা হিলের ওপর থেকে লেকের দৃশ্য ৩৮৮
চীনা মল বা খেলার মাঠে … ৩৮৮
লেকের একাংশ ও পথ … ৩৮৯
গবর্ণমেণ্ট হাউস … ৩৯০
রামজে হাসপাতালের একাংশ … ৩৯১
নৈনিদেবীর মন্দির … ৩৯২
চীনা পিক থেকে তুষার শ্রেণী … ৩৯৩
লেকে ইয়ট খেলা … ৩৯৪
নৌ-বিহার … ৩৯৫
তুষারপাতে নৈনিতাল … ৩৯৫
মিউনিসিপাল গার্ডেন ও লেক … ৩৯৬
লেখক—(শ্রীবিনয় ভট্টাচার্য্য) … ৩৯৬
বালির নদী … ৪১০
ধোপার ঘাট … ৪২০
একখানি পোষ্টার … ৪২১
তৃষ্ণার্ত্ত … ৪২১
অবনীন্দ্রনাথের পোর্ট্রেট … ৪২২
ভারতীয় জীবনের একটি চিত্র … ৪২৩
কাঠ-কয়লার অঙ্কিত একখানি চিত্র ৪২৩
সাঁওতাল নৃত্য … ৪২৪
জোনাকীর ডিম … ৪৩৩
শৈশবকোষে জোনাকী … ৪৩৪
কৈশোর কোষে জোনাকী … ৪৩৪
পুং জোনাকী … ৪৩৫
স্ত্রী জোনাকী … ৪৩৬
জোনাকীর আলো … ৪৩৬
মহারাণী ভিক্টোরিয়া … ৪৫৩
সপ্তম এডওয়ার্ড … ৪৫৪
পঞ্চম জর্জ্জ … ৪৫৫
সম্রাট অষ্টম এডোয়ার্ড … ৪৫৭
ওয়েষ্ট মিনিষ্টার হলে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের শবাধার … ৪৫৭
সম্রাটের শবের শোভাযাত্রা … ৪৫৮
শোভাযাত্রার সঙ্গে সহোদরত্রয় সহ নূতন সম্রাট … ৪৫৮
কলিকাতার ময়দানে শোভাযাত্রা ৪৫৯
কলিকাতার রাজপথে কীর্ত্তনের দল ৪৬০
সার জন উডরফ … ৪৬১
ভারতীয়ের বেশে সার জন উডরফ ৪৬২
অটলবিহারী ঘোষ … ৪৬৩
রাডিয়ার্ড কিপলিং … ৪৬৪
মিঃ লয়েড জর্জ্জ … ৪৬৬
নৃত্যকারী দল … ৪৬৬
শ্রীবিপিনচন্দ্র চৌধুরী ও অন্যান্য দেশবাসী মূক বধিরগণ … ৪৬৬
শ্রীবিপিনচন্দ্র চৌধুরী … ৪৬৬
শ্রীশ্রীসরস্বতী … ৪৬৯
সঙ্গীতজ্ঞ অবিনাশ ঘোষ … ৪ ৯
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় … ৪৭০
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দিবসে উৎসব ৪৭১
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দিবসে বেথুন কলেজের ছাত্রীদের শোভাযাত্রা … ৬৭২
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দিবসে ভিন্ন ভিন্ন কলেজের ছাত্রদল … ৪৭২
ছাত্রগণের ক্রীড়া প্রদর্শন … ৪৭৩
ছাত্রগণের অপর একটি ক্রীড়া … ৪৭৩
বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্রগণের মিছিল ৪৭৩

বিশ্ববিদ্যালয় উৎসবে ব্রত-চারী নৃত্য ৪৭৪
রায় সাহেব নবকৃষ্ণ রায় … ৪৭৪
ওয়াজির আলি … ৪৭৫
আমীর ইলাহী … ৪৭৫
মেহেরমজী … ৪৭৫
বাকাজিলানী … ৪৭৫
অমর সিং … ৪৭৯
পি, ই. পালিয়া … ৪৭৯
ডি ডি, হিন্দেলকার … ৪৭৯
রঞ্জি ট্রপী … ৪৮১
আন্তঃ প্রাদেশিক প্রতিযোগিতায় সি, কে, নাইডু—দলকে ফিল্ড করতে নিয়ে যাচ্ছেন … ৪৮১
বাঙ্গালার প্রথম ব্যাট্‌স্‌ম্যানদ্বয় … ৪৮২
এম. জি, গোপালন্ … ৪৮২
জে, এস, রাইডার … ৪৮৩
ম্যাকার্টনি … ৪৮৩
এম, ডি, হোসেন … ৪৮৪
মুস্তাক আলি … ৪৮৪
নিশার … ৪৮৪
খেলাঘরের বার্ষিক স্পোর্ট … ৪৮৫
রেঞ্জার্স ক্লাবের বাষিক স্পোর্ট … ৪৮৫
মোহনবাগান স্পোর্ট … ৪৮৫
মোহনবাগান স্পোর্ট বিজয়ী এইচ্, কে, মুখোপাধ্যায় … ৪৮৭
মোহনবাগান প্রাথমিক স্পোর্ট ৪৮৭
বেঙ্গল অলিম্পিক আর্ট … ৪৮৭
বেঙ্গল অলিম্পিকে জেড এইচ খান ৪৮৭
সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকারী গ্রেট বৃটেন দল বন্ধুবর্গসহ … ৪৮৭

বহুবর্ণ চিত্র

১। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (নিচোল) ২। বাড়ীর পথে ৩। ভাই বোন ৪। গ্রাম্য স্বর্ণকার ৫। সাঁজের গঙ্গা

চৈত্র, ১৩৪২

… বুদ্ধ (মনোরঞ্জন) … ৫৩০
বুদ্ধদেব ও সুজাতা (মনোরঞ্জন) ৫৩০
নর্ত্তকী (মনোরঞ্জন) … ৫৩১
মন্দির পথে (মনোরঞ্জন) … ৫৩১
বসন্ত উৎসব (মনোরঞ্জন) … ৫৩১
শ্রীমনোরঞ্জন ভৌমিক … ৫৩৩
ভেতির বাড়ীর অলিন্দ ও বাগানের একাংশ ৫৪৭
বিয়োগান্ত কবির গৃহ … ৫৪৭
পাথরের জাঁতা ও রুটি সেঁকবার উনুন ৫৪৮
এম্পি-থিয়েটার … ৫৪৮
একটি আংশিক পুনর্গঠিত বাড়ী … ৫৪৯
সমগ্র ব্যাসিলিকা … ৫৪৯
ভেতির বাড়ীর উদ্যান … ৫৪৯
সমুদ্র তোরণ … ৫৫০
ফোরামের একাংশ … ৫৫০
ফোরাম স্নানাগারের মৃদু গরম জলের ঘর ৫৫০
হাউস অফ ফাউন … ৫৫১
রঙ্গালয় (বড়) … ৫৫১
এ্যাপোলোর মন্দির … ৫৫১
আইসিস মন্দির … ৫৫২
ডোমিটিয়ান রোড ও হারফিউলেনিযাম তোরণ … ৫৫২
House of Rufus … ৫৫২
একটি বাড়ীর মোজায়েক-করা মেঝে ৫৫৩
এ্যাপোলোর মন্দির … ৫৫৩
বাজারের দোকান ঘর … ৫৫৪
ফোরামের পথে তোরণ … ৫৫৪
বৈজ্ঞানিকের বাড়ীর একটি চমৎকার মোজায়েক-করা ফোয়ারা … ৫৫৫
পম্পেয়াইএ প্রাপ্ত পাথরের জাঁতা ৫৫৫
গোল্ডেন কিউপিডের বাড়ীর একাংশ (পুনর্নির্ম্মিত) … ৫৫৬
হাউস অফ ভেতির প্ল্যান … ৫৫৬
গৃহ দেবতার বেদী … ৫৫৭
ষ্ট্যাবিয়ান স্নানাগারের পূর্ব্বাংশ (সামনে পাথরের গোলা) … ৫৫৭
ষ্ট্যাবিয়ান স্নানাগারের ভিতরের দেয়াল ৫৫৭
রঙ্গালয়ের আসন … ৫৫৮
গৃহস্থের তৈজস পত্র … ৫৫৮
ফোরামের সাধারণ দৃশ্য … ৫৫৯
ষ্ট্রীট অব এবাণ্ডান্স … ৫৫৯
ষ্ট্যাবিয়ান রোড … ৫৫৯
ষ্ট্রীট অব ফরচুন … ৫৫৯
নীহার ভানুর শীষ … ৫৭৭
নীহার ভানুর শিকার … ৫৭৭
নীহার ভানুর আকৃতি … ৫৭৮
তূর্য্যলতা … ৫৭৯
কলস লতা বা ভৃঙ্গার লতা … ৫৭৯
মাখন লতা … ৫৭৯
মাখন লতার অজস্র রস-কোষ … ৫৭৯
রতি ফাঁদ … ৫৮০
রতি ফাঁদে আলপিন … ৫৮১
কাফ্রি নীহার ভানু … ৫৮১
মহারাণী যমুনা বাঈএর কন্যা তারাবাঈ ৫৯৭
মহারাণী যমুনা বাঈ … ৪৯৭
মহারাজা গাইকবাড় (তরুণ বয়সে) ৫৯৮
বরোদার গাইকবাড় (বর্ত্তমান চিত্র) ৫৯৯
বরোদার বর্ত্তমান মহারাণী … ৫৯৯
বাণিজ ওবারল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড ৬১৮
রাগাজ … ৬১৯
রচি ইনিষ্টিটিউট … ৬১৯
শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার … ৬২৫
ডাক্তার মহেন্দ্রচন্দ্র দত্ত … ৬২৫
শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সেন … ৬২৬
কাশী রামকৃষ্ণ মন্দির … ৬২৮
বেলুড় মঠে মহিলাগণের প্রসাদ গ্রহণ ৬২৯
বেলুড় মঠে প্রসাদ গ্রহণ স্থানের প্রবেশ পথে জনতা … ৬২৯
শ্রীযুক্ত দুর্গাগতি চট্টোপাধ্যায় … ৬৩০
শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় … ৬৩০
কুমারী সুকৃষ্ণা বসু … ৬৩০
ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর … ৬৩২
কমলা নেহরু … ৬৩২
সার দীনশা ওয়াচা … ৬৩৩
মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় … ৬৩৫
মন্দিরের সাধারণ দৃশ্য … ৬৪২
পূর্ব্ব পশ্চিম রেখা … ৬৪৩
রথচক্র … ৬৪৪
দ্বারের প্রস্তর নির্ম্মিত ঠাট … ৬৪৫
সূর্য্য … ৬৪৬
নিখিল ভারত অলিম্পিক প্রতিযোগিতা ৬৪৮
বেঙ্গল অলিম্পিক দল … ৬৪৯
জলপাইগুড়ি যোগেশচন্দ্র স্মৃতি-স্পোর্টস্ ৬৪৯
নিখিল ভারত অলিম্পিকে জেরাল্ড ডি মনি ৬৪৯
কালীঘাট স্পোর্টসের মিস্ এম্ স্মিথ ৬৪৯
লেকে ছাত্রদের নৌবিহার … ৬৪৯
বেঙ্গল অলিম্পিক দল … ৬৫০
জলপাইগুড়ী যোগেন্দ্র স্মৃতি স্পোর্টস ৬৫০
নিখিল ভারত অলিম্পিক … ৬৫০
ইণ্টার স্কুল গার্লস্ স্পোর্ট … ৬৫১
কালীঘাট স্পোর্ট ১ মাইল দৌড় ৬৫১
ইণ্টার স্কুল মেয়েদের হাইজ্যাম্প … ৬৫২
ইণ্টার স্কুল মেয়েদের ৭৫ মিটার দৌড় ৬৫২
লেডি টেগার্ট … ৬৫৩
সিনিয়র নক … ৬.৩
নিখিল ভারত মল্ল দ্বন্দ্ব … ৬৫৪
কালীঘাট স্পোর্টস বিজয়ী … ৬৫৪
নিখিল ভারত ভারোত্তোলন … ৬৫৫
ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতার বিজয়ীগণ ৬৫৬

বহুবর্ণ চিত্র

১। শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব (নিচোল)
২। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ৩। ভ্রষ্ট লগ্ন
৪। বসন্তের রাণী ৫। চড়ক

জ্যৈষ্ঠ—১৩৪৩

গণেশ কুণ্ডু (ব্যায়াম সমিতি) ৯ ষ্টোন বিভাগে রাণার্স … ৮৭১
রাধারমণ দাস (ব্যায়াম সমিতি) ৮ ষ্টোন বিভাগে রাণার্স … ৮৭১
সুনীল সেন (ব্যায়াম সমিতি) ৭ ষ্টোন বিভাগে উইনার্স … ৮৭২
রবীন বসু (ব্যায়াম সমিতি) ১২ ষ্টোনের উর্দ্ধ বিভাগে রাণার্স ৮৭২
মুরারী বসু (ব্যায়াম সমিতি) ১২ ষ্টোন বিভাগে উইনার্স … ৮৭৩
বিভূতি দাস (ব্যায়াম সমিতি) ১২ ষ্টোন বিভাগে রাণার্স … ৮৭৩
বঙ্গীয় কুস্তী প্রতিযোগিতায় ব্যায়াম সমিতির জয়ীগণ … ৮৭৩
বঙ্গীয় কুস্তী প্রতিযোগিতায় জয়ীগণ ৮৭৩

মুক্তারাম বিশ্বাস (সাঁকারিটোলা মাণিক-বাবুর আখড়া)—১১ ষ্টোন বিভাগে উইনার্স ... ৮৭৪
৯ ষ্টোন বিভাগের সুবোধ রুদ্র ও ভোলা হালদারের লড়া হইতেছে (উপরে সুবোধ রুদ্র) ... ৮৭৪
৯ ষ্টোন বিভাগের ঘনশ্যাম দাস ও বলদেব রায়ের লড়াই হইতেছে ৮৭৫
গোমাতা ও বৎস—আর্য্য সিং বীর শালিমার, হাওড়া ... ৮৮৬
শালুক ফুল—আর্য্য সিং বীর শালিমার, হাওড়া ... ৮৮৬
শাড়ীর পাড়—ত্রিপুরেশ্বর মুখোপাধ্যায় (হিন্দুস্থান সংঘের সৌজন্যে) ৮৮৭
মা—অবনী সেন ... ৮৮৭
ফিরতি পথে—অবনী সেন ... ৮৮৭
রান্নাঘর—হরিধন দত্ত ... ৮০৮
মহিষ—অবনী সেন (হিন্দুস্থান সংঘের সৌজন্যে) ... ৮৮৮
আস্তাবল—সরসী রায় ... ৮৮৮
বালিকা—বিমল দে ... ৮৮৯
গো-যান—অবনী সেন ... ৮৮৯
বস্তী—গোবর্দ্ধন আশ ... ৮৮৯
কাঠুরিয়া—সুবোধ রায় ... ৮৯০
ঘোড়া—সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৮৯০
ঘোড়া—বিমল শীল ... ৮৯০
প্রাসাদময়া নগরীর বুকে চমৎকার প্রাসাদের নমুনা ... ৮৯৩
রাস্তার ধারে আবর্জ্জনার গাড়ী থেকে ফুটপাথ অবরোধ করে গরুটি দিব্যি নিশ্চিন্তে আহার কোরছে ... ৮৯৪
বাসের ধারে ফুটপাথের ওপর জনারণ্যের মাঝে পালোয়ান সিং দিব্যি নিশ্চিন্তে ক্ষৌরকর্ম্ম সমাধা কোরছে ... ৮৯৪
বাসের ধারে ভিখিরীর দল ... ৮৯৪
ফুটপাথের ওপর আবর্জ্জনার স্তূপ ডাষ্টবিন থেকে উপছে পোড়ছে। বুভুক্ষু ভিক্ষুক আবর্জ্জনার মধ্যে আহার্য্য খুঁজছে ৮৯৫
ফুটপাথের ওপর কুলী ও বেকারদের তাসের আড্ডা ... ৮৯৫
ধর্ম্মতলা ও চৌরঙ্গীর মোড়ে একটি চমৎকার দৃশ্য ... ৮৯৫
বৌবাজারের ফুটপাথের ওপর লটারীর টিকিট বিক্রয়ের প্রকাশ্য আপিস বোসেছে ৮৯৬
দরিদ্র নিরাশ্রয় ফুটপাথেই নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাচ্ছে ... ৮৯৬
মান্ধাতা আমলের রিক্সা ও বিংশ শতাব্দীর ট্রাম পাশাপাশি রাস্তা দিয়ে চোলেছে ৮৯৬
(ক) অরুণ পাখীর বাসা
(খ) সীবন শিল্পী পাখীর বাসা
(গ) অন্তরীপা পাখীর বাসা
(ঘ) ফুলটুকী পাখীর বাসা ... ৯৩২
কারণ্ডবের বাসা ... ৯৩৩
সঙ্ঘচারীদের বাসা ... ৯৩৩
লালাস্রাবীদের বাসা ... ৯৩৪
তাঁতি পাখীদের বাসা ... ৯৩৫
আখা পাখীর বাসা ... ৯৩৫
টিলা পাখীর বাসা ... ৯৩৫
গুঞ্জন পক্ষ তাপসী পাখীর বাসা ... ৯৩৬
মধুপায়ীদের নৌকা বাসা ... ৯৩৬
পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ... ৯৯০
মহাত্মা গান্ধী ... ৯৯১
মেয়র ... ৯৯৩
ডেপুটী মেয়র, ... [illegible]
সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক ... ৯৯৫
প্রমথনাথ বিশ্বাস ... ৯৯৬
প্রিয়ব্রত সরকার ... ৯৯৬
শ্যামাচরণ রায় ... ৯৯৭
ওয়াজিদ আলি খাঁ পানি ... ৯৯৭
জ্যোতিষচন্দ্র হাজরা ... ৯৯৮
ধ্যানচাঁদ ও রূপ সিং ... ৯৯৯
আগা খাঁ বাইটন কাপ বিজয়ী বোম্বাই কাষ্টমস দল ... ১০০০
কলিকাতা কাষ্টমস্ দল ... ১০০০
লক্ষ্মীবিলাস কাপ বিজয়ী ঝান্সি দল ১০০১
বিজিত মোহনবাগান দল ... ১০০১
ভারতীয় হকি দল ... ১০০২
মিস এন বিডল ... ১০০২
বি, পি চন্দ্র ... ১০০৩
হিরন্ময়ী বসু ১০০৩
রাজারাম সাহু ... ১০০৪
জে এইচ হিউম্যান ... ১০০৫
মহারাজকুমার ভিজিয়ানাগ্রাম ... ১০০৬
[illegible], পানিয়া ... ১০০৬
এল, পি জয় ... ১০০৬
এম বাকাজিলানী ... ১০০৬
ডি, এম, মার্ব্বে ... ১০০৭
আমীর ইলাহী ... ১০০৭

বহুবর্ণ চিত্র

১। বিচারপতি শম্ভূনাথ পণ্ডিত (নিচোল) ২। পল্লীর হাট ৩। যোধা বাঈ ৪। পার্থ ৫। সুরের জন্ম

শ্রীমোক্ষদা চরণ চক্রবর্ত্তী, এম্.এ. বি.টি,
অধ্যাপক — আনন্দ মোহন কলেজ।
ময়মনসিংহ।

ভারতবর্ষ

সাগর সঙ্গমে

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার সেন গুপ্ত

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

COLOURED ILLUSTRATION